

ভূগোল ও পরিবেশ

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

ভূগোল ও পরিবেশ

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

সেলিনা শাহজাহান
ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
জুলেখা শাহীন

সম্পাদনা

ড. হাফিজা খাতুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতাযুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

ভূগোল ও পরিবেশ শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের নতুন জীবনবোধ ও জীবন-পরিবেশের পটভূমিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি এখন আর দেশ, রাজধানী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আয়াদানি-রঞ্জনি, শিল্প ও খনিজের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন এর পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে মানব-জীবনের সম্পর্ক ও পরিবেশ উন্নয়নের বিশ্বব্যাপী কর্মজ্ঞ, চিন্তাচেতনা পর্যন্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বোধগম্যতাকে শুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	ভূগোল ও পরিবেশ	১-৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	৮-৩০
তৃতীয় অধ্যায়	মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার	৩১-৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন	৪৭-৬৮
পঞ্চম অধ্যায়	বায়ুমণ্ডল	৬৯-৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	বারিমণ্ডল	৯১-১০৪
সপ্তম অধ্যায়	জনসংখ্যা	১০৫-১২৫
অষ্টম অধ্যায়	মানব বসতি	১২৬-১৩৭
নবম অধ্যায়	সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি	১৩৮-১৪৬
দশম অধ্যায়	বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	১৪৭-১৬৩
একাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প	১৬৪-১৮৪
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য	১৮৫-১৯৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য	১৯৮-২০৭
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০৮-২২৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	২২৫-২৩২

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল ও পরিবেশ

Geography and Environment

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। পৃথিবীতে বাস করে নানান রকম মানুষ, বিচি তাদের জীবনধারা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে নানান রকম পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন রকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব আধুনিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং, ভূগোল একদিকে প্রকৃতির বিজ্ঞান অন্যদিকে পরিবেশ ও সমাজের বিজ্ঞান। এ অধ্যায়ে আমরা ভূগোল ও পরিবেশ, ভূগোলের পরিধি, ভূগোলের বিভিন্ন শাখা এবং ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ভূগোল ও পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূগোলের পরিধি বর্ণনা করতে পারব।
- ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূগোল ও পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

ভূগোলের ধারণা (Concept of geography)

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি। মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর বর্ণনা হলো ভূগোল। ইংরেজি ‘Geography’ শব্দটি থেকে ভূগোল শব্দ এসেছে। প্রাচীন গ্রিসের ভূগোলবিদ ইরাটসথেনিস প্রথম ‘Geography’ শব্দ ব্যবহার করেন। ‘Geo’ ও ‘graphy’ শব্দ দুটি মিলে হয়েছে ‘Geography’। ‘Geo’ শব্দের অর্থ ‘ভূ’ বা পৃথিবী এবং ‘graphy’ শব্দের অর্থ বর্ণনা। সুতরাং ‘Geography’ শব্দটির অর্থ পৃথিবীর বর্ণনা। পৃথিবী আবার মানুষের আবাসভূমি। অধ্যাপক ম্যাকনি (Professor E. A. Macnee) মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর আলোচনা বা বর্ণনাকে বলেছেন ভূগোল। তাঁর মতে ভৌত ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনধারা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই ভূগোল। অধ্যাপক ডাডলি স্ট্যাম্পের (Professor L. Dudley Stamp) মতে, পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই হলো ভূগোল। কোনো কোনো ভূগোলবিদ ভূগোলকে বলেছেন পৃথিবীর বিবরণ, কেউ বলেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞান। অধ্যাপক কার্ল রিটার (Professor Carl Ritter) ভূগোলকে বলেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞান।

ভূগোল একদিকে প্রকৃতির বিজ্ঞান আবার অন্যদিকে পরিবেশ ও সমাজের বিজ্ঞান। প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান হলো ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। রিচার্ড হার্টশোর্ন (Richard Hartshorne) বলেন, পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের যথাযথ যুক্তিসংগত ও সুবিন্যস্ত বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো ভূগোল।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির বিজ্ঞান একাডেমি ১৯৬৫ সালে ভূগোলের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এর মতে, পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপব্যবহাগগুলো কীভাবে সংগঠিত এবং এসব প্রাকৃতিক বিষয় বা অবয়বেরে সঙ্গে মানুষ নিজেকে কীভাবে বিন্যস্ত করে তার ব্যাখ্যা খোঁজে ভূগোল।

আলেকজান্ডার ফন হামবোল্টের (Alexander Von Humboldt) মতে, ভূগোল হলো প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান, প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার বর্ণনা ও আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

মানুষ পৃথিবীতে বাস করে এবং এই পৃথিবীতেই তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উচ্চিদ, প্রাণী, নদ-নদী, সাগর, খনিজ সম্পদ তার জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তার ব্রিয়াকলাপ তার পরিবেশে ঘটায় নানান রকম পরিবর্তন। ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, শহর-ক্ষেত্র নির্মাণ প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করে। বনভূমি কেটে তৈরি হয় গ্রাম বা শহরের মতো লোকালয়। খাল, বিল, পুরুর ভরাট হয়। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়ার একটি সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের মূলে আছে কার্যকারণের খেলা। ভূগোলের প্রধান কাজ হলো এই কার্যকারণ উদয়াটন করা। পৃথিবীর পরিবেশের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম চলছে সে সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাই ভূগোল।

পরিবেশের ধারণা (Concept of environment)

মানুষ যেখানেই বাস করুক তাকে ঘিরে একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজমান। প্রকৃতির সকল দান মিলেমিশে ১০

তৈরি হয় পরিবেশ। নদী, নালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, ঘর, বাড়ি, রান্তাঘাট, উষ্ণিদ, প্রাণী, পানি, মাটি ও বায়ু নিয়ে গড়ে উঠে পরিবেশ। কোনো জীবের চারপাশের সকল জীব ও জড় উপাদানের সর্বসমেত প্রভাব ও সংঘটিত ঘটনা হলো ঐ জীবের পরিবেশ। পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্মসের (Arms) মতে, জীবসম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

পার্ক (C. C. Park) বলেছেন, পরিবেশ বলতে স্থান ও কালের কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যুতে মানুষকে ধিরে থাকা সকল অবস্থার যোগফল বোঝায়। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। যেমন— শুরুতে মাটি, পানি, বায়ু, উষ্ণিদ ও প্রাণী নিয়ে ছিল মানুষের পরিবেশ। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ধরনের পরিবেশ।

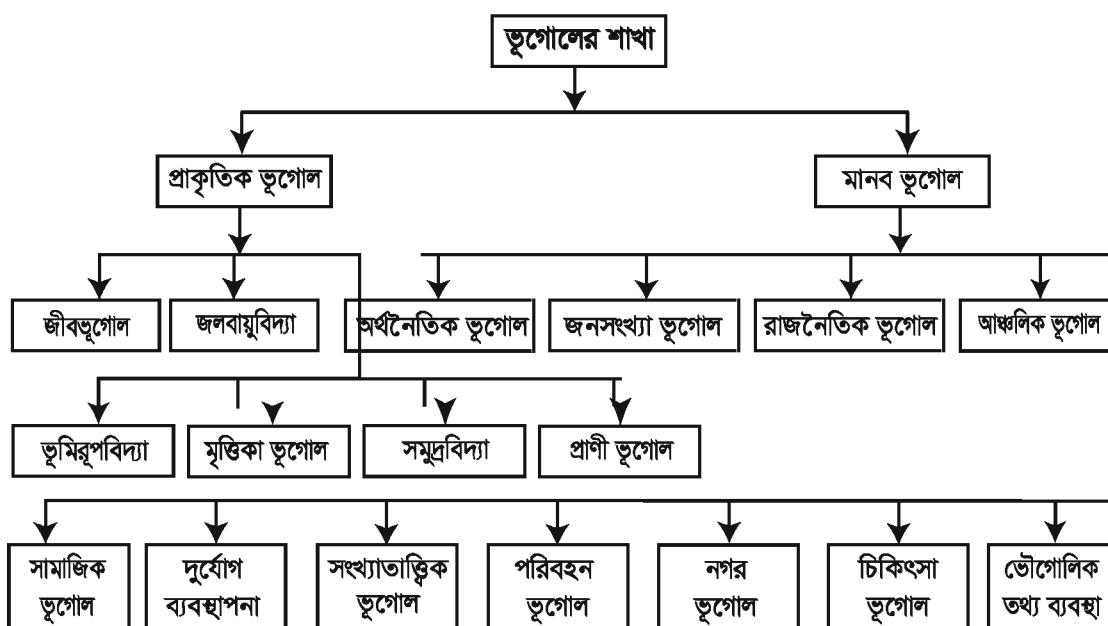
পরিবেশের উপাদান (Elements of environment) : পরিবেশের উপাদান দুই প্রকার যেমন জড় উপাদান ও জীব উপাদান। যাদের জীবন আছে, যারা খাবার খায়, যাদের বৃক্ষ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে তাদের বলে জীব। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী হলো জীব। এরা পরিবেশের জীব উপাদান। জীবদের নিয়ে গড়া পরিবেশ হলো জীব পরিবেশ। মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আলো, উষ্ণতা, আর্দ্রতা হলো পরিবেশের জড় উপাদান। এই জড় উপাদান নিয়ে গড়া পরিবেশ হলো জড় পরিবেশ।

কাজ : পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন কর।

ভূগোলের পরিধি (Scope of geography)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন নতুন আবিকার, উষ্ণাবন, চিন্তা-ধারণার বিকাশ, সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন ভূগোলের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করেছে। এখন নানান রকম বিষয় যেমন ভূমিরূপবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি ভূগোল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভূগোলের শাখা (Branches of geography)



(ক) প্রাকৃতিক ভূগোল (**Physical geography**) : ভূগোলের যে শাখায় ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

১। ভূমিরূপবিদ্যা (**Geomorphology**) : ভূমিরূপবিদ্যগণ একটি গ্রহের নগ্নীভবন এবং ক্ষয়ীভবনের ভূমিরূপের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করে।

২। জলবায়ুবিদ্যা (**Climatology**) : জলবায়ুবিদ্যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার ধরন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে।

৩। জীবভূগোল (**Biogeography**) : পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাণিজগৎ এবং উঙ্গিদের বণ্টন নিয়ে জীবভূগোল আলোচনা করে।

৪। মৃত্তিকা ভূগোল (**Soil geography**) : মৃত্তিকা ভূগোলবিদ্যগণ অশ্বামণ্ডলের উপরিভাগের মৃত্তিকা এবং এর বণ্টন ও বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫। সমুদ্রবিদ্যা (**Oceanography**) : পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র। বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান, অবনমন, সমুদ্রের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ ও লবণাক্ততা নির্ধারণ, সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমুদ্রবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(খ) মানব ভূগোল (**Human geography**) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কীভাবে বসবাস করছে, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেন এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তার কার্যকারণ অনুসন্ধান মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

১। অর্থনৈতিক ভূগোল (**Economic geography**) : প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক কাজ করে তা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এসব কাজ হলো কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি।

২। জনসংখ্যা ভূগোল (**Population geography**) : জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি, তার কার্যকারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর এর প্রভাব জনসংখ্যা ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

৩। আঞ্চলিক ভূগোল (**Regional geography**) : অঞ্চলভেদে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উঙ্গিদ, জীবজন্ম, মানুষ ও মানুষের জীবনধারণ প্রণালি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিষয়বস্তু অনুশীলন করা আঞ্চলিক ভূগোলের প্রধান বিষয়।

৪। রাজনৈতিক ভূগোল (**Political geography**) : রাজনৈতিক বিবর্তন, রাজনৈতিক বিভাগ ও পরিসীমা এবং বিভাগের মধ্যস্থিত ভৌগোলিক বিষয় রাজনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়।

৫। সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল (Quantitative geography) : ভূগোলের এই শাখায় সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল এবং মডেল ব্যবহার করে প্রমাণার্থ পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ভূগোলের অন্যান্য শাখায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কিছু ভূগোলবিদ শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ হন।

৬। পরিবহন ভূগোল (Transport geography) : পরিবহন ভূগোলবিদরা সরকারি, বেসরকারি, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং মানুষ ও পণ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর সম্পর্কে আলোচনা করে।

৭। নগর ভূগোল (Urban geography) : ভূগোলের এ শাখায় নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ, নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ, নগর পরিবেশ, নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা, নগরীর বস্তি ইত্যাদি বিষয় চর্চা করা হয়।

৮। দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা (Disaster management) : দুর্ঘটনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস, দুর্ঘটনা থেকে পরিবেশ ও সমুদ্রকে রক্ষার কৌশল দুর্ঘটনাপনার আলোচ্য বিষয়।

ভূগোলকে যত ভাগেই বিভক্ত করা হোক না কেন, সকল ভূগোলের সঙ্গে পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে ভূগোল ও পরিবেশ সম্মত করে পড়ানো হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশই ভূগোলবিজ্ঞানে সমান গুরুত্ব বহন করে।

পরিবেশের প্রকারভেদ (Types of environment) : পরিবেশ দুই প্রকার। ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। প্রকৃতির জড় ও জীব উপাদান নিয়ে যে পরিবেশ তাকে ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। এই পরিবেশে থাকে মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আলো, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ও অন্যান্য স্কুদ্র প্রাণী। মানুষের তৈরি পরিবেশ হলো সামাজিক পরিবেশ। মানুষের আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে তা হলো সামাজিক পরিবেশ।

ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব (Importance of studying geography and environment)

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়—

- পৃথিবীর কোনো স্থানের প্রকৃতি ও পরিবেশ।
- পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি, এদের গঠনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য।
- পৃথিবীর জলালঘু থেকে কীভাবে জীবজগতের উৎস হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্জন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের উৎসিদ ও প্রাণী এবং এদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার বৈচিত্র্য।
- কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের সামাজিক পরিবেশের কী পরিবর্তন হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্ঘটন সৃষ্টির কারণ, ক্ষয়ক্ষতি ও নিয়ন্ত্রণ, ভূগৃহি অবস্থান, জলবায়ুর ধরন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা।
- পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, প্রিনহাউস প্রতিরিদ্বারা ও এর প্রভাব।

- প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন।
- সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি জীবভূগোলের অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা | (খ) উষ্ণিদ ও জীবজন্ম |
| (গ) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | (ঘ) শহরের ক্রমবিকাশ |

২। ভূগোলের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—

- i. প্রকৃতি
- ii. শক্তি
- iii. সমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ঢ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. নাইম চার রাস্তার মোড়ে অবস্থিত নিচু জায়গা ভরাট করে একটি দোকান এবং দোকানের পিছনে বাড়ি তৈরি করলেন।

৩। নাইমের কর্মকাণ্ডটি কোন ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (ক) জীবভূগোল | (খ) মানব ভূগোল |
| (গ) জলবায়ুবিদ্যা | (ঘ) ভূমিরূপবিদ্যা |

৪। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডটি হলো—

- i. গ্রামের ক্রমবিকাশ
- ii. নগরায়ণ
- iii. জনপদ তৈরি

ভূগোল ও পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১।

গুপ- A	গুপ- B
পাহাড়-পর্বত	জীবভূগোল
মানুষ	প্রাকৃতিক ভূগোল
জলবায়ু	মানব ভূগোল
গাছপালা	অর্থনৈতিক ভূগোল

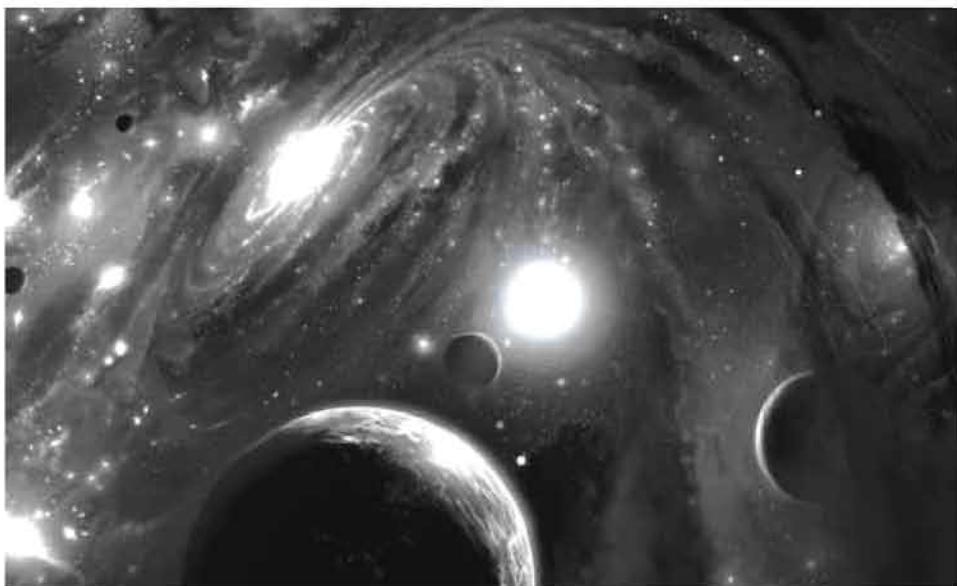
- ক. ভূগোল শব্দটি কে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন?
- খ. সমুদ্রবিদ্যার বিষয়বস্তু কী?
- গ. গুপ ‘A’-এর উপাদানগুলো কোন পরিবেশের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মানব-জীবনে গুপ ‘A’ এবং গুপ ‘B’-এর প্রতাব বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

The Universe and Our Earth

পৃথিবী মানবজাতির আবাসস্থল। পৃথিবীর চারদিকে ধিরে রয়েছে অসীম মহাকাশ। সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য রয়েছে। মহাকাশে এরূপ বহু নক্ষত্র রয়েছে। পাশাপাশি চন্দ্র (উপগ্রহ), পৃথিবী (এহ), ধূমকেতু, উক্তা, নীহারিকা প্রভৃতি রয়েছে। ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও ধূলিকণা থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী, দূর-দূরান্তের সকল জ্যোতিক এবং দেখা না দেখা সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। এ অধ্যায়ে আমরা মহাকাশ, মহাবিশ্ব, সৌরজগৎ, পৃথিবী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

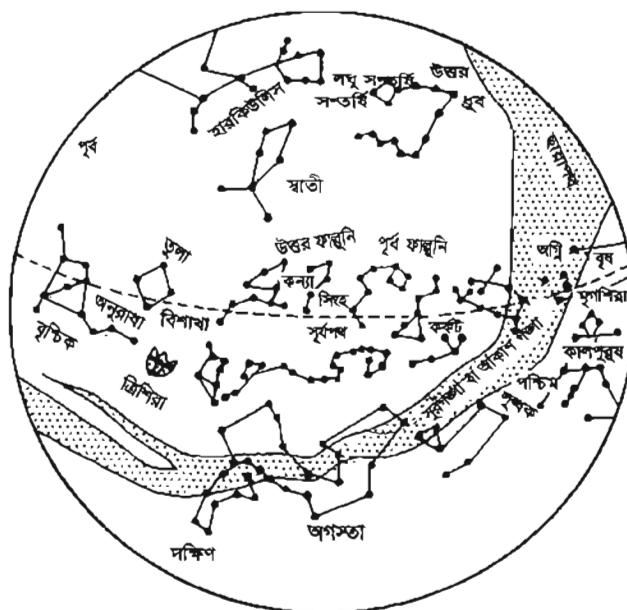
- মহাবিশ্বের জ্যোতিকম্ভলে সৌরজগৎ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর আকার-আকৃতি ও উপগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারব।
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ ব্যাখ্যা এবং এদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করে মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান শনাক্ত করতে পারব।
- আঙীক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দিবারাত্রি সংঘটন ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে সৌরজগতের মডেল তৈরি করতে পারব।
- আমাদের বসবাসের একমাত্র পৃথিবী সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞানার আগ্রহ প্রকাশ করব।

মহাকাশ ও মহাবিশ্ব (Space and universe)

সূর্য একটি নক্ত্র এবং টাই একটি উপযুক্তি। এই আকাশের শুরু ও শেষ নেই। আদি-অন্তহীন এ আকাশকে মহাকাশ বলে। মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিক রয়েছে। এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘূরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কোনো কোনোটার আলো আছে আবার কোনো কোনোটার আলো নেই। মহাকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ত্র, ধূমকেতু, উষ্ণা, নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণবামন (Black dwarf), কৃষ্ণগহর (Black hole) প্রভৃতি সবকিছুই রয়েছে। এদের সবাইকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে কত বড় তা কেউ জানে না। কেউ জানে না মহাবিশ্বের আকার বা আকৃতি কেমন, অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নেই। আবার কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের আকার ও আকৃতি আছে। মানুষ প্রতিনিয়তই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিকার করছে, এর অনেক কিছুই এখনও অজ্ঞান রয়ে গেছে। এই অজ্ঞান হয়তো চিরকালই থাকবে।

নক্ত্র (Stars)

যেসব জ্যোতিকের নিজের আলো আছে তাদের নক্ত্র বলে। মহাকাশে অসংখ্য নক্ত্র রয়েছে (চিত্র ২.১)। খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ত্র দেখতে পাই। এদের কয়েকটি পৃথিবী থেকে প্রতিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। নক্ত্রগুলো হলো ছুলন্ত গ্যাসপিল, এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস অতি উচ্চ (প্রায় 6000° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় ছুলছে। সূর্যের প্রথম আলোর জন্য দিনের বেলায় অন্যান্য নক্ত্র দেখা যায় না।



চিত্র ২.১ : বিভিন্ন নক্ত্রের অবস্থান

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় নক্ত্রগুলো যেন একই সমতলে অবস্থান করছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে এরা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে। পৃথিবী ও নক্ত্রদের মধ্যে এবং নক্ত্রদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে কিলোমিটার দূরা এই দূরত্ব প্রকাশ করা যায় না। এই দূরত্ব আলোক বর্ষ এককে মাপা হয়। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এই বেগে এক বছরে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে। সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ত্র। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। সূর্যের নিকটতম নক্ত্র প্রজ্ঞিমা সেন্টোরাই (Proxima Centauri)। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪.২ আলোক বর্ষ।

নক্ষত্রমন্ডলী (Constellation) : মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে। এভাবে আমাদের পরিচিত আকৃতিতে নক্ষত্রদলকে নক্ষত্রমন্ডলী বলে। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক একটি নক্ষত্রদলকে কাঙ্গনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বিভিন্ন আকৃতি কঙ্গনা করে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন।

এদের কোনোটা দেখতে ভগুকের মতো, কোনোটা শিকারির মতো। এদের মধ্যে সম্পর্কিত (Great Bear), কালপুরুষ (Orion), ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia), লস্তুসম্পর্কি (Little Bear), বৃহৎ কুকুরমন্ডল (Canis Major) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্যালাক্সি (Galaxy) : মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু ও বাস্কুলের এক বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগৎ বলে। মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে (চিত্র ২.২)। এদের বিভিন্ন আকার ও আকৃতি রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশই সর্পিলাকার বা উপবৃত্তাকার। সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো বৃহৎ আকৃতির এবং উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলো বেশি উজ্জ্বল। এরা পরম্পর ব্যাপক ব্যবধানে অবস্থিত। কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বলে।



চিত্র ২.২ : গ্যালাক্সি

নীহারিকা (Nebulae) : নীহারিকা হলো মহাকাশে অসংখ্য স্ফৱালোকিত তারকার আন্তরণ। এদের আকার বিচিত্র। কিছু নীহারিকার দেহ গ্যাসীয় পদার্থে পূর্ণ। এদেরকে গ্যাসীয় নীহারিকা বলে। এক একটি নীহারিকার মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাপক। এক একটি নীহারিকার মাঝে কোটি কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে। এরা যেহেতু পৃথিবী থেকে কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে, তাই এদের মাঝে যেসব নক্ষত্র রয়েছে তাদের পৃথকভাবে শনাক্ত করা যায় না।

হায়াপথ (Milky Way) : কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্রম অণকে হায়াপথ বা আকাশ গঁজা বলে। অস্থকার আকাশে এদের উচ্চল সীমি সীর্ষগুরুর মতো দেখায়। একটি হায়াপথ লক্ষ কোটি লক্ষজ্যোৎ সমষ্টি। শীতকালে আঁতিবেলা পরিকার আকাশে লক্ষ করলে উচ্চল-সক্ষিপ্ত বেশ বড় পরিসরযুক্ত তেজোশীঁষ অবস্থা আলোর রেখা দেখা যায়। তাইকা খচিত এই আলোর পথই হলো হায়াপথ। বিজ্ঞানীরা একে বিরাট চক্রকার মডেল বলে অনুমান করেন। সৌরজগৎ একটি হায়াপথের অঙ্গসতি।

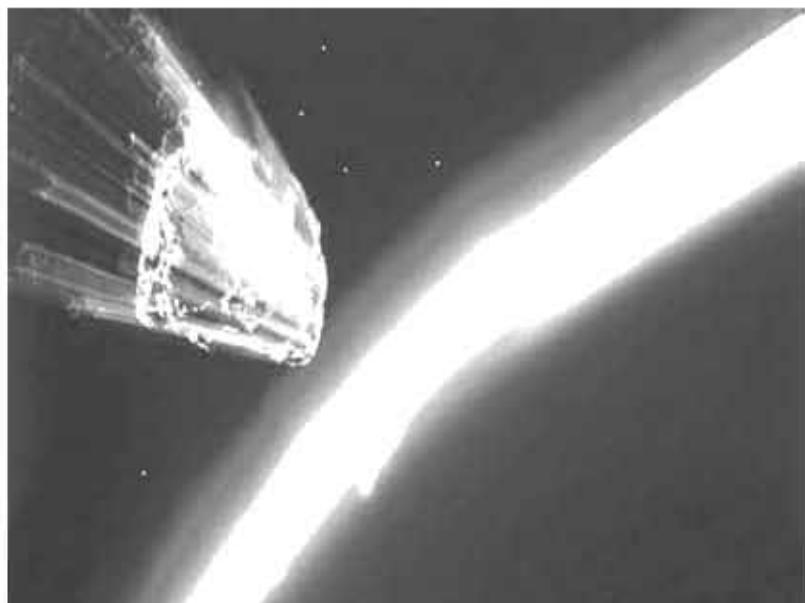
উকা (Meteor) : গ্রাজের মেষমুন্ড আকাশে অনেক সময় মনে হয় বেল নক্ত ছুটে যাচ্ছে বা কোনো নক্ত বেল এই যাত্র খসে গড়ে। এই ঘটনাকে নক্তপতন বা তারা খসা বলে। এরা কিন্তু আসলে কোনো নক্ত নয়, এদের নাম উকা (চিত্র ২.৩)। মহাশূল্যে অজন্ত অভিগতি ভেসে বেড়ায়। এই অভিগতিগুলো অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে প্রচল পতিতে (সেকেতে থার ৩ কিলোমিটার) পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুর সংস্কারে এসে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এরা ছালে পড়ে। ফলে এদের ছাঁটি তারা বলে মনে হয়। বেশিরভাগ উকাপিটই আকাশে বেশ ক্রম।



চিত্র ২.৩ : উকা

শূমকেতু (Comet) : মহাকাশে যাবে যাবে একপ্রকার জ্যোতিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের একটি যাথা ও একটি লেজ আছে। এসব জ্যোতিকে শূমকেতু বলে। শূমকেতু আকাশের এক অতি বিস্ময়কর জ্যোতিক (চিত্র ২.৪)। সৌরজগতের মধ্যে শূমকেতুর বসবাস হলেও এরা কিছুদিনের অন্ত উপর হয়ে আবার অন্তর্ভু হয়ে যায়। সূর্যের চারাদিকে অনেক দূর দি঱ে এরা পরিক্রমণ করে। সূর্যের নিকটবর্তী হলে এদের দেখা যায়। এরা সূর্যের ঘূর্ণ কাছাকাছি আসতে থাকে তত এর লেজ লম্বা হতে থাকে। এরা অনেক সীর্ষ কক্ষগুলো সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলে অনেক বছর পর এরা আবির্ভূত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এভমত হ্যালি যে শূমকেতু আবিকার করেন তা হ্যালির শূমকেতু নামে পরিচিত। হ্যালির শূমকেতু প্রতি ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়।

হালিক ধূমকেতু ২৪০ ক্রিটিশূর্ব অব থেকে দেখা যায় এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে হালিক ধূমকেতু দেখা গেছে।



চিত্র ২.৩ : ধূমকেতু

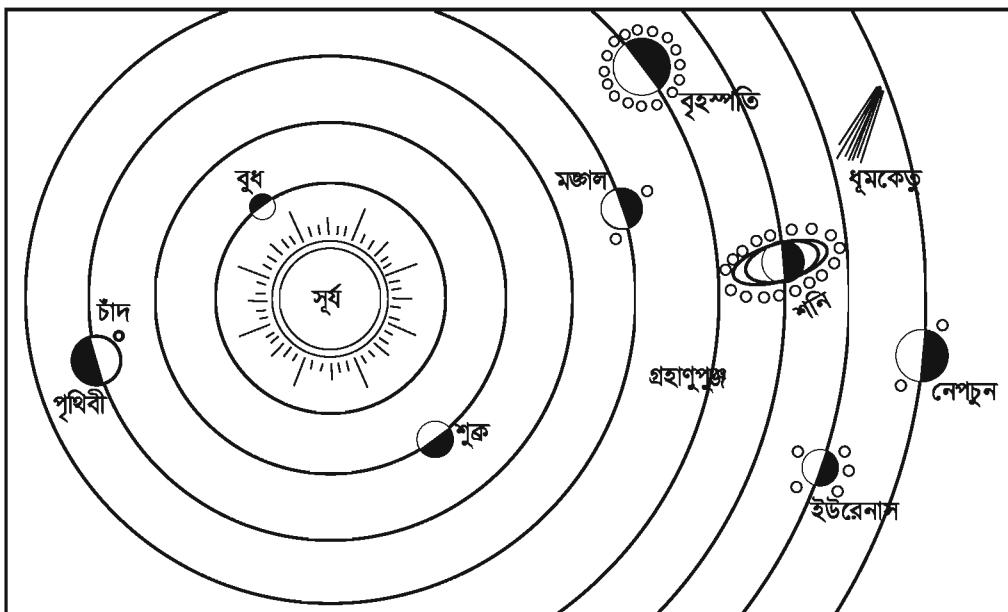
ঘূর্ণন (Planet) : মহাকাশে কভকলুগো জ্যোতিক সূর্যকে সিরিজিট সময়ে দিসিক গথে পরিকল্পন করে। এদের নিষেদের কোনো আলো বা ভাগ নেই। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এরা সূর্য থেকে আলো ও ভাগ পায়। এই ভাগেই উজ্জ্বল হয়। এরা ভাগার মতো পিটিছিট করে ছুলে না। এসব জ্যোতিকে ঘূর্ণ বলে। আমাদের সৌরজগতের আটটি ঘূর্ণ হলো বৃথা, শূক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপ্টুন।

উপগ্রহ (Satellite) : কিছু কিছু জ্যোতিক ঘূর্ণকে ধিরে আবর্তিত হয়, এদের উপগ্রহ বা ঠাণ বলে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা ঘূর্ণকে কেন্দ্র করে থাকে। এদের সিঙ্গুর আলো বা ভাগ নেই। এরা সূর্য বা নক্ষত্র থেকে আলো বা ভাগ পায়। ঠাণ পৃথিবী ঘূর্ণের একমাত্র উপগ্রহ। কোনো কোনো ঘূর্ণের উপগ্রহ আছে, কোনোটির নেই। বৃথা ও শূক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উপগ্রহ আবিস্কৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ : মানুষের তৈরি বিভিন্ন উপগ্রহ আছে যারা পৃথিবীর চারপাইকে সুরাহে। এদের বলে কৃত্রিম উপগ্রহ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, অধ্য আদান-থাদান, গোহেন্দা নজরদারি, অনিয় সম্মানের সকান, পরিবেশ সুরূ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

সৌরজগৎ (Solar System)

সূর্য এবং তার ঘূর্ণ, উপগ্রহ, অবস্থা ধূমকেতু ও অগণিত ঝুকা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত (চিত্র ২.৫)। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র অবস্থান করছে। অহলুগো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সূর্যের চারপাইকে সুরাহে। সৌরজগতের বাবতীয় ঘূর্ণ-উপগ্রহের নিরবন্ধক হলো সূর্য। সূর্যকে তিক্তি করে সৌরজগতের বাবতীয় কাজ-কর্ম চলে। এই মহাবিশ্বের বিশালভাব মধ্যে সৌরজগৎ নিভাস্তই হোট।



চিত্র ২.৫ : সৌরজগৎ

সূর্য (Sun) : সূর্য একটি নক্ষত্র। এটি একটি মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র। এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার এবং ভর প্রায় 1.99×10^{13} কিলোগ্রাম। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিক। সূর্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহের তাপ ও আলোর মূল উৎস সূর্য। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী টির অন্ধকার থাকত এবং পৃথিবীতে জীবজগৎ ও উক্তিজগতের কিছুই বাঁচত না। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে আটটি গ্রহ। সূর্য থেকে গ্রহগুলো দূরত্ব অনুযায়ী পর পর যেভাবে রয়েছে তা হলো বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus) এবং নেপচুন (Neptune)। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং ছোট বুধ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বেশ উজ্জ্বল এবং কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই দেখা যায়। ইউরেনাস ও নেপচুন এতটা কম উজ্জ্বল যে দূরবীক্ষণ ছাড়া এদের দেখা যায় না।

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার; এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার। সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকায় সূর্যের আলোর তীব্রতার কারণে সবসময় একে দেখা যায় না। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন। সূতরাং বুধ গ্রহে ৮৮ দিনে এক বছর হয়। বুধের মাধ্যাকর্ষণ বল এত কম যে এটি কোনো বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না। এখানে নেই মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস ও পানি। সূতরাং প্রাণীর অভিত্ব নেই। ১৯৭৪ সালে মার্কিন মহাশূন্যযান মেরিনার-১০ বুধের যে ছবি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় যে, বুধের উপরিতল একদম চাঁদের মতো। ভূত্বক অসংখ্য গর্তে ভরা, এবড়ো-থেবড়ো। এখানে আছে অসংখ্য পাহাড় ও সমতলভূমি। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

২৫ **শুক্র (Venus) :** বুধের মতো শুক্র গ্রহকেও ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধিয়ার আকাশে সম্ম্যাতারা

হিসেবে দেখা যায়। শুক্রতারা বা সন্ধ্যাতারা আসলে কোনো তারা নয়। কিন্তু নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে বলেই আমরা একে ভুল করে তারা বলি। শুক্র গ্রহটি ঘন মেঘে ঢাকা। তাই এর উপরিভাগ থেকে সূর্যকে কখনই দেখা যায় না। শুক্রের মেঘাছন্ন বায়ুমণ্ডল প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইডের তৈরি। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে উন্নত গ্রহ। সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব 10.8 কোটি কিলোমিটার। এর দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। এখানে বৃক্ষি হয় তবে এসিড বৃক্ষি। শুক্রের ব্যাস $12,108$ কিলোমিটার। সূর্যকে ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে 225 দিন। সুতরাং শুক্রে 225 দিনে এক বছর। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। সকল গ্রহ এদের নিজ অঙ্কের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খেলেও একমাত্র শুক্র গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাক খায়।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এটি সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব 15 কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় $12,667$ কিলোমিটার। পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 47 সেকেন্ড। তাই এখানে 365 দিনে এক বছর। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে যা উচ্চিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে।

মঙ্গল (Mars) : মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। বছরের অধিকাংশ সময় একে দেখা যায়। খালি চোখে মঙ্গল গ্রহকে লালচে দেখায়। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব 22.8 কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস $6,787$ কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এই গ্রহে দিনরাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সূর্যের চারদিকে একবার ঘূরতে মঙ্গলের সময় লাগে 68.7 দিন। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে রয়েছে শিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি। এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি (শতকরা 99 ভাগ) যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলে ফোবস ও ডিমোস নামে দুটি উপগ্রহ রয়েছে।

বৃহস্পতি (Jupiter) : বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। একে গ্রহরাজ বলে। এর ব্যাস $1,42,800$ কিলোমিটার। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে $1,300$ গুণ বড়। এটি সূর্য থেকে প্রায় 77.8 কোটি কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। তাই পৃথিবীর সাতাশ ভাগের একভাগ তাপ পায়। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে তাপমাত্রা খুবই কম এবং অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি (প্রায় $30,000^{\circ}$ সেলসিয়াস)। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে $4,331$ দিন। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা 67 টি। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহস্পতি গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব 143 কোটি কিলোমিটার। এটি গ্যাসের তৈরি বিশাল এক গোলক। এর ব্যাস $1,20,000$ কিলোমিটার। শনির ভূত্তক বরফে ঢাকা। এর বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। সূর্যের চারদিকে একবার ঘূরতে শনির সময় লাগে পৃথিবীর প্রায় 29.5 বছরের সমান। শনি উজ্জ্বল বলয় দ্বারা বেষ্টিত এবং এর 62 টি উপগ্রহ আছে।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এ গ্রহটি সূর্য থেকে ২৮৭ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এ গ্রহের সময় লাগে ৮৪ বছর। এ গ্রহের গড় ব্যাস ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এ গ্রহটি হালকা পদার্থ দিয়ে গঠিত, আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। শনির মতো ইউরেনাসেরও কয়েকটি বলয় আবিস্কৃত হয়েছে, তবে শনির বলয়ের ন্যায় এ বলয়গুলো উজ্জ্বল নয়। এর উপগ্রহ সংখ্যা ২৭টি।

নেপচুন (Neptune) : সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। এখানে সূর্যের আলো ও তাপ খুব কম। এর ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার। এ গ্রহ আয়তনে প্রায় ৭২টি পৃথিবীর সমান এবং ভর ১৭টি পৃথিবীর ভরের সমান। এর বায়ুমণ্ডলে বেশিরভাগই মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। এর উপগ্রহ সংখ্যা ১৪টি।

কাজ : দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে ১৫ মিনিটে নিচের ছবটি পূরণ কর।

সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহের অবস্থান	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ কাল	উপগ্রহ সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য	
				গঠন	অন্যান্য
বুধ				১। ২।	
শুক্ৰ				১। ২।	
পৃথিবী				১। ২।	
মঙ্গল				১। ২।	
বৃহস্পতি				১। ২।	
শনি				১। ২।	
ইউরেনাস				১। ২।	
নেপচুন				১। ২।	

পৃথিবীর আকার-আকৃতি (Size and shape of the world)

মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল স্পুটনিকে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় বুঝতে পারেন পৃথিবী ‘গোলাকার’ তবে উভর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। এছাড়া তার তোলা পৃথিবীর ছবিও দেখতে গোলাকৃতি। তবে পূর্ব- পশ্চিমে সামান্য স্ফীত। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি হলো অনেকটা অভিগত গোলকের (Oblate spheroid) মতো।

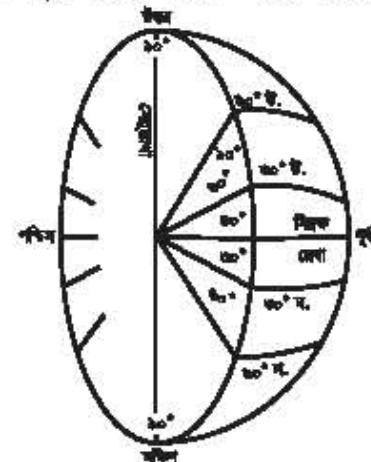
পৃথিবীর আকৃতি যেহেতু সম্পূর্ণ গোলাকার নয় সেহেতু পৃথিবীর নিরক্ষীয় ‘পূর্ব-পশ্চিম’ ব্যাস ও মেরুদেশীয় ‘উভর-দক্ষিণ’ ব্যাস তিনি। মেরুদেশীয় ব্যাস হলো ১২,৭১৪ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় ব্যাস হলো ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। এদের মধ্যে পার্থক্য হলো ৪৩ কিলোমিটার। পৃথিবীর গড় ব্যাস হলো ১২,৭৩৪.৫ কিলোমিটার। গণনার সুবিধার জন্য একে ১২,৮০০ কিলোমিটার ধরা হয়। এই হিসেবে পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ হলো ৬,৪০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর পরিধির মধ্যে নিরক্ষীয় পরিধি ৪০,০৭৭ কিলোমিটার। এটাই সর্ববৃহৎ পরিধি এবং ১০০% মেরুদেশীয় পরিধি ৪০,০০৯ কিলোমিটার। গণনার সুবিধার জন্য গড় পরিধি ৪০,০০০ কিলোমিটার ধরা হয়।

অক্রেখা, মাধ্যিমেখা ও পূর্বাঞ্চলীয় রেখাসমূহ (Latitude, Longitude and other Important Lines)

সমস্যা পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটি জ্যানকে নির্দিষ্ট করতে হলে বা এর অবস্থান জানতে হলে আমাদের সবার আপে যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হলো অক্রেখা ও মাধ্যিমেখা। মাধ্যিমেখার অবস্থান থেকে কোনো জ্যানের সময় জানা যায়। অক্রেখার সাথে যেমন নিরক্রেখা থেকে উভয় বা দক্ষিণে অবস্থান জানা যায় তেমনি মূল মধ্যাঞ্চল থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানা যায়।

অক্রেখা (Latitude)

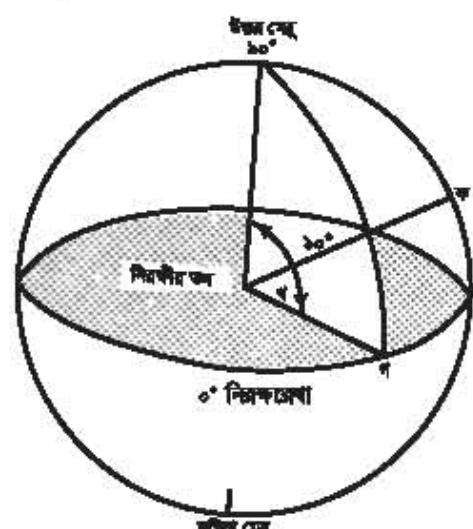
পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উভয়-দক্ষিণে করিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বা মৌলাঞ্চল্য বলে। এই অক্ষের উভয়-পার্শ্ব বিস্তুকে উভয় মেরু বা সূর্যের এবং দক্ষিণ-পার্শ্ব বিস্তুকে দক্ষিণ মেরু বা সূর্যের বলে। সূর্যে মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেঠিন করে একটি রেখা করানা করা হয়েছে। একে নিরক্রেখা বা বিশ্বাঞ্চল বলে। নিরক্রেখার উভয়-দক্ষিণে পৃথিবীকে সমান সূই ভালে বিভক্ত করা হয়েছে। নিরক্রেখার উভয় দিকের পৃথিবীর অর্দেককে উভয় গোলার্ধ ও দক্ষিণ দিকের অর্দেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে। এই নিরক্রেখাকে 0° থেকে উভয় দিকে সূই মেরু পর্যন্ত 90° বা এক সমকোণ ধরা হয়। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির অন্য নিরক্রেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্রবৃত্তও বলে। নিরক্রেখার সমান্তরাল যে রেখাগুলো হয়েছে সেগুলো হলো অক্রেখা। এই অক্রেখাগুলো আসলে করানা করা হয়েছে। এসের সমাক্রেখা বলে। নিরক্রেখা থেকে উভয় বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো জ্যানের কৌণিক দূরত্বকে (Angular Distance) এই জ্যানের অক্রাণ্ড বলে। একই গোলার্ধের একই অক্রাণ্ড মানসময়ের সহযোগ রেখাকে অক্রেখা বলে (চিত্র ২.৬)।



চিত্র ২.৬ : নিরক্রেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব

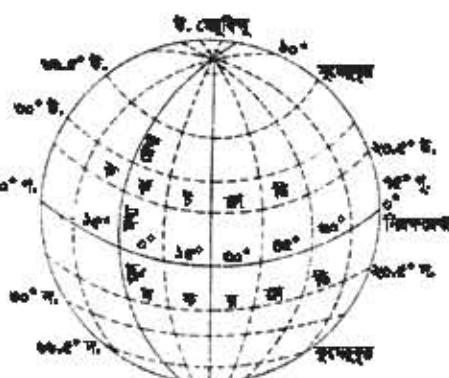
অক্রাণ্ড নির্ণয় (Determining latitude)

একজন জ্যোতিরিদের অন্য অক্রাণ্ড নির্ণয় করতে জানা পূর্বই জরুরি। আমরা জানি পৃথিবী বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ 90° । অক্রাণ্ড নির্ণয় করার অন্য প্রয়োগিকভাবে আমরা বলি আক্রেখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে কেটে সেই ভাঙলে এর মধ্যে আমরা পৃথিবীর ঠিক অক্রাণ্ড নির্ণয় পাব। এখন বলি আমরা কোনো একটি জ্যানের অক্রাণ্ড নির্ণয় করতে চাই ভাঙলে সেই অক্রাণ্ড সঙ্গে নির্ণয় জ্যানটির নিরক্রেখার (0°) পরিপ্রেক্ষিতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তা নির্ণয় করতে হবে। এই কোণই হলো সেই জ্যানের অক্রাণ্ড। যেমন- নিরক্রীয় ভল থেকে উভয় মেরুর কৌণিক দূরত্ব বা উৎপন্ন কোণ 90° । এটাই হলো উভয় মেরুর অক্রাণ্ড। এভাবে দক্ষিণ মেরুর অক্রাণ্ড 90° (চিত্র ২.৭)। অর্থাৎ ক খ গ হলো ক কিসু অক্রাণ্ড।



চিত্র ২.৭ : নিরক্রীয় ভল, উভয় মেরু ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান

নিরক্রেতায় উভয় দিকে অবস্থিত কোনো একটি স্থানের অকালকে উভয় অকাল এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অকালকে দক্ষিণ অকাল বলে। এতি ডিগ্রি অকালকে আবার মিনিট ('') ও সেকেণ্ট ("") তাঁগ করা হয়। এখানে একটা কথা সক্ষম রাখতে হবে সমজ্ঞের মিনিট ('') ও সেকেণ্ট ("") এবং স্কেলের মিনিট ('') ও সেকেণ্ট ("") একেবারেই আলাদা সূচি বিহু। করেক্ট সমাক্ষত্রূপ খুব বিধ্যাত। এদের একটি 23.5° উভয় অকাল, একে কক্ষিজানি বলে। অপরটি 23.5° দক্ষিণ অকাল, একে বলে অক্রকাণ্ডি। 66.5° উভয় অকালকে বলে সুস্মেলুষ্ঠ এবং 66.5° দক্ষিণ অকালকে বলে কুমেলুষ্ঠ। বিশ্বজ্যোতি মহাবৃত্ত বা শূলবৃত্ত বলে (চিত্র ২.৮)।



চিত্র ২.৮ : অক্ষত্রূপ & সাম্মিযোগ

অকাল নির্ধারণ বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো—

১। সেক্ষেটারিট যন্ত্রের সাহায্যে : বে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যাব তাকে সেক্ষেটারিট বল বলে। সেক্ষেটারিট যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি কেবল নির্ধারণ করে অকাল নির্ধারণ করা যাব। কোনো স্থানের অকাল = 90° – (মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি \pm বিশুলণ)।

বিশুলণ : সূর্য বেদিন যে অকালের উপর লক্ষণ করে কিন্তু দেখ সেটাই সৌদিনের সূর্যের বিশুলণ। কোনো একদিন দক্ষিণ গোলার্দে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি 90° এবং বিশুলণ 12° দক্ষিণ হলে এই স্থানের অকাল হবে—

অকাল = 90° – (মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি + বিশুলণ) = 90° – ($90^{\circ} + 12^{\circ}$) = $90^{\circ} - 92^{\circ} = 28^{\circ}$ দক্ষিণ।

হানাটি যদি উভয় গোলার্দে হয় তবে উভয়বাচক বিশুলণ বোঝ করতে হবে এবং দক্ষিণবাচক বিশুলণ বিশুলণ করতে হবে। দক্ষিণ গোলার্দে দক্ষিণবাচক বিশুলণ বোঝ এবং উভয়বাচক বিশুলণ বিশুলণ করতে হবে।

২। শুবতারার সাহায্যে অকাল নির্ধারণ : শুবতারার উন্নতি জেনে কোনো স্থানের অকাল নির্ধারণ করা যাব। এর সাহায্যে শুধু উভয় গোলার্দের কোনো স্থানের অকাল নির্ধারণ করা যাব। নিরক্রেতায় শুবতারার উন্নতি 0° এবং উভয় মেছাতে ঠিক যাবার উপর শুবতারার উন্নতি 90° হয়। শুভতারার উভয় গোলার্দে কোনো স্থানের অকাল শুবতারার উন্নতির সমান।

মাধ্যিমাত্রিকা (Longitude)

নিরক্রেতাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেণ্টে তাঁগ করে প্রত্যেক তাপবিন্দুর উপর দিয়ে উভয় মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বে সকল রেখা করলা করা হয়েছে সেগুলোই হলো মাধ্যিমাত্রিকা। এ রেখাগুলো পৃথিবীর পরিবর্তের অর্দেকের সমান। অর্থাৎ এক-একটি অর্ধবৃত্ত।

আমরা শুবেই জেনেছি অক্ষত্রূপ ও মাধ্যিমাত্রিকাগুলো হলো কাজনিক। মাধ্যিমাত্রিকা নিরে আগোচন করতে হলে আমাদের জানতে হবে যুক্ত মধ্যজ্যোতির অবস্থান। শুক্রজ্যোতির শতন শহজের কাছে শিনিচ (Greenwich) যান পদ্ধিতির উপর দিয়ে উভয় মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বে মধ্যত্রূপ অঞ্চলম কর্ণ-ও, তৃপোল ও পরিবেশ-১৫-১০ম শ্রেণি

করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। শ্রিনিচের দ্রাঘিমা 0° । শ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা বলে। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ 360° । মূল মধ্যরেখা, এই 360° কে 1° অঙ্গর অঙ্গের সমান দুই ভাগে অর্ধাং পূর্ব ও পশ্চিমে 180° করে ভাগ করেছে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

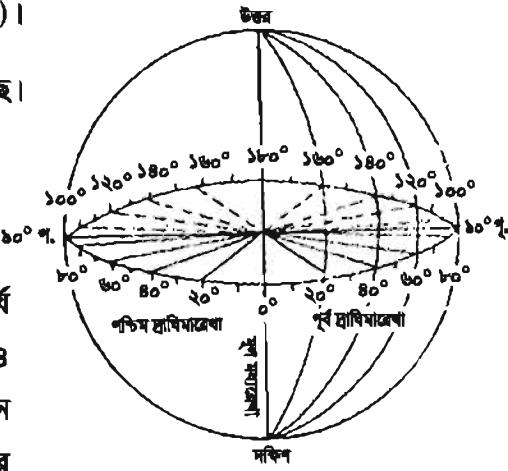
পৃথিবী গোল বলে 180° পূর্ব দ্রাঘিমা ও 180° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। শ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে 30° পূর্বে যে দ্রাঘিমারেখা তার উপর উভয় মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সকল স্থানের দ্রাঘিমা 30° পূর্ব দ্রাঘিমা (চিত্র ২.৯)।

দ্রাঘিমা নির্ণয় ও ব্যবহার : দ্রাঘিমা নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ও

২। শ্রিনিচের সময় দ্বারা।

১। **স্থানীয় সময়ের পার্থক্য :** কোনো স্থানে মধ্যাহ্ন যখন সূর্য ঠিক মাঝার উপর আসে সেখানে দুপুর 12^{th} থেরে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় 1° । এখন আমরা সহজেই হিসাব করতে পারি যদি কোনো স্থানে দুপুর 12^{th} হয় সেখান থেকে 10° পূর্বের কোনো স্থানের সময় হবে $12^{\text{th}} + (10 \times 4)$ মিনিট বা $12^{\text{th}} 40$ মিনিট। আবার যদি সে স্থানটি 10° পশ্চিম দিকে হয় তাহলে সময় হবে $12^{\text{th}} - (10 \times 4)$ মিনিট বা $11^{\text{th}} 20$ মিনিট। এভাবে মধ্যাহ্নের সময় অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

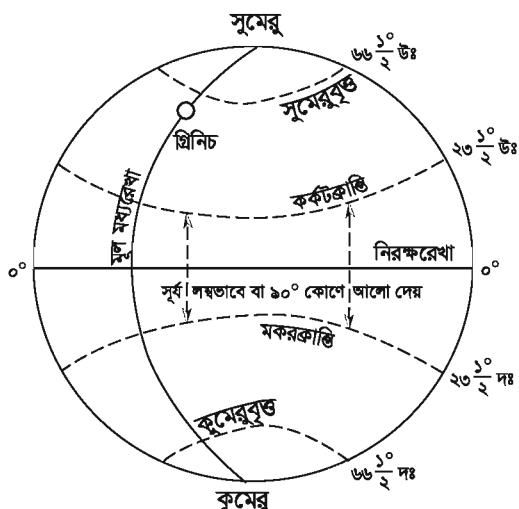


চিত্র ২.৯ : দ্রাঘিমা ও কৌণিক দূরত্ব

২। **শ্রিনিচের সময় দ্বারা :** শ্রিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য ডিগ্রি (0°) থারা হয়। এখন আমরা যদি শ্রিনিচের সময় এবং অন্য কোনো স্থানের সময় জানতে পারি তাহলে দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য অনুসারে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে 1° দ্রাঘিমার পার্থক্য থেরে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারি। শ্রিনিচের পূর্ব দিকের দেশগুলো সময়ের হিসেবে শ্রিনিচের চেয়ে এগিয়ে থাকে এবং শ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর সময় শ্রিনিচের সময় থেকে পিছিয়ে থাকে। বাংলাদেশ শ্রিনিচ থেকে 90° পূর্বে অবস্থিত বলে বাংলাদেশের সময় ৬ ঘণ্টা এগিয়ে। এভাবে দ্রাঘিমার সাহায্যে সময় এবং সময়ের মাধ্যমে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ (Important lines)

নিরক্ষরেখা : পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে রেখাটি পূর্ব-পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীকে বেক্টন করে আছে তাকে নিরক্ষরেখা বলে। নিরক্ষরেখার অপর নাম হলো— বিষ্঵রেখা (Equator), 0° অক্ষরেখা (0° Latitude), $\frac{9}{5}$ মহাবৃত্ত (Great circle)।



কর্কটকাণ্ঠি ও মকরকাণ্ঠি রেখা : উভর গোলার্ধে 23.5° উভর অক্ষরেখাকে কর্কটকাণ্ঠি রেখা এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 23.5° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে মকরকাণ্ঠি রেখা বলে। আমাদের বাহ্যাদেশের উপর দিয়ে কর্কটকাণ্ঠি রেখা অতিক্রম করেছে। এই দুটি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সূর্যের আগো লম্বভাবে পৃথিবীতে পড়ে।

চিত্র ২.১০ : পৃথিবীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা এবং মূল মধ্যরেখা

সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত : উভর গোলার্ধে 66.5° উভর অক্ষরেখাকে সুমেরুবৃত্ত এবং 66.5° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরুবৃত্ত বলে (চিত্র ২.১০)।

কাজ : প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজধানী অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে বের কর।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

দ্রাঘিমারেখার নিয়মানুসারে মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে অগ্রসর হলে প্রতি 1° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। আমরা জানি 0° দ্রাঘিমার ঠিক উল্টো দিকে 180° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা।

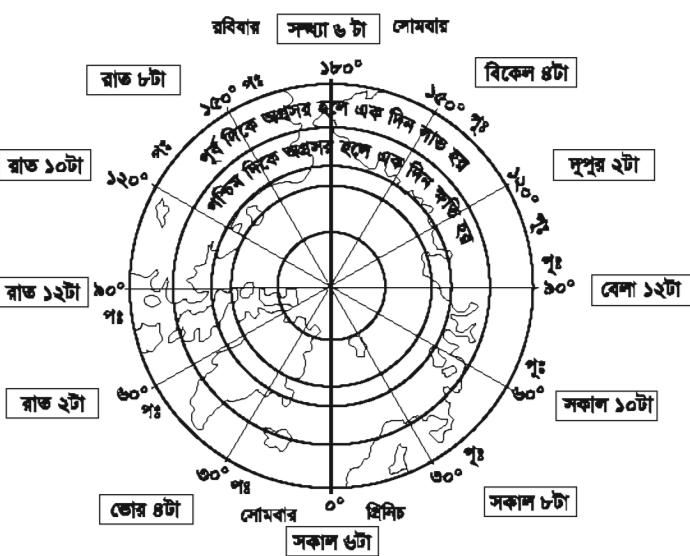
যেহেতু প্রতি 1° -এর জন্য ৪ মিনিট সেহেতু 180° -এর জন্য $180 \times 4 = 720$ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার পার্থক্য হয়। এভাবে দুই দিকে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১২ ঘণ্টা করে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধান হয়। পূর্ব দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা বাড়ে আর পশ্চিম দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা কমে অর্থাৎ একই দ্রাঘিমায় 180° তে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয় ২৪ ঘণ্টা।

এর জন্য তারিখ ও বারের যে সমস্যা হয় তার সমাধানকল্পে ১৮৮৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ‘দ্রাঘিমা ও সময়’ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 180° দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে স্থির করা হয় (চিত্র ২.১১)।

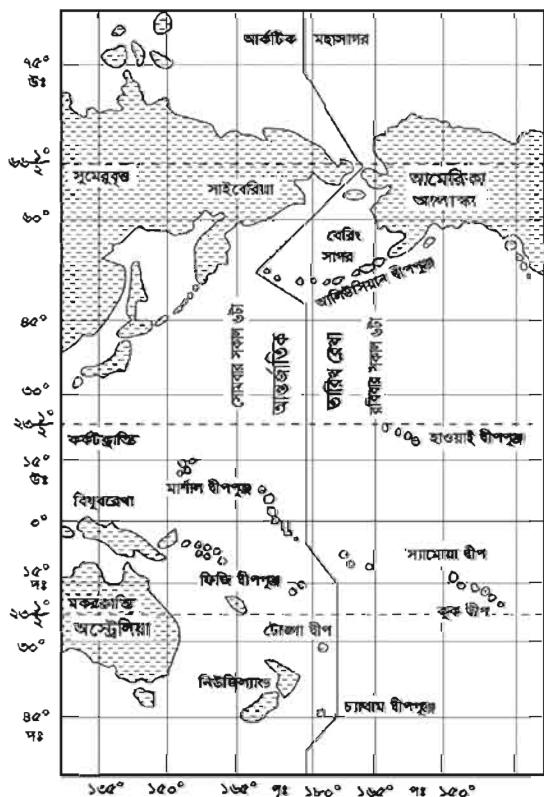
আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাই, গ্রিনিচে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৬টা হলে আমরা যদি পূর্ব দিকের সময় হিসাব করি তাহলে যখন 180° পূর্ব দ্রাঘিমায় আসব তখন সেখানে সময় হবে ১৬ই ডিসেম্বর সম্মত্যা ৬টা। ঠিক ০৫^{৩০} উল্টো দিকে পশ্চিমে 180° তে আসলে সেখানে ১৫ই ডিসেম্বর সম্মত্যা ৬টা হবে। কারণ পূর্ব দিকে সময়

বাঢ়ি আৰ পশ্চিম দিকে সময় কমে। আমৱা জানি 180° পূৰ্ব ও 180° পশ্চিম একই জ্যান। তবে এখানে সময়েৱ পাৰ্শ্বক্য হয়ে যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টা এবং তাৱিখও হয়ে যাচ্ছে দুই রকম। এই অসুবিধা দূৰ কৱাৱ জন্য পৃথিবীৰ মানচিত্ৰে প্ৰশান্ত মহাসাগৱেৱ উপৱ দিয়ে 180° দ্বাইমা অনুসৱণ কৱে আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা প্ৰৱৰ্তন কৱা হয়েছে।

পশ্চিমগামী জাহাজ আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা অতিক্ৰমকালে ঘড়িৰ সময় একদিন বাড়িয়ে অৰ্থাৎ সেদিন সোমবাৱ থাকলে তাকে মজলিবাৱ কৱা হয়। আৰ জাহাজ যদি পূৰ্ব দিকে যায় তাহলে একদিন বিয়োগ কৱতে হয়। সেদিন মজলিবাৱ হলে একদিন কমিয়ে সোমবাৱ কৱা হয়। তাই আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা অতিক্ৰম কৱাৱ সূত্ৰ হলো : ‘পশ্চিমগামী যানেৱ জন্য একদিন যোগ কৱতে হবে এবং পূৰ্বগামী যানেৱ ক্ষেত্ৰে একদিন বিয়োগ কৱতে হবে।’



চিত্ৰ ২.১১ : আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা ও হনীয় সময়েৱ পাৰ্শ্বক্য



চিত্ৰ ২.১২ : আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা

180° দ্বাইমাৱেখা পৃথিবীৰ পশ্চিম বা পূৰ্ব গোলাৰ্দেৱ তাৱিখ বিভাজিকাৱ (Date line divider) কাজ কৱে। এজন্যই 180° দ্বাইমাৱেখাকে আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখা বলে (চিত্ৰ ২.১২)।

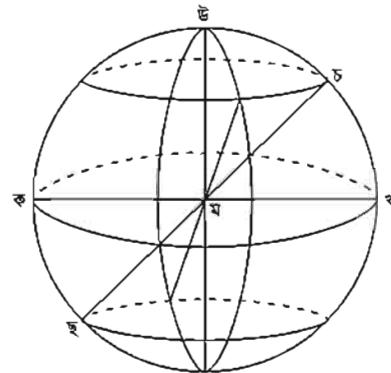
আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখাকে কোথাও কোথাও বাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাৱণ এ রেখাকে 180° দ্বাইমাৱেখা অনুসৱণ কৱে প্ৰশান্ত মহাসাগৱেৱ উপৱ দিয়ে টানা হলেও সাইবেৱিয়ায় উভন-পূৰ্বাংশ এবং অ্যালিটিসিয়ান, ফিজি এবং চ্যাথাম দ্বিপপুজ্জেৱ স্থলভাগকে এড়িয়ে চলাৱ জন্য এই রেখাটিকে অ্যালিটিসিয়ান দ্বিপপুজ্জেৱ কাছে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বিপপুজ্জে 11° পূৰ্ব দিয়ে বৈকে এবং বেরিং প্ৰণালিতে 12° পূৰ্বে বৈকে শুধু পানিৱ উপৱ দিয়ে টানা হয়েছে। তা না হলে হনীয় অধিবাসীদেৱ বাৱ নিৰ্ণয় কৱতে অসুবিধা হতো। কাৱণ একই হনীয়েৱ মধ্যেই সময় এবং বাৱ দুই রকম হতো।

কাজ : মানব-জীবনে আন্তৰ্জাতিক তাৱিখ রেখাৰ গুৰুত্ব লেখ (জোড়াভাবে)।

প্রতিপাদ স্থান (The antipodes) : আমরা জানি পৃথিবী গোল তাই এর কোনো একটি স্থানের বিপরীত দিকে অন্য কোনো একটি স্থান রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোনো কমিত ব্যাস ভূকেন্দ্র তেদ করে অপরদিকে ভূপৃষ্ঠকে যে বিস্তৃত স্পর্শ করে সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুটির প্রতিপাদ স্থান বলে (চিত্র ২.১৩)।

কোনো বিশেষ মুদ্রিমায় অবস্থিত স্থান সেই স্থানের বিপরীত মুদ্রিমান্তরেখায় অবস্থিত হয়। অর্ধাং দুই মুদ্রিমার ঘোগফল হবে 180° । যেহেতু দুই মুদ্রিমার দূরত্ব হবে 180° সেহেতু দুটির মধ্যে সমন্বয় পার্থক্য হবে (180×8 মিনিট = 720 মিনিট বা 12 ঘণ্টা) = 12 ঘণ্টা। চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান ছ বিন্দু।

কাজ : দলগতভাবে তোমরা ভূগোলকের সাহায্যে ঢাকার প্রতিপাদ স্থান বের কর।



চিত্র ২.১৩ : প্রতিপাদ স্থান

পৃথিবীর গতি (The Movement of the Earth)

পূর্বে মনে করা হতো পৃথিবী স্থির এবং সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘূরছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে। পৃথিবী শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, নিজ অক্ষ বা মেরুক্রেখার উপরও আবর্তন করে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার। নিজ অক্ষের উপর একদিনে আবর্তন করাকে আক্রিক গতি (Rotation) এবং কক্ষপথে এক বছরে সূর্যকে পরিক্রমণ করাকে বার্ষিক গতি (Revolution) বলে।

আক্রিক গতি (Rotation)

পৃথিবী গতিশীল। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পঞ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর এই আবর্তন গতিকে দৈনিক গতি বা আক্রিক গতি বলে। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পঞ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘণ্টা অর্ধাং একদিন। একে সৌরদিন বলে।

পৃথিবীর আক্রিক গতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। পৃথিবীগৃষ্ঠ পুরোপুরি গোল না হওয়ায় এর পৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। সে কারণে পৃথিবীগৃষ্ঠের সকল স্থানের আবর্তন বেগও সমান নয়। নিরক্ষেপে পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি। এজন্য নিরক্ষেপে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি। ঘণ্টায় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার। ঢাকায় পৃথিবীর আক্রিক গতির বেগ ১৬০০ কিলোমিটার। যত মেরুর দিকে যাবে এ আবর্তনের বেগ তত কমতে থাকে এবং মেরুয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

পৃথিবীর আবর্তন গতি থাকা সম্ভব আমরা কেন পৃথিবীগৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ি না বা তা অনুভব করি না। এর কারণ হলো :

- ১। ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করার কারণে মানুষ, জীবজন্তু, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি পৃথিবীর সঙ্গে একই গতিতে আবর্তন করছে, তাই আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করতে পারি না।

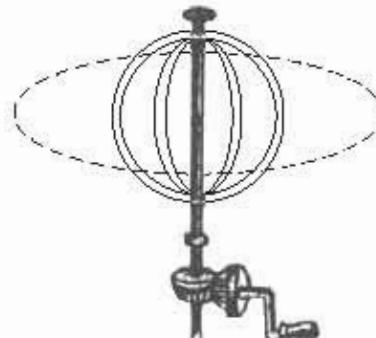
- ২। হ্যাঁচে অবস্থিত সকল বস্তুকে পৃথিবী অভিকর্ষ বল দ্বারা নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ি না।
- ৩। পৃথিবীর আবর্তনের ফুলনার আমরা এত বেশি ঝুঁত বে এই গতি অনুভব করি না বা ছিটকে পড়ি না।
- ৪। পৃথিবীর প্রতিটি ঘূনের আবর্তন গতি সুনির্দিষ্ট ভাই আমরা গতি অনুভব করি না।
- ৫। সূচি বস্তুর মধ্যে একটি বদি দাঁড়িয়ে থাকে এবং অন্যটি বদি চলতে থাকে তাহলে বোধ দার তার গতি আছে। এভাবে পৃথিবীর সামনে দিয়ে বা সমান কোনো বস্তু নেই বাব সাপেক্ষে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি বুঝতে পারি।

আহিক গতির প্রমাণ (Proofs of Rotation)

পৃথিবী বে নিজের মেঘালভে উপর পাঁচম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে তার প্রমাণ হলো :

- ১। মহাকাশবালের পাঠানো ছবি : পৃথিবী থেকে বেসব উপর ও মহাকাশবাল পাঠানো হয়েছে সেগুলোর প্রেমিত ছবি থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবী পাঁচম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এ ছবিগুলোই পৃথিবীর আবর্তন বা আহিক গতির সর্বাধুনিক ও নির্ভুল প্রমাণ।

- ২। পৃথিবীর আকৃতি : কোনো নমনীয় বস্তু বদি নিজের অক্ষের উপর সাটিয়ের মতো স্বীকৃতে থাকে তবে তার মধ্যে একই সঙ্গে কেন্দ্রমুরী (Centripetal) এবং কেন্দ্রবিমুরী (Centrifugal) বলের উভয় হয়, যার ফলাফল বস্তুর প্রান্তদেশ কিছুটা চাপা ও মধ্যভাগ কিছুটা স্কীভ হয়। আবর্তন গতির ফলাফলেই অন্যকালে নমনীয় পৃথিবীর উভয় ও দক্ষিণ মেরু একটু চাপা এবং মধ্যভাগ সামান্য স্কীভ হয়ে যায়। বিজ্ঞানী নিউটন বলেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই এর আকৃতি এমন হয়েছে (চিত্র ২.১৪)।



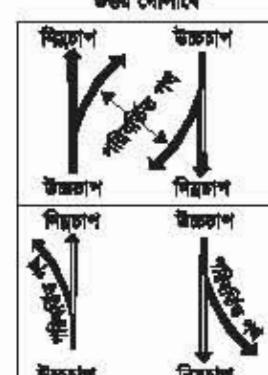
চিত্র ২.১৪ : পৃথিবীর আকৃতি

- ৩। গ্রাত-সিদ্ধ হওয়া : পৃথিবীর বেশিরভাগ ঘূনেই পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতি হয়। অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত পৃথিবীর আহিক গতির অন্তর্ভুম প্রমাণ। এ আহিক গতি না থাকলে পৃথিবীর একদিক চিরকাল অন্ধকারে থাকত এবং অপরদিক আলোকিত হয়ে থাকত।

- ৪। কেজেলের সূর্যের স্থান্ত্বে : আমরা জানি সমুদ্রস্তোত্ত এবং বায়ুপ্রবাহ উভয় গোলার্ধে ভান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বৈকে থায়। এই বৈকে থায়েরাটা কেজেলের সূর্য নামে পরিচিত। বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রস্তোত্তের এই গতিবেগ প্রমাণ করে বে, আহিক গতিতে পৃথিবী পাঁচম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে (চিত্র ২.১৫)।

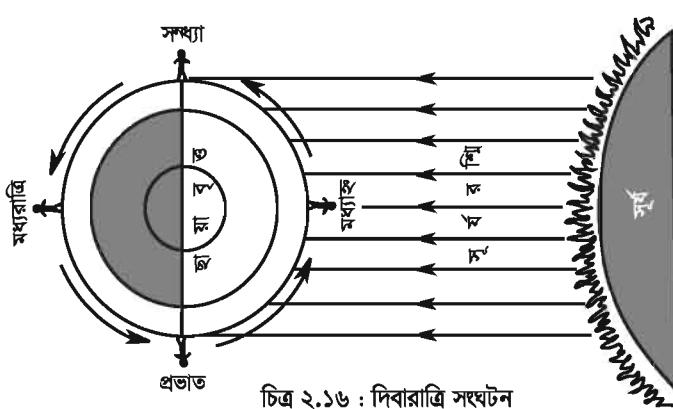
আহিক গতির ফল (The results of Rotation) : পৃথিবীর আহিক গতির কারণে যেসব পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই তা হলো—

- ১। পৃথিবীতে দিবারাত্রি সংবেচন : পর্যায়ক্রমে দিস্যাত্রি সংবেচন হওয়া পৃথিবীর আহিক গতির একটি ফল। আমরা জানি পৃথিবী গোল এবং এর নিজের কোনো আলো নেই।



চিত্র ২.১৫ : কেজেলের সূর্য

সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর যেদিক সূর্যের সামনে আসে, সেদিক সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। তখন এই আলোকিত স্থানসমূহে দিন। আলোকিত স্থানের উল্টা দিকে অর্ধাংশ পৃথিবীর যেদিকটা সূর্যের বিপরীত দিকে, সেখানে সূর্যের আলো পৌছায় না, সেদিকটা অন্ধকার থাকে। এসব অন্ধকার স্থানে তখন রাত্রি (চিত্র ২.১৬)।



চিত্র ২.১৬ : দিবারাত্রি সংযোগ

পৃথিবীর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের ফলে আলোকিত দিকটি অন্ধকারে আর অন্ধকারের দিকটি সূর্যের দিকে বা আলোকে চলে আসে। ফলে দিনরাত্রি পাল্টে যায়। অন্ধকার স্থানগুলো আলোকিত হওয়ার ফলে এসব স্থানে দিন হয়। আর আলোকিত স্থান অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে এইসব স্থানে রাত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি সংযোগ হতে থাকে, কোনো স্থানে ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়।

২। জোয়ার-ভাটা সূর্ণ্টি : আঙ্কিক গতির ফলেই জোয়ার-ভাটা সংযোগ হচ্ছে। আমরা দেখি প্রতিদিন জোয়ার-ভাটা একই সময়ে হচ্ছে না। আজকে জোয়ার যে স্থানে যে সময়ে হচ্ছে পরের দিন সেই সময়ে না হয়ে তার ৫২ মিনিট পরে হচ্ছে। এই যে সময়ের ব্যবধান সেটা আঙ্কিক গতির কারণেই হচ্ছে।

৩। বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্তোত্রের সূর্ণ্টি : পৃথিবীর অঙ্গিত গোলকের কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উভয় মেরুর দিকে অক্ষরেখাগুলোর পরিধি ও পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগে ক্রমশ কমতে থাকে। এসব কারণে পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ বা সমুদ্রস্তোত্রের গতির দিক সরাসরি উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে না হয়ে উভয়র গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

৪। তাপমাত্রার তারতম্য সূর্ণ্টি : দিনের বেলায় সূর্যের ক্রিয় থাকার কারণে তাপমাত্রা বেশি থাকে। রাত হলে তাপ বিকিরণ করে তাপমাত্রা কমে যায়। যদি আঙ্কিক গতি না থাকত তাহলে এভাবে দিনের পর রাত আসত না এবং তাপমাত্রার তারতম্য সূর্ণ্টি হতো না। এই তাপমাত্রার তারতম্য হলো আঙ্কিক গতির একটি ফল।

৫। সময় গণনা বা সময় নির্ধারণ : আঙ্কিক গতির ফলে সময়ের হিসাব করতে সুবিধা হয়। একবার সম্পূর্ণ আবর্তনের সময়ের ২৪ ভাগের এক ভাগকে ঘণ্টা ধরে তার ৬০ ভাগের ১ ভাগকে মিনিট। মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগকে সেকেন্ড এভাবে সময় গণনা করা হয়।

৬। উষ্ণিদ ও প্রাণিজগৎ সূর্ণ্টি : পৃথিবীর আবর্তনের কারণেই পৃথিবীর সব জায়গায় পর্যায়ক্রমে সূর্যালোক পড়ে এবং দিনরাত্রি হয়। উষ্ণিদ ও প্রাণীর জন্য সূর্যালোকই বেশি প্রয়োজন। দিনের বেলায় সূর্যালোক থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং রাতে এই শক্তি নিজেদের শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগায়। কোনো প্রাণী দিনে আবার কোনো প্রাণী রাতে খাদ্য সংগ্রহ করে। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে দিনরাত্রি সংযোগ হয় তার উপরই উষ্ণিদ ও প্রাণিজগতের নিয়মশূল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

বার্ষিক গতি (Revolution)

সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অবিরাম ঘূরতে ঘূরতে একটি নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দিকে (ঘড়ির কাঁচার বিপরীতে) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে ঘূরছে। পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতি বলে।

একবার সূর্যকে পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে সৌরবছর বলে। কিন্তু আমরা ৩৬৫ দিনকে এক বছর ধরি। এতে প্রতি বছর প্রায় ৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত থেকে যায়। এ অতিরিক্ত সময়ের সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রতি ৪ বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বাড়িয়ে সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়। এভাবে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ১ দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং এই বছরটিকে ৩৬৬ দিন ধরা হয়। সেই বছরকে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলে। সাধারণত কোনো বছরকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ না থাকে তবে এসব বছরকে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার (Leap Year) ধরা হয়।

কাজ : ২০১৩ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে কোন কোন বছরটি লিপ ইয়ার নির্ণয় কর।

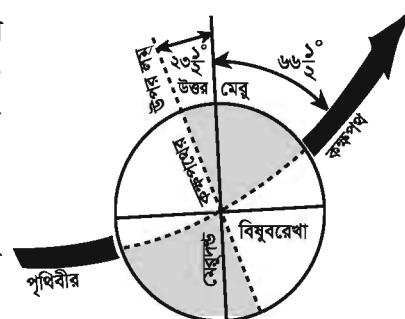
বার্ষিক গতির ফল (The results of Revolution) : বার্ষিক গতির ফল হলো— (১) দিবারাত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি, (২) ঝাতু পরিবর্তন।

দিবারাত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবীর দিবারাত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ—

(ক) পৃথিবীর অভিগত গোলাকৃতি; (খ) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ; (গ) পৃথিবীর অবিরাম আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি; (ঘ) পৃথিবীর মেরুরেখার সর্বদা একই মুখে অবস্থান; (ঙ) পৃথিবীর কক্ষপথে কোণিক অবস্থান।

সূর্যকে প্রদক্ষিণের সময় পৃথিবী আপন মেরুরেখায় কক্ষপথের সঙ্গে 66.5° কোণে হেলে থাকে। পৃথিবী 66.5° কোণ করে চলার কারণে ২১এ মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরপর ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণ উভর গোলার্ধের দিকে যেতে থাকে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে ২১এ জুন পৃথিবী এমন এক জ্যায়গায় আসে যে তখন সূর্যের রশ্মি ভূগুঠের 23.5° উভর অক্ষাংশে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পড়ে (চিত্র ২.১৭)। এ সময় উভর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে। সে কারণে এই সময় উভর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রাও বেশি হয়ে থাকে। উভর গোলার্ধে ২১এ জুন দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত হয়। ২১এ জুন সূর্য উভরায়ণের শেষ সীমায় পৌছায়, একে কর্কটসংক্রান্তি বলে।

২৩এ সেপ্টেম্বর পুনরায় ২১এ মার্চের মতো সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেদিন সর্বত্র দিবারাত্তি সমান থাকে। ২৩এ সেপ্টেম্বর থেকে আবার সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে কিরণ বেশি দিতে থাকে। ২২এ ডিসেম্বর এমনভাবে কোণ করে থাকে তাতে দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং উভর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন হয়।



চিত্র ২.১৭ : পৃথিবীর কক্ষপথে কোণিক অবস্থান

২২এ ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌছায়, একে মকরসংক্রান্তি বলে। এ সময় সূর্যের রশ্মি 23.5° দক্ষিণ অক্ষাংশ অর্থাৎ মকরক্রান্তির উপর লম্বত্বাবে পতিত হয়।

২১এ মার্চ এবং ২৩এ সেপ্টেম্বর নিরক্ষরেখার উপর সূর্য লম্বত্বাবে ক্রিয় দেয়। এই দুদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। সেদিনকে বিষুব (Equinox) বলে। ২১এ মার্চ উভর গোলার্ধে বসন্তকাল তাই একে বাসন্ত বিষুব (Vernal equinox) বলে। ২৩এ সেপ্টেম্বর উভর গোলার্ধে শরৎকাল। তাই এই দিনকে শারদ বিষুব (Autumnal equinox) বলে।

বার্ষিক গতির প্রমাণ (Proofs of Revolution)

১। রাতের আকাশে নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন, অন্তর্ধান ও পুনরাগমন : বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। মেঘমুক্ত আকাশে কয়েকদিন পর পর লক্ষ করলে নক্ষত্রের পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে সরে যাওয়া বোঝা যায়। এরপর একদিন এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক এক বছর পর এরা আদি স্থানে ফিরে আসে। এ থেকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি আছে তা বোঝা যায়।

২। আকাশে সূর্যের পরিবর্তিত অবস্থান : বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থানে দেখা যায়। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে একই জায়গা থেকে উঠে না এবং পশ্চিম আকাশে একই জায়গায় অস্ত যায় না। বছরের ছয় মাস সূর্য একটু একটু করে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। বাকি ছয় মাস সূর্য একটু একটু করে উভর দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। পৃথিবী একই জায়গায় স্থির থেকে ঘূরলে প্রতিদিনই সূর্য একই জায়গায় উদিত হতো। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে এ ঘটনা ঘটে।

৩। বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণ গতি : দুরবিনের সাহায্যে পৃথিবী থেকে দেখা গেছে সকল গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবীও একটি গ্রহ সুতরাং এরও পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি রয়েছে।

৪। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা : আধুনিক যুগের মহাশূন্যচারীগণ মহাশূন্যব্যান থেকে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি দেখেছেন।

৫। মহাকর্ষ সূত্র : সূর্যের তুলনায় পৃথিবী খুবই ক্ষুদ্র, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তাই স্বাভাবিক কারণে সূর্যের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘূরছে।

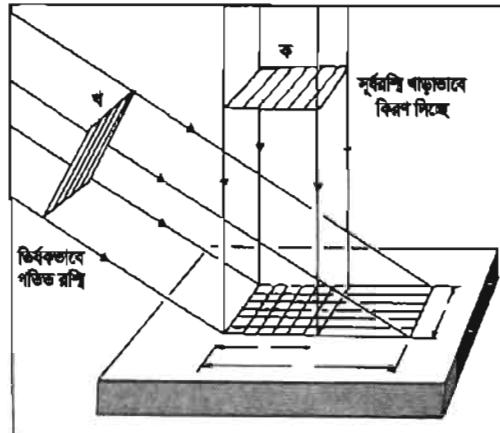
ঋতু পরিবর্তন (Change of season)

তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারাবছরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ প্রতিটি ভাগকে এক একটি ঋতু বলে। তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারাবছরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো— গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। আমরা জানি, সমগ্র পৃথিবীকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে। নিরক্ষরেখার উপরের দিকের অংশকে উভর গোলার্ধ এবং নিচের দিকের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। উভর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আবার উভর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। তেমনি উভর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শরৎকাল। আবার উভর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উভর গোলার্ধে। এখানে জুন মাসের দিকে গরম বেশি অনুভূত হয়। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।

ঝুঁতু পরিবর্তনের কারণ (Causes of changing season) : পৃথিবীতে ঝুঁতু পরিবর্তনের কারণ হলো—

- (১) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিবারাত্রির ভারতমের জন্য উভাপের ছাস-বৃশি : পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পৃথিবীর যে গোলার্দের নিকট অবস্থান করে তখন সেই গোলার্দে দিন বড় এবং রাত ছোট। তার বিপরীত গোলার্দে রাত বড়, দিন ছোট। পৃথিবী দিনের বেলায় তাপ গ্রহণ করে ফলে ভূগৃষ্ঠ উভাষ্ঠ হয় এবং রাতের বেলায় বিকিরণ করে শীতল হয়। তখন একটি স্থানে বড় দিনে ভূগৃষ্ঠ যে তাপ গ্রহণ করে ছোট রাতে সে তাপ পুরোটা বিকিরণ করতে পারে না। এ স্থানে সঞ্চিত তাপের কারণে আবহাওয়া উষ্ণ হয় এবং তাতে শ্রীমকালীন আবহাওয়া পরিসংক্ষিত হয়। বিপরীত গোলার্দে রাত বড় এবং দিন ছোট হওয়াতে দিনের বেলায় যে তাপ গ্রহণ করে রাতের বেলায় সব তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা অনুভূত হয় তখন শীতকাল।
- (২) পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি : পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও ত্রিয়কভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় এবং ঝুঁতু পরিবর্তিত হয়।
- (৩) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষগৰ্থ : পৃথিবীর আবর্তন পথ উপবৃত্তাকার তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমবেশি হয়। এতে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়, তাই ঝুঁতু পরিবর্তিত হয়।

- (৪) পৃথিবীর কক্ষগৰ্থে কৌণিক অবস্থান : সূর্যকে পরিক্রমণের সময় নিজ কক্ষগৰ্থের সঙ্গে পৃথিবীর মেরুরেখা সমকোণে না থেকে 66.5° কোণে হেলে একই দিকে অবস্থান করে। এতে বছরে একবার পৃথিবীর উভর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হয়। যে গোলার্দে যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে সে গোলার্দে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। তার তাপমাত্রা তখন বেশি হয় এবং দুরে গেলে তাপমাত্রা কম হয়, ফলে ঝুঁতু পরিবর্তন ঘটে (চিত্র ২.১৮)।



চিত্র ২.১৮ : 'ক' স্থানে লম্বভাবে পড়া সূর্যরশ্মি 'খ' স্থানে ত্রিয়কভাবে পড়া সূর্যরশ্মির ভূলনায় বেশি উষ্ণ হয়

- (৫) বার্ষিক গতির কারণে : পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য সূর্যকিরণ বিভিন্ন স্থানে কমবেশি পড়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিভিন্নতা হয়। একে ঝুঁতু পরিবর্তন বলে।

ঝুঁতু পরিবর্তন প্রক্রিয়া (The process of changing season) : আমরা জানি, পৃথিবীতে চারটি ঝুঁতু— শ্রীমকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। আমরা এখন দেখব ঝুঁতু কীভাবে পরিবর্তিত হয়। সূর্যকে পরিক্রমকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থা থেকে ঝুঁতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উভর গোলার্দে শ্রীমকাল ও দক্ষিণ গোলার্দে শীতকাল : ২১এ মার্চের পর থেকে পৃথিবী তার নিজ কক্ষগৰ্থে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উভর মেরু ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যায় তত উভর মেরুতে আগোকিত ঘণ্ট বাঢ়তে থাকে। এভাবে ২১এ জুনে গিয়ে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে

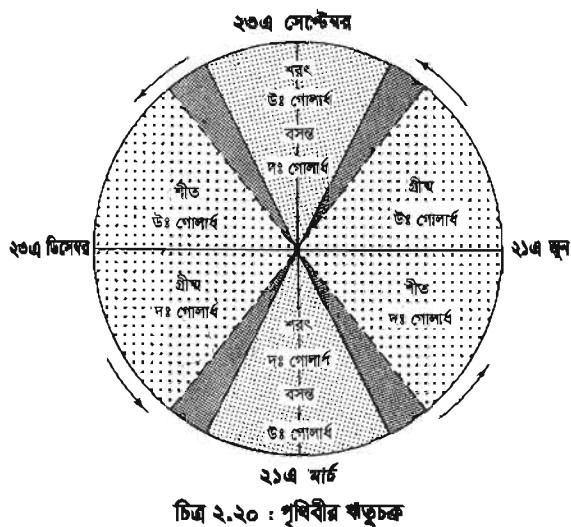
କିମ୍ବଣ ଦିନଟେ ଥାକେ । ଫଳେ ୨୧୬ ଜୁଲାଇ ଶୋଳାର୍ଥେ ସ୍ଵର୍ଗ ଏବଂ ଛୋଟ ରାତ ହୁଏ । ଏ ଦିନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାହିତେର ଶେଷ ଏବଂ ତାର ପରେର ଦିନ ଥେବେ ପୁନଃାର ଶୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିନଟି ଆସନ୍ତେ ଥାକେ । ଦିନ ବଢ଼ି ହେଉଥାର କାରଣେ ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ୨୧୬ ଜୁଲାଇ ଦେଖୁ ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଶୀଘ୍ରକାଳ ଶୂର୍ବ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଠିକ ବିଶ୍ଵାସ ଅବହ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ରକାଳ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏ ସମୟ ଶୂର୍ବ ହେଲେ ଥାକନ୍ତେ କାରଣେ ଏ ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୂର୍ବ କମ ସମୟ ଧରେ କିମ୍ବଣ ଦେଇ । ଫଳେ ଦିନ ଛୋଟ ଏବଂ ରାତ ବଢ଼ି ହୁଏ । ଦିନେ କୁଞ୍ଚିତ ବଢ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ହୁଏ, ରାତରେ ଭାଗ ବିକିରିତେ କଲେ ତା ଠାତା ହେବେ ଯାଇ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭଦ୍ର ଶୀଘ୍ରରେ ଆବହାନ୍ତରେ ଯିବାଜ କରନ୍ତେ । ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଏ ସମୟକେ ଶୀଘ୍ରକାଳ ବଲେ (ଚିତ୍ର ୨.୧୬) ।

ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୂର୍ବକାଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ବସନ୍ତକାଳ : ୨୧୬ ଜୁଲାଇ ଥେବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିନଟି ହେଲେଥାଇ । ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଅଣ୍ଟାଲୁମୋ କମ କିମ୍ବଣ ଶେଷ ଥାକେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଅଣ୍ଟାଲୁମୋ ବେଳି ଶୂର୍ବକିରଣ ଶେଷ ଥାକେ । ଧାରାବେ ୨୩୬ ଏ ସେଟେହାର ଶୂର୍ବ ନିରକର୍ତ୍ତାରେ ଉତ୍ତର ଶସ୍ତରାବେ କିମ୍ବଣ ଦେଇ । ତାହିଁ ଏ ସମୟ ଶୂର୍ବିରୀର ସର୍ବତ୍ର ଦିନ ଓ ରାତି ସମାନ ହୁଏ । ଦିନେର ବେଳାଯ ଯେ ଭାଗ ଆସେ ରାତ ସମାନ ହେଉଥାର ଏକଇ ପରିମାଣ ଭାଗ ବିକିରିତ ହେଉଥାର ଶୂର୍ବୋଗ ପାଇ । ଫଳେ ଆବହାନ୍ତରେ ଠାତା ପରମେର ପରିମାଣ ସମାନ ଥାକେ । ଏହି ସମୟ ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଶସ୍ତରକାଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ବସନ୍ତକାଳ ବିରାଜ କରନ୍ତେ । ୨୩୬ ଏ ସେଟେହାର ଦେଖୁ ମାତ୍ର ପରିଷତ୍ତ ଏହି ଶୂର୍ବକାଳ ଶୂର୍ବ ଥାକେ ।



ଚିତ୍ର ୨.୧୬ : ଶୂର୍ବିର ପରିକର୍ମା - ଦିନରାତିର ତ୍ରାସ-ବୃଦ୍ଧି ଓ କୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୀଘ୍ରକାଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୀଘ୍ରକାଳ : ୨୩୬ ସେଟେହାର ପର ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ କ୍ରମିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିନଟି ହେଲେଥାଇ । ଏହି ସମୟ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ କ୍ରମିକ ଶୂର୍ବକାଳ କାହେ ଆସନ୍ତେ ଥାକେ । ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଦୂରେ ସରନ୍ତେ ଥାକେ । ଫଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୂର୍ବ ନିରକର୍ତ୍ତାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ କୋଣ କରେ କିମ୍ବଣ ଦିନଟି ଥାକେ । ଏତେ ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଦିନ ଛୋଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଦିନ ବଢ଼ି ଏବଂ ରାତ ଛୋଟ ହେଲେ ଥାକେ । ଏହି ମଧ୍ୟେ ୨୨୬ ଡିସେମ୍ବର ଶୂର୍ବକାଳ ହେଟି ଦିନ ଓ ବଢ଼ି ରାତ ହେଲେ ଶୀଘ୍ରକାଳ । ଏ ଦିନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଦିରାଘନ୍ତେ ଶେଷ ଏବଂ ତାର ପରେର ଦିନ ଥେବେ ପୁନଃାର ଶୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିନଟି ଆସନ୍ତେ ଥାକେ । ୨୨୬ ଡିସେମ୍ବର ଦେଖୁ ମାତ୍ର ପରିଷତ୍ତ ଏହି ଉତ୍ତର ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୀଘ୍ରକାଳ ଶୂର୍ବ ହୁଏ । ଏହି ସମୟଟାତେ ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଳାର୍ଥେ ଶୀଘ୍ରକାଳ ।



উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : পৃথিবী তার কক্ষপথে চলতে চলতে ২২এ ডিসেম্বরের পর থেকে ২১এ মার্চ পর্যন্ত এমন স্থানে ফিরে আসে যখন সূর্য নিরক্ষেপণার উপর সম্ভাবে ক্রিয় দিতে থাকে। ফলে ২১এ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। দিনের বেগাম সূর্যক্রিয়ের কারণে অন্ধকারের বায়ুতের গ্রন্থ হয় এবং রাত্রিবেগাম বিকিরিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল। ২১এ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় এবং এ দিনটিকে বাসন্ত বিষুব বা মহাবিশ্ব বলে (চিত্র ২.২০)।

ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব (Impact of changing season)

- ঋতু পরিবর্তন মানুষের দৈনন্দিন জীবনমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পেশাকে প্রভাবিত করে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ঋতু পরিবর্তনের ফলে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।
- ঋতু পরিবর্তন জীবজগতের বৃক্ষ, বিভাস নিয়ন্ত্রণ করে।
- ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ সংঘটিত হয়।

কাজ : দলগতভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।

উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে কী সংষ্ঠিত হয়?

সময়	সূর্যের পরিক্রমণকালে পৃথিবীর ভৌগোলিক রেখার উপর সম্ভাবে ক্রিয়	দিনরাত্রির তথ্য	ঋতুর নাম
২১এ জুন	কক্টকাণ্ডি রেখা		
২৩এ সেপ্টেম্বৰ	নিরক্ষেপণা		
২২এ ডিসেম্বর	মক্রকাণ্ডি রেখা		
২১এ মার্চ	নিরক্ষেপণা		

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন গ্রহের ২৭ টি উপগ্রহ আছে?

- | | |
|-----------|--------------|
| (ক) মঙ্গল | (খ) বৃহস্পতি |
| (গ) শনি | (ঘ) ইউরেনাস |

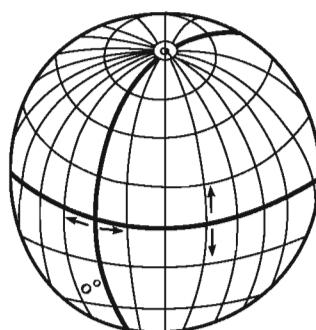
২। আহিক গতির ফলে—

- পৃথিবীতে দিবারাত্রি সংঘটিত হয়
- খতু পরিবর্তন হয়
- তাপমাত্রার তারতম্য স্ফুর্তি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর অশ্লের উত্তর দাও :



৩। উপরের চিত্রে উল্লম্বভাবে আঁকা রেখাগুলোর মধ্যে 0° দ্বারা চিহ্নিত রেখা কোনটি?

- | | |
|------------------|------------------------|
| (ক) নিরক্ষরেখা | (খ) মেরুরেখা |
| (গ) মূল মধ্যরেখা | (ঘ) কর্কটক্রান্তি রেখা |

৪। উক্ত রেখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের সাহায্যে—

- স্থানের স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় নির্ণয় করা যায়
- কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায়
- সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

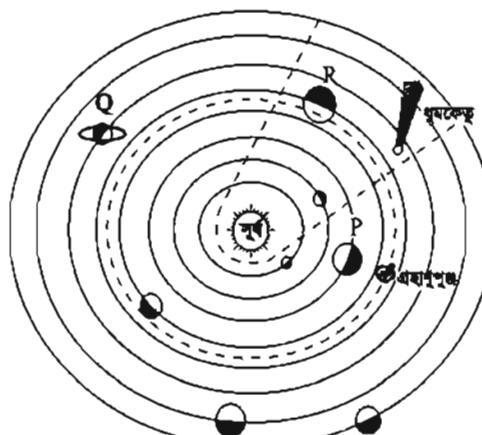
(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১।



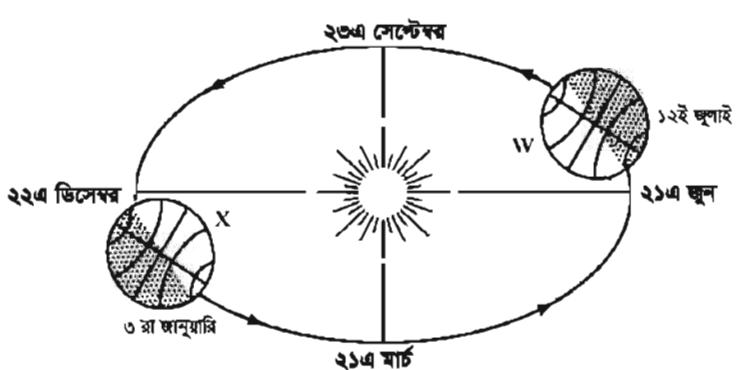
ক. চন্দ্র কী?

খ. নিরক্ষরেখা বলতে কী বোঝায়?

গ. 'P' চিহ্নিত গ্রহটি জীবের জন্য বসবাস উপযোগী কেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত গ্রহ দুটির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।



ক. উভয় গোলার্ধে বড় দিন কোনটি?

খ. অধিবর্ষ বলতে কী বোঝায়?

গ. 'W' অবস্থানে দিনরাত্তির কী ধরনের পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা কর।

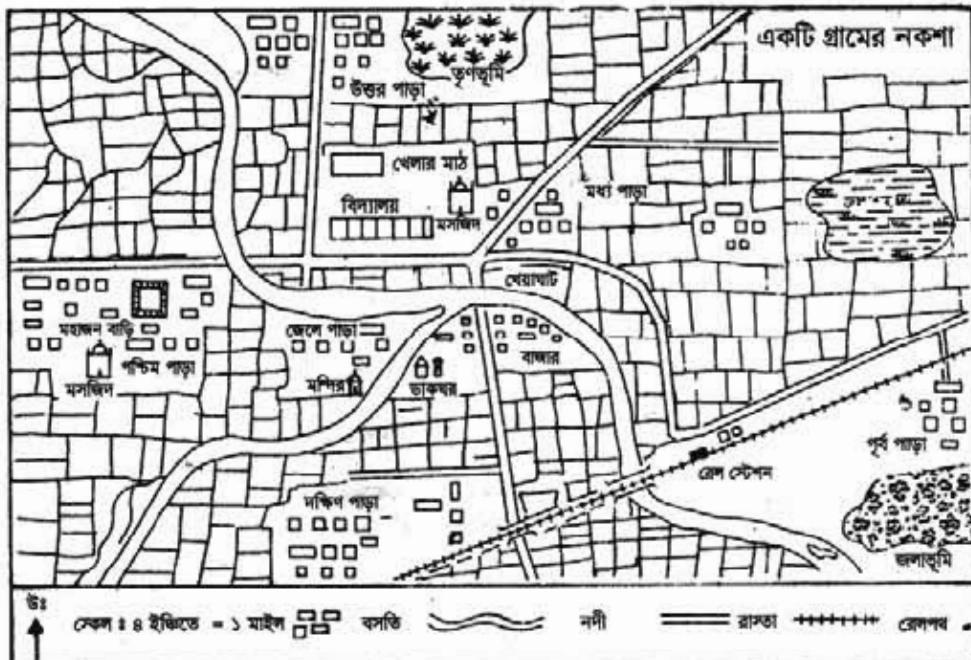
ঘ. পৃথিবীর পরিক্রমকালে 'W' এবং 'X' অবস্থানে কি একই ধরনের ক্ষতৃ পরিস্কিত হয়? বিশ্লেষণ ১০
কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার

Map Reading and Its Uses

মানচিত্র একজন সূর্যোদয়িদের জন্য একটি অফিচিয়েল টুলকরণ (Tools)। এর সাহায্যে সমস্যা গৃহিণীকে বা কোনো অঞ্চল সর্বশেষ সূচিপ্রতি জ্ঞান দাত করা যাব। একটি মানচিত্রের মধ্যে আমরা সমস্যা গৃহিণীকে অথবা এর কোনো এক অঞ্চলকে দেখাতে পারি। আমরা কোনো একটি কালেজের মধ্যে মানচিত্র এইকে সেখানে ঠিক নিরে সেই অঞ্চলের অবস্থা সর্বশেষ বুঝাতে পারি। একটি মানচিত্র যে কেবল সূর্যোদয়িদের প্রয়োজন হয় তা নয়। এটি আম সকল মানুষের বিশেব করে পর্যটক, প্রশাসক, পরিবহনবিদ, ইণ্ডিনিয়ার, কৃষিবিদ, আবহাওবিদ এবনকি সাধারণ মানুষেরও বিশেব প্রয়োজনে দাগে। এ অধ্যায়ে মানচিত্র, এর প্রকারভেদ, পুরুষ, ব্যবহার, স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়াণ সময় ইত্যাদি নিরে আলোচনা করব।

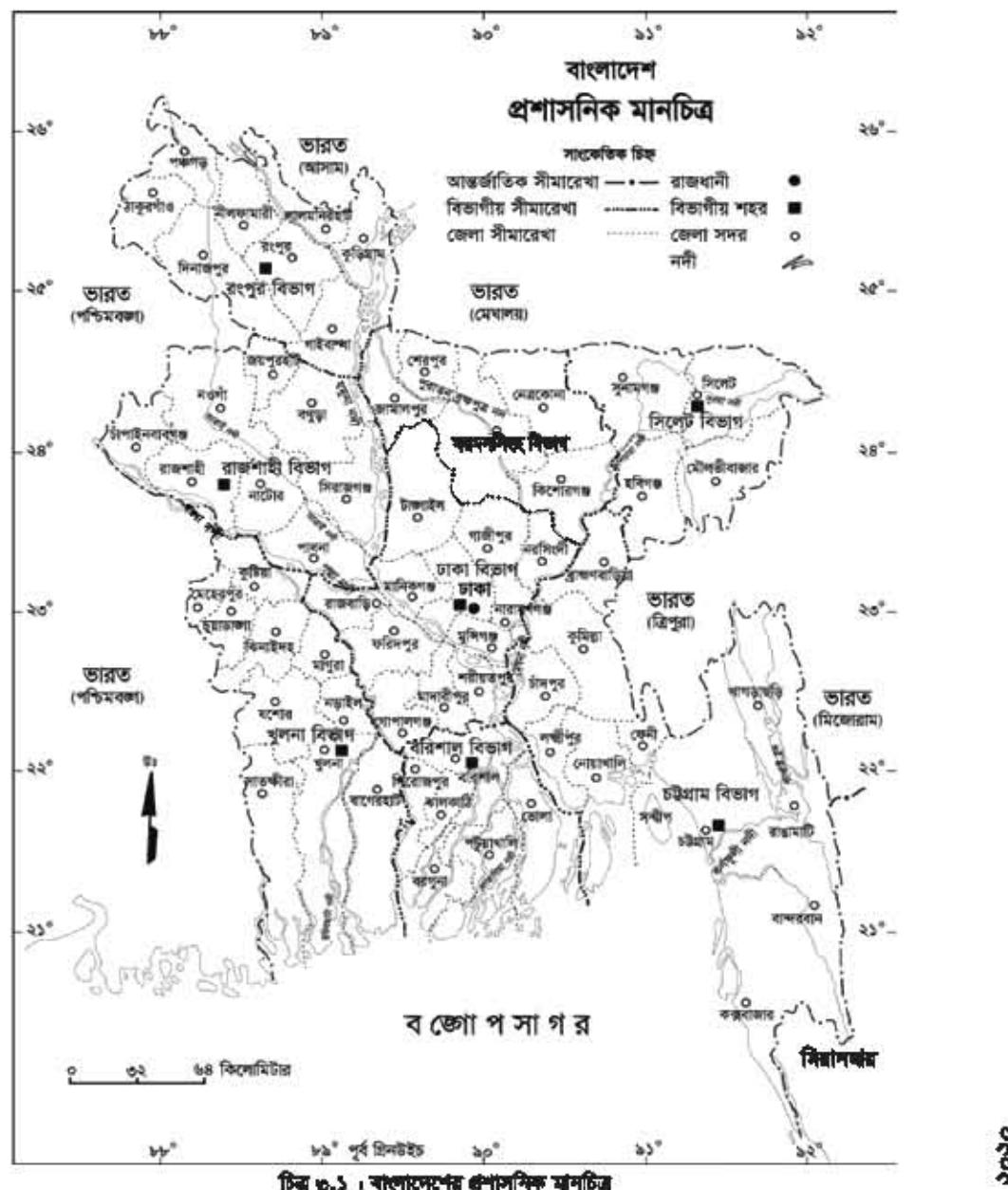


এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- মানচিত্রের ধারণা, পুরুষ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র সমূকে বর্ণনা দিতে পারব।
- মানচিত্রে ভৰ্ত্য-টপোগ্রাফ টপোগ্রাফ নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারব।
- স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়াণ সময় বর্ণনা করতে পারব।
- স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস-এর ব্যবহার সমূকে ধারণা দাত করব।

মানচিত্রের ধারণা, গুরুত্ব ও ব্যবহার (Concept of map, importance and use)

নিচের চিত্রটি সকল কর। এটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র। কাগজের এক পৃষ্ঠার বাংলাদেশের আভর্জাতিক সীমা, বাংলাদেশের কোন দিকে কোন দেল, কোন সামগ্র ইত্যাদি থাকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের সাতটি বিভাগ, কোন বিভাগে কতটি জেলা ও এসের নাম ও সীমানা। একটি যাত্রা পৃষ্ঠার মধ্যে সারা বাংলাদেশের প্রশাসনিক সীমানা ছালে ধরা হয়েছে (চিত্র ৩.১)। এভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠার মধ্যেই সম্পূর্ণ পৃথিবী, বিভিন্ন মহাদেশ, বিভিন্ন দেশ বা কোনো দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা একে দেখানো যায়।



এই মানচিত্র ছাড়াও তোমরা হয়তো তোমাদের ক্ষুলে দেয়াল মানচিত্র দেখেছ। তোমাদের ভূগোল ও পরিবেশ বইতে বা কোনো মানচিত্রের বইয়ে (এট্লাসে) মানচিত্র দেখে থাকবে। মানচিত্র হলো একটি ছবিঃ বা রেখাঙ্কন যা ভূগুঠের কোনো ছোট বা বৃহৎ অঞ্চলকে উপস্থিত করে থাকে। মানচিত্র কোনো অঞ্চল বা দেশের জুড়ে, জলবায়ু, উষ্ণিদ, মাটি, পানি ও অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগরের অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারি। মানচিত্রে একটি ছোট কাগজের মধ্যে অতি নিখুঁতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের অবস্থা দেখানো যায়। এখন দেখা যাক মানচিত্র কী?

ইংরেজি ‘map’ শব্দের বাল্লা প্রতিশব্দ মানচিত্র। ল্যাটিন শব্দ ‘mappa’ থেকে ‘map’ শব্দটি এসেছে। ল্যাটিন ভাষায় কাপড়ের টুকরাকে ‘mappa’ বলে। আগেকার দিনে কাপড়ের উপরই map বা মানচিত্র আঁকা হতো। পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল বা এর অংশবিশেষকে কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কন করাকে মানচিত্র বলে। মানচিত্র হলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমাত্রেখাসহ কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের অঙ্কিত প্রতিরূপ। এই সমতল ক্ষেত্র হতে পাই এক টুকরা কাপড় বা কাগজ।

মানচিত্রে ক্ষেত্র নির্দেশের পদ্ধতি (Methods of showing scale) : মানচিত্রে তিনটি পদ্ধতিতে ক্ষেত্র নির্দেশ করা হয়।



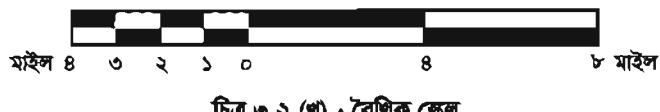
(ক) **বর্ণনার সাহায্যে (By statement)** : আমরা বর্ণনা বা কথার মাধ্যমে মানচিত্রের ক্ষেত্র প্রকাশ করে থাকি। যেমন— ১ ইঞ্জিতে ৪ মাইল, ১৬ ইঞ্জিতে ১ মাইল, ১ সেক্টিমিটারে ১ হেক্টেমিটার। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম ১ সংখ্যাটি (তা ইঞ্জিবা সেক্টিমিটার যাই হোক না কেন) মানচিত্রের দূরত্ব এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি (মাইল, গজ, কিলোমিটার বা হেক্টেমিটার যাই হোক না কেন) ভূমির প্রকৃত দূরত্ব প্রকাশ করছে।

(খ) **রেখাচিত্রের সাহায্যে (By graphical scale)** : কোনো একটি রেখাকে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিও ইঞ্জিও ক্ষুদ্র অংশে বা সেক্টিমিটারের ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে প্রতি ভাগের মান তিথে মানচিত্রের ক্ষেত্র প্রকাশ করা যায়। যেমন— ১ সেক্টিমিটারে ১০ কিলোমিটার বর্ণনাটিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে প্রথমে ৫ সেক্টিমিটার একটি রেখা নিয়ে একে ৫ ভাগ করতে হবে; এর প্রতিটি ভাগ ১০ কিলোমিটার। বাম পাশে ১টি ঘর ছেড়ে দিয়ে ঘথাক্রমে ০, ১০, ২০, ৩০, ৪০ লিখে এর পাশে কিলোমিটার লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ১০ ভাগে ভাগ (কোরণ ১০ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র ভাগ দেখাতে হবে) করে প্রতিটি ক্ষুদ্র ভাগের মান লিখতে হবে (চিত্র ৩.২ ক)। যেমন—



চিত্র ৩.২ (ক) : রেখিক ক্ষেত্র

ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে (চিত্র ৩.২ খ)। এক্ষেত্রে ৩ ইঞ্জিন দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে প্রথমে তিন ভাগ করতে হবে এবং বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে প্রতি ঘরের মান লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে। ১ ইঞ্জিনতে ৪ মাইল বর্ণনাটিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার সময় প্রথমে ৩ ইঞ্জিন একটি রেখা নিয়ে একে তিন ভাগ করতে হবে। বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে ০, ৪, ৮ মাইল লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ৪ ভাগে (কারণ ১ ইঞ্জিনে ৪ মাইল) ভাগ করতে হবে। শূন্য থেকে বাম দিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ মাইল লিখতে হবে।
যেমন—



চিত্র ৩.২ (খ) : রৈখিক ক্ষেত্র

(গ) প্রতিসূত্র অনুপাতের সাহায্যে (By representative fraction) : বিভিন্ন দেশের দূরত্ব পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র একক ব্যবহার করা হয়। এরূপ এক দেশের এককের মাধ্যমে মানচিত্রে ক্ষেত্র প্রকাশ হলে ভাষাগত কারণে তা অন্য দেশের শোকের কাছে ব্যবহার যোগ্য হবে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য প্রতিসূত্র অনুপাত পদ্ধতি উভাবিত হয়েছে। ইংরেজিতে একে Representative Fraction বা সংক্ষেপে R.F. এবং বাঙালি সংক্ষেপে প্র.অ. বলে। ভগ্নাশের আকারে দেওয়া ক্ষেত্রটির লব রাশি মানচিত্রের দূরত্ব এবং হর রাশি একই এককে ভূমির দূরত্ব প্রকাশ করে।

উদাহরণস্বরূপ ১ সেন্টিমিটারে ১ মিটার বর্ণনায় প্রকাশিত ক্ষেত্রটিকে প্রতিসূত্র অনুপাতে প্রকাশ করতে হলে মিটারটিকে সেন্টিমিটারে আনতে হবে এবং উভয় সংখ্যার মধ্যে অনুপাত চিহ্ন (:) দিতে হবে। ১ মিটার সমান ১০০ সেন্টিমিটার। সূতরাং লব রাশি ১ এবং হর রাশি ১০০। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রটি $1:100$ বা $1/100$ । অর্থাৎ এর অর্থ মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ সেন্টিমিটার তখন ভূমির দূরত্ব ১০০ সেন্টিমিটার।

আবার ব্রিটিশ পদ্ধতিতে $1:36$ প্র.অ. দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ ইঞ্জিন তখন ভূমির দূরত্ব ৩৬ ইঞ্জিন বা ১ গজ। অতএব বর্ণনায় ১ ইঞ্জিনতে ১ গজ। বর্ণনায় যখন ১ ইঞ্জিনতে ১ মাইল, তখন প্র.অ. $1:63,360$ যেহেতু $1 \text{ মাইল} = 63,360 \text{ ইঞ্জিন}$ ।

একটি বৃহদাকার দেশ ও মহাদেশকে আমরা একটি ছোট বই বা খাতার পৃষ্ঠায় অঙ্কন করে দেখাতে পারি। এছাড়া মানচিত্রটির সঙ্গে ভূমির প্রকৃত দূরত্বটি বোঝানোর জন্য ক্ষেত্র ব্যবহার করে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারি। মানচিত্র বলতেই আমাদের চোখে তেসে ওঠে একটি দেশ, একটি অঞ্চল তথা একটি ভূখণ্ডের চিত্র বা একটি মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবী। একটি মানচিত্রের মধ্যে কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে মহাদেশটিতে কতটি দেশ এবং একেকটি দেশের মধ্যে কতটি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, রাস্তা, নদ-নদী, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখাতে পারি। এভাবে একটি দেশ ও মহাদেশের মধ্যে আমরা চাইলে ছোট একটি স্থানকেও সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারি। সর্বোপরি বলা যায়, কোনো স্থানের অবস্থান থেকে শুরু করে ঐ স্থানের খুটিলাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মানচিত্রের কোনো বিকল্প নেই। সূতরাং, বলা যায় কুব কম সময়ে সহজ উপায়ে ঘরে বসে সারা বিশ্বকে জ্ঞানার জন্যেই মানচিত্রের উৎপত্তি। একটি মানচিত্রের মধ্যে কী ধরনের তথ্য ধারণে তা নির্ভর করবে— (ক) ক্ষেত্র, (খ) অভিক্ষেপ, (গ) কনভেনশনাল সাইন, (ঘ) মানচিত্র অঙ্কনকারীর দক্ষতা এবং (ঙ) মানচিত্র অঙ্কনের ধরনের উপর। একটি বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে একটি স্থানকে বেশি তথ্য দিয়ে দেখানো যায়।

মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য তোমার কিছু বিষয় জানতে হয়। মানচিত্র বিভিন্ন রকমের হয়। প্রতি মানচিত্রেই বিভিন্ন বিষয় থাকে। এগুলো বিভিন্ন রং, রেখা ও সংকেত দিয়ে বোঝানো হয়। এই রং, রেখা ও সংকেত হলো মানচিত্রের ভাষা। মানচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এসব ভাষা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক সভ্যতায় মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সৈনিক ও নাবিকদের নিকট মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূগোলবিদ ও ভূগোলের শিক্ষার্থীদের নিকট মানচিত্র একটি অপরিহার্য উপাদান।

মানচিত্রের প্রকারভেদ (Classification of maps)

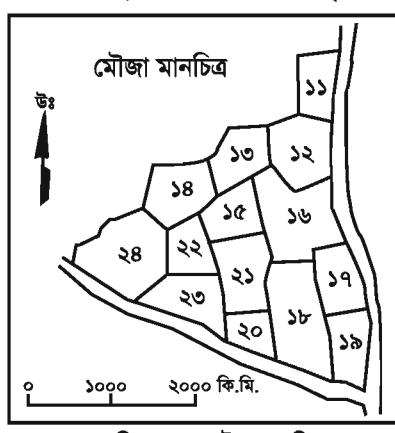
মানচিত্র অনেক প্রকার হতে পারে। সাধারণত মানচিত্রে ব্যবহৃত ক্ষেত্র এবং বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ক্ষেত্র অনুসারে মানচিত্র আবার দুই প্রকারের- (ক) বৃহৎ ক্ষেত্রের মানচিত্র এবং (খ) ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মানচিত্র। নৌচলাচল সঞ্চালন নাবিকদের চার্ট, বিমানচলাচল সঞ্চালন বৈমানিকদের চার্ট, মৌজা মানচিত্র বা ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র প্রভৃতি বৃহৎ ক্ষেত্রের মানচিত্র। একটি ছোট এলাকা অনেক বড় করে দেখানো হয় বলে মানচিত্রের মধ্যে অনেক জায়গা থাকে এবং অনেক কিছু তথ্য এরূপ মানচিত্রে ভালোভাবে দেখানো যায়। ভূচিত্রাবলি মানচিত্র, দেয়াল মানচিত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মানচিত্র। সমগ্র পৃষ্ঠাৰ্বী বা মহাদেশ বা দেশের মতো বড় অঞ্চলকে একটি ছোট কাগজে দেখানো হয় বলে এ প্রকার মানচিত্রে বেশি জায়গা থাকে না। ফলে এ মানচিত্রে বেশি কিছু দেখানো যায় না।

উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবেও মানচিত্রগুলো দুই প্রকারের- (ক) গুণগত মানচিত্র এবং (খ) পরিমাণগত মানচিত্র।
(ক) গুণগত মানচিত্র : ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র, ভূসংস্থানিক মানচিত্র, ভূমিরূপের মানচিত্র, মৃক্ষিকা মানচিত্র, দেয়াল মানচিত্র, ভূচিত্রাবলি মানচিত্র, স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র এবং মৌজা মানচিত্র গুণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

(খ) পরিমাণগত মানচিত্র : বায়ুর উভাপ, বৃষ্টিপাতার পরিমাণ, জনসংখ্যার বর্ণন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, খনিজ উৎপাদন, বনজ উৎপাদন, শিল্পজ উৎপাদন প্রভৃতি পরিসংখ্যান তথ্য যেসব মানচিত্রে দেখানো হয় সেসব মানচিত্র পরিমাণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

কার্যের উপর ভিত্তি করে কয়েক প্রকার মানচিত্র নিম্নরূপ :

১। ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা মানচিত্র (Cadastral or Mouza map) : ক্যাডাস্ট্রাল শব্দটি এসেছে ফ্রেঞ্চ শব্দ ক্যাডাস্ট্ৰে



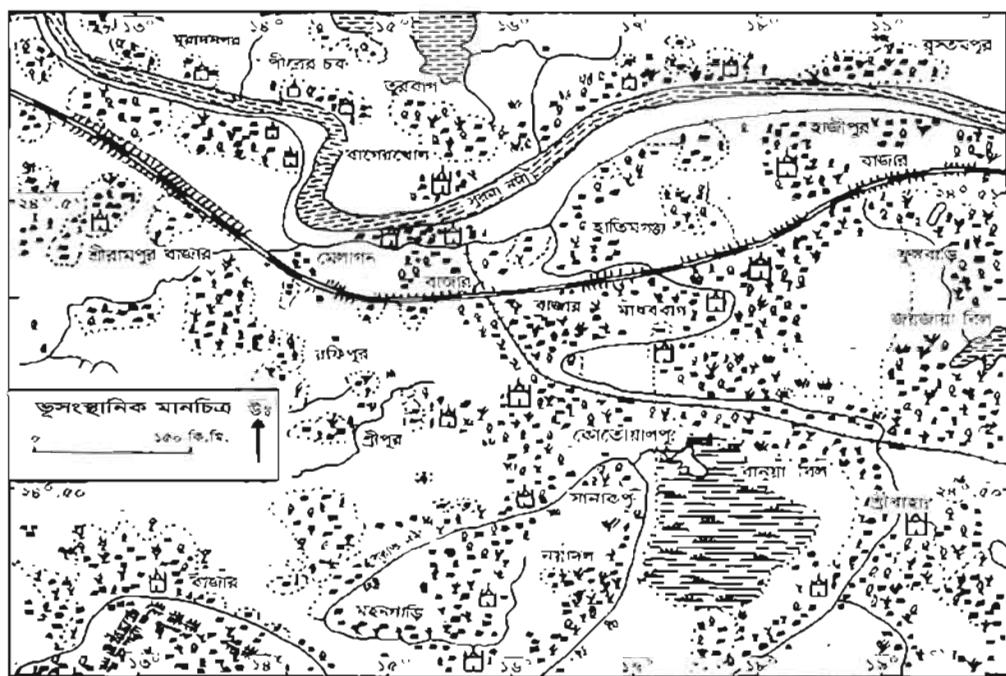
(Cadastre) থেকে, যার অর্থ হচ্ছে রেজিস্ট্রি কৃত নিজের সম্পত্তি। এই মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত কোনো রেজিস্ট্রি কৃত ভূমি অথবা বিল্ডিং-এর মালিকানার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। আমাদের দেশে আমরা যে মৌজা মানচিত্রগুলো দেখতে পাই সেগুলো আসলে ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র। এই মানচিত্রের মাধ্যমেই হিসাব করে সরকার ভূমির মালিক থেকে কর নিয়ে থাকে। এই মানচিত্রের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের গ্রামের মানচিত্রগুলো (চিত্র ৩.৩)।

এই মানচিত্রে নির্ধৃতভাবে সীমানা দেওয়া থাকে। এই মানচিত্রগুলো বৃহৎ ক্ষেত্রে অঙ্কন করা হয়, যা ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল বা ৩২ ইঞ্চিতে

১। মাইল। এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে বিবিধ তথ্য প্রকাশ করা হয়। শহরের পরিকল্পনার মানচিত্রও এই মৌজা মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২। ভূসংস্থানিক মানচিত্র (Topographic map) : ভূসংস্থানিক-এর আরেক নাম হচ্ছে স্থানীয় বৈচিত্র্যাসূচক মানচিত্র। এই মানচিত্রগুলো প্রকৃত জরিপকার্যের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত এর মধ্যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দুই ধরনের উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের মানচিত্রের ক্ষেত্র একেবারে ছোট না হলেও মৌজা মানচিত্রের মতো বৃহৎও নয়। এই মানচিত্রগুলোতে কিন্তু জমির সীমানা দেখানো হয় না। জ্ঞানকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি, নদী, উপত্যকা, হ্রদ প্রভৃতি দেখানো হয়। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হিসেবে রেলপথ, হাটবাজার, পোস্ট অফিস, সরকারি অফিস, খেলার মাঠ, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মূলভাবে দেখানো হয় (চিত্র ৩.৪)। বর্তমান যুগে বিমান থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে এই মানচিত্রের নববৃত্তের সূচনা হয়। এই মানচিত্রের ক্ষেত্র ১:২০,০০০ হলে ভালোভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মানচিত্র তৈরি করে। সবচেয়ে আদর্শ ও জনপ্রিয় হচ্ছে ব্রিটিশদের তৈরি করা মানচিত্র যার ক্ষেত্র ছিল ১:২৫,০০০ থেকে ১:১০০,০০০ এবং আমেরিকাতে এই মানচিত্রের ক্ষেত্র থাকে সাধারণত ১:৬২,৫০০ এবং ১:১২৫,০০০। বাংলাদেশ সাধারণত ব্রিটিশ ক্ষেত্রটি অনুসরণ করে।



চিত্র ৩.৪ : ভূসংস্থানিক মানচিত্র

৩। সেজাল মানচিত্র (Wall map) : সেজাল মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত প্রেসিককে ব্যবহার করা অসম্ভব। সারা বিশ্বকে অথবা কোনো গোপীর্ধকে এই মানচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। সেজাল মানচিত্রে আমাদের চাহিদা মতো একটি দেশ অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় বড় অথবা ছোট ক্ষেত্রে (চিত্র ৩.৫)। এই সেজাল মানচিত্রের ক্ষেত্র ভূসংজ্ঞনিক মানচিত্রের চেয়ে ছোট কিন্তু ভূটিজ্ঞাবণি মানচিত্রের চেয়ে বড়।

৪। ভূটিজ্ঞাবণি বা এটেলাস মানচিত্র (Chorographical or Atlas map) : মানচিত্রের সমষ্টিকে ভূটিজ্ঞাবণি (এটেলাস) বলে। এই মানচিত্রকে সাধারণত খুব ছোট ক্ষেত্রে করা হয়। এটি আকৃতিক, অববাহুন্ত এবং অবনৈতিক অবস্থায় উপর তিপ্পি করে পৃষ্ঠীয় বিভিন্ন অঞ্চলে ভাল করে তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ ভূটিজ্ঞাবণি মানচিত্রে খননের অভাবে গং সিঙ্গে বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়। শুধু গাহাঙ্গের ছাতা, পুরুষ্পূর্ণ নদী এবং জেলাগুরের অধান রাঙ্গা বোঝানোর জন্য প্রাচীক দেখয়া থাকে। কিন্তু কিছু ভূটিজ্ঞাবণি করা হয় ১:১০০০,০০০ ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে করেকটি প্রকৃতান এই মানচিত্র তৈরি করে থাকে। এই মানচিত্রে সমগ্র পৃষ্ঠীকে একটি পৃষ্ঠার মধ্যে দেখিয়ে থাকে। আলাদেশকেও এই একটি পৃষ্ঠার মধ্যে জেলাগুলো ইত্যাদি দেখিয়ে থাকে। এতে আকৃতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের তিপ্পিতে মানচিত্র তৈরি করা হয়।

৫। আকৃতিক মানচিত্র (Physical map) : এই মানচিত্রে কোনো দেশ বা অঞ্চলের বিভিন্ন আকৃতিক ভূমিকূপ বেমন-পর্বত, মালভূমি, মহাভূমি, নদী, হ্রদ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য থাকে তাকে আকৃতিক মানচিত্র বলে।

৬। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র (Geological map) : ভূতাত্ত্বিক পাঠনকারী শিলাসমূহের অবস্থান ও পাঠনের উপর তিপ্পি করে এই খননের মানচিত্র তৈরি করা হয়।

৭। অস্থায়ুগ্মত মানচিত্র (Climatic map) : বায়ুম ভাগ, বায়ুম চাপ, বায়ুমবাহ, বৃক্ষিপাত, আর্দ্ধতা অঙ্গুত্তির উপর তিপ্পি করে এই মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে অস্থায়ুগ্মত মানচিত্র বলে।

৮। উষ্ণিক বিদ্যুক মানচিত্র (Vegetation map) : বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের আকৃতিক উষ্ণিক আছে তার উপর তিপ্পি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে উষ্ণিক বিদ্যুক মানচিত্র বলে।

৯। স্ফূর্তিক বিদ্যুক মানচিত্র (Soil map) : বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের মাটি ভার উপর তিপ্পি করে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়। সাধারণত মাটির পুশাশুস্পের উপর তিপ্পি করেই বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের ফসলের চাব করা যাবে সেজন্য কৃষিবিদ্যা এই ধরনের মানচিত্র বেশি ব্যবহার করে থাকেন।



চিত্র ৩.৫ : সেজাল মানচিত্র

১০। সাংস্কৃতিক মানচিত্র (Cultural map) : বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের সীমা, ঐতিহাসিক কোনো স্থান বা স্থাপত্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে যে মানচিত্র তৈরি হয় তাকে সাংস্কৃতিক মানচিত্র বলে।

আবার সাংস্কৃতিক মানচিত্রকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

(ক) **রাজনৈতিক মানচিত্র (Political map) :** বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের সীমা দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরও দেখানো হয়।

(খ) **বণ্টন মানচিত্র (Distribution map) :** যেসব মানচিত্রে জনসংখ্যা, শস্য, জীবজন্তু, শিল্প ইত্যাদির বণ্টন কোনো একটি অঞ্চল বা দেশে দেখানো হয় তাকে বণ্টন মানচিত্র বলে।

(গ) **ঐতিহাসিক মানচিত্র (Historical map) :** ঐতিহাসিক কোনো স্থান বা স্থাপত্যকে নিয়ে যেসব মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে ঐতিহাসিক মানচিত্র বলে।

(ঘ) **সামাজিক মানচিত্র (Social map) :** পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে মানচিত্রগুলো তৈরি করা হয়। বিশেষ করে যারা সামাজিক প্রথা ও বৈষম্য, জনসংখ্যা এসব নিয়ে গবেষণা করেন তারা এ মানচিত্র ব্যবহার করেন।

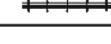
(ঙ) **ভূমি ব্যবহার মানচিত্র (Land use map) :** কোন ভূমি কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বা কোন ভূমি কোন কাজে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি উপযোগী তার উপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র বলে।

মানচিত্রে তথ্য-উপাস্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি (Techniques of presenting information in a map)

স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র গঠন ভূগোল শাস্ত্রের একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এই বিশাল পৃথিবীকে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের এক একটি সামাজিক রূপ এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় অন্য কোনো উপায়েই তা সম্ভব নয়। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ভূপ্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রতীকগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মালভূমি, হিন্দু, সমভূমি, পুরুর, ঝিল, বনভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে রাস্তাধাট, হাটবাজার, মসজিদ, মন্দির, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, জনবসতি, মানুষের ঘনত্ব, জীবিকা অর্জনের উপায় প্রভৃতি নানা সাংস্কৃতিক তথ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে কোনো একটি অঞ্চলের সুবিধা-অসুবিধা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে চাইলে এই মানচিত্রে তথ্য-উপাস্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি জানা একান্ত প্রয়োজন। যে কোনো ভাষায় একটি মানচিত্র পাঠ করতে হলে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্নের সাহায্য নিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের মধ্যে এ সকল প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে আসছে। এই ১০ কারণে এসব চিহ্নকে আন্তর্জাতিক প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন বলে (চিত্র ৩.৬)। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র ১০

পাঠ করার জন্য এই প্রতীক চিহ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি বলে মানচিত্রের নিচের দিকে এই প্রতীক চিহ্নগুলোর সূচক (Legend) দেওয়া থাকে। যে ব্যক্তির এই চিহ্নগুলো সমন্বে যত ভালো ধারণা থাকবে তিনি তত ভালোভাবে এই মানচিত্র পাঠ করতে পারবেন।

মানচিত্রে প্রচলিত প্রতীক চিহ্নসমূহ (International conventional sign used in map)

পাকা রাস্তা	কাঁচা রাস্তা	আন্তর্জাতিক সীমারেখা	জেলা সীমারেখা
_____	— — — — —	— • — — • —	— · — — —
ব্রডগেজ রেললাইন 	মিটারগেজ রেললাইন 	জলাভূমি	নদী
ডুয়েলগেজ রেললাইন 			
হৃদ	গ্রাম/বসতি	মসজিদ	মন্দির
			
গাছ 	লাইট হাউস	বিমানবন্দর	সেতু
			
ঈদগাহ 	শিল্পকারখানা	পর্বত	বাঁধ
			

চিত্র ৩.৬ : আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

একটি মানচিত্রে তথ্য উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো :

- **শিরোনাম (Title/Heading) :** প্রত্যেক মানচিত্রেই একটি শিরোনাম থাকে। এটি কোনো দেশের বা কোনো অঞ্চলের কিসের মানচিত্র এতে তা উল্লেখ থাকে। যেমন- বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র। প্রতিটি মানচিত্র তৈরির সময় এতে একটি শিরোনাম দিতে হবে।

- **ক্ষেল (Scale) :** কোনো অঞ্চলের মানচিত্র তৈরির সময় এর আয়তনকে কমিয়ে ক্ষুদ্র করে আঁকতে হয়। একে ক্ষেল অনুসারে আঁকা বলে। ক্ষেল থেকে বোঝা যায় কোন আয়তনকে কতটুকু কমানো হয়েছে। ক্ষেল যত ছোট হবে মানচিত্রে তত বেশি আয়তন দেখানো যাবে। মানচিত্রে যদি $1:100,000$ লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে মানচিত্রে ১ একক ভূমির $100,000$ এককের সমান। আবার ক্ষেল একে দেখানো হয় যেমন— মানচিত্রে এক ইঞ্চিং সমান ভূমিতে কত মাইল বা এক সেন্টিমিটার সমান কত কিলোমিটার।
- **উত্তর দিক (North Line) :** মানচিত্রের দিক জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানচিত্রের উপরের দিকে বাম দিকের মার্জিনে একটি তীর দেওয়া থাকে। এই তীরের মাথায় উ. লেখা থাকে। উ. দিয়ে উত্তর দিক বোঝানো হয়। একটি দিক জানা থাকলে আমরা সহজেই অন্যদিকগুলো যেমন— দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বের করতে পারি। মানচিত্র তৈরির সময় দিকনির্দেশনা দিতে হবে। মানচিত্রে দিক না দেখানো থাকলে উপরের দিককে উত্তর দিক বুঝতে হবে। মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ স্পষ্ট করে দেখানো থাকলে উত্তর দিক না থাকলেও সকল দিক বোঝা যায়। তাই অনেক সময় এক্ষেত্রে উত্তর দিক দেখানো হয় না।
- **সূচক (Legend) :** মানচিত্রে কোন প্রতীক দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে সূচক তা নির্দেশ করে। প্রতিটি মানচিত্রেই প্রতীক ও এদের সূচক উল্লেখ করতে হবে।
- **তথ্য উপাস্ত (Source of Data) :** সব মানচিত্র তথ্য বা উপাস্তের ভিত্তিতে তৈরি হয়। এজন্য তথ্যের উৎস মার্জিন বা মার্জিনের বাইরে দেওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় (Local Time and Standard Time)

আমাদের পৃথিবীকে 360° দ্রাঘিমারেখা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। এই 360° কে আবার মূল মধ্যরেখা থেকে দুই দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে 180° করে ভাগ করা হয়েছে। এই 360° দ্রাঘিমা পুরোটাই আসলে কাল্পনিক। আমরা জানি পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূরছে। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার পুরোটি ঘূরে আসছে। হিসাব করলে দেখা যাবে 360° ঘূরে আসতে সময় লাগছে 24 ঘণ্টা অর্থাৎ $24 \times 60 = 1440$ মিনিট। এই 1440 মিনিটকে 360° দিয়ে ভাগ করলে $(1440 \div 360) = 4$ মিনিট। অর্থাৎ প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময় লাগছে ৪ মিনিট।

স্থানীয় সময় (Local Time)

পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূরছে। পৃথিবীর যে অংশটি পূর্ব দিকে সেই অংশটিতে আগে সুর্যোদয় বা সকাল হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো একটি স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে তখন এই স্থানে মধ্যাহ্ন। এই স্থানের

যদিতে তখন দুপুর ১২টা ধরা হয়। এই মধ্যাহ্ন থেকেই দিনের অন্যান্য সময়গুলো ঠিক করা হয়। আকাশে সূর্যের অবস্থান থেকে যে সময় হিসেবে করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। ঐ স্থান থেকে যত দূরের স্থান হবে সে হিসেবে প্রতি 1° দ্রাঘিমার জন্য সময় বাঢ়বে বা কমবে। স্থানটি যদি সেই স্থানের পশ্চিমের দিকের স্থান হয় তবে এর 1° ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট কম হবে। স্থানটি পূর্ব দিকের হলে 1° ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট বেশি হবে। অর্থাৎ পূর্ব দিকের স্থানের সময় নির্ণয়ের জন্য ঐ স্থানের সময়ের সঙ্গে প্রতি ডিগ্রি ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট যোগ করতে হবে। কারণ সেই স্থানটি যেহেতু পূর্বে অবস্থিত তাই সেখানে আগেই মধ্যাহ্ন হয়েছে অর্থাৎ ১২টা বেজেছে।

প্রমাণ সময় (Standard Time)

দ্রাঘিমারেখার উপর সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা সময় ঠিক করি। এভাবে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানকে সেই স্থানের দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে সাধারণত একটি বড় দেশের মধ্যে সময়ের গণনার বিভাট হয়। এই সময়ের বিভাট থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক দেশে একটি প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত কোনো একটি দেশের মধ্যভাগের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় ধরা হয়।

দেশের আয়তনের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ সময় একাধিক হতে পারে। আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রে ৪টি এবং কানাডাতে ৬টি প্রমাণ সময় রয়েছে। সেসব দেশগুলোর প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য তারা একাধিক প্রমাণ সময় ব্যবহার করছে। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের অদূরে অবস্থিত গ্রিনিচের (0° দ্রাঘিমায়) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাই আমাদের দেশে প্রমাণ সময় গ্রিনিচের সময়ের অণ্ডবর্তী অর্থাৎ আমাদের এখানে গ্রিনিচের মধ্যাহ্নের পূর্বেই মধ্যাহ্ন হয়ে থাকে। গ্রিনিচের দ্রাঘিমা 0° অন্যদিকে আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে 90° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করেছে। আর আমরা জানি প্রতি ১ ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। তাই 90° -এর জন্য সময়ের পার্থক্য হবে $90 \times 4 = 360$ মিনিট বা ৬ ঘণ্টা। 90° পূর্ব দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়। আমাদের এখানে যখন দুপুর ১২টা তখন যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে সকাল ৬টা বাজে।

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য (Time difference on the basis of location)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৪ মিনিট। আমরা জানি যে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূরছে। এজন্যই পূর্ব দিকের স্থানগুলোতে আগে দিন হচ্ছে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলোতে পরে দিন হচ্ছে। এতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত সেসব দেশে আগে সকাল হবে এবং আমাদের পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে পরে সকাল হবে।

আমরা জানি প্রতি ডিগ্রি দূরত্বের জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৪ মিনিট। এই প্রতিটি ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ১ মিনিট দূরত্বের জন্য ৪ সেকেন্ড সময়ের পার্থক্য হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে দূরত্বের ব্যবধানের মিনিটকে অনেকে সময়ের মিনিট হিসেবে ধরে ভুল করে। আসলে দূরত্বের মিনিট হচ্ছে প্রতি ১ ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয়। এই দূরত্বের ৬০ মিনিটের প্রতি মিনিটের জন্য সময়ের ৪ সেকেন্ড লাগে। এভাবে দূরত্বের ব্যবধানের ৬০ মিনিটের জন্য লাগে $60 \times 4 = 240$ সেকেন্ড অর্থাৎ ৪ মিনিট সময়।

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য ভাগোভাবে বুঝতে হলে কিছু গাণিতিক সমাধান করতে হবে।

উদাহরণ ১ : ঢাকা থেকে পূর্বে অবস্থিত একটি স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য $50^{\circ}30'$ । ঢাকায় যখন তোর ৬টা তখন সেই স্থানের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

$$\text{ঢাকা থেকে স্থানটির ব্যবধান} = 50^{\circ}30'$$

$$\begin{aligned}
 &= (50 \times 4) \text{ মিনিট} + (30 \times 4) \text{ সেকেন্ড} \quad (\text{পূর্ব দ্রাঘিমায় এই ব্যবধানের জন্য সময়ের পার্থক্য যোগ হবে}) \\
 &= 200 \text{ মিনিট} + 120 \text{ সেকেন্ড} \\
 &= 200 \text{ মিনিট} + 2 \text{ মিনিট} [\text{যেহেতু } 1 \text{ মিনিট} = 60 \text{ সেকেন্ড}] \\
 &= 202 \text{ মিনিট}
 \end{aligned}$$

সময়ের ব্যবধান হবে ২০২ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট

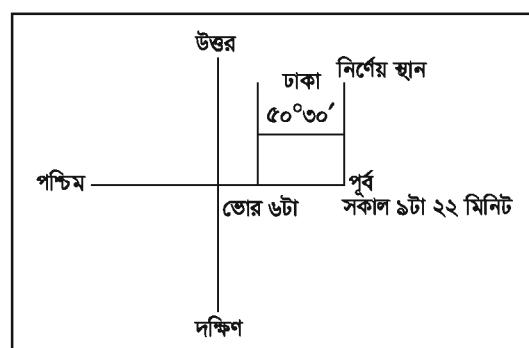
এখানে যে স্থানটির স্থানীয় সময় নির্ণয় করতে হবে সেটা ঢাকার পূর্ব দিকে অবস্থিত। সুতরাং স্থানীয় সময় ঢাকার সময়ের চেয়ে বেশি হবে কারণ পূর্ব দিকে সূর্য আগে উদিত হয়েছে। তাই ঢাকার সময়ের সঙ্গে ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট যোগ করতে হবে।

\therefore স্থানটির সময়

$$\begin{aligned}
 &= \text{ঢাকার সময়} + \text{সময়ের পার্থক্য} \\
 &= ৬টা + ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট \\
 &= ৯টা ২২ মিনিট
 \end{aligned}$$

\therefore স্থানটির নির্ণেয় স্থানীয় সময় ৯টা ২২ মিনিট।

উত্তর : সকাল ৯টা ২২ মিনিট।



উদাহরণ ২ : ঢাকার দ্রাঘিমা 90° পূর্ব এবং রিয়াদের দ্রাঘিমা 45° পূর্ব। ঢাকার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা হলে সেই সময় রিয়াদের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

আমরা জানি, প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট

$$\text{ঢাকা ও রিয়াদের দ্রাঘিমার পার্থক্য } ৯০^{\circ} - ৮৫^{\circ} = ৫^{\circ}$$

$$\text{সময়ের পার্থক্য হবে } ৫ \times ৪ = ২০ \text{ মিনিট অর্থাৎ } ৩ \text{ ঘণ্টা}$$

প্রশ্নে উল্লিখিত ৫° পূর্ব দ্রাঘিমা দেখে আমরা বুঝতে পারি, রিয়াদ ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত। তাই ঢাকার স্থানীয় সময় থেকে এই ৩ ঘণ্টা বাদ যাবে।

\therefore রিয়াদের স্থানীয় সময় হবে

$$= \text{দুপুর } ২টা - ৩ \text{ ঘণ্টা} [\text{এখানে দুপুর } ২টা \text{ বলতে } ১৪টা \text{ হবে।}]$$

$$= ১৪টা - ৩ ঘণ্টা$$

$$= ১১টা$$

উক্তর : রিয়াদের স্থানীয় সময় হবে সকাল ১১টা।

উদাহরণ ৩ : ‘ক’ শহরের দ্রাঘিমা $৭০^{\circ}৪৫'$ পূর্ব এবং ‘খ’ শহরের দ্রাঘিমা $১৫^{\circ}১৫'$ পূর্ব। ‘ক’ শহরের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে ‘খ’ শহরের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

$$\text{দুটি শহরের দ্রাঘিমার পার্থক্য} = ৭০^{\circ}৪৫' - ১৫^{\circ}১৫'$$

$$= ৫৫^{\circ}৩০'$$

আমরা জানি, প্রতি 1° -এর জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট এবং প্রতি 1° -এর জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ সেকেন্ড সুতরাং, $৫৫^{\circ}৩০'$ -এর জন্য সময়ের পার্থক্য হবে

$$= (৫৫ \times ৪) \text{ মিনিট} + (৩০ \times ৪) \text{ সেকেন্ড}$$

$$= ২২০ \text{ মিনিট} + ১২০ \text{ সেকেন্ড}$$

$$= ২২০ \text{ মিনিট} + ২ \text{ মিনিট} [\text{যেহেতু } ১ \text{ মিনিট} = ৬০ \text{ সেকেন্ড}]$$

$$= ২২২ \text{ মিনিট} = ৩ \text{ ঘণ্টা } ৪২ \text{ মিনিট}$$

যেহেতু ‘ক’ শহরের দ্রাঘিমা থেকে ‘খ’ শহরের দ্রাঘিমার মান কম সেহেতু আমরা বুঝতে পারি ‘খ’ শহরের পশ্চিমে অবস্থিত। তাই ‘ক’ শহরের স্থানীয় সময় থেকে সময়ের ব্যবধান বিয়োগ করলে ‘খ’ শহরের স্থানীয় সময় পাওয়া যাবে। সুতরাং, সময় হবে—

‘খ’ স্থানের স্থানীয় সময়

$$= \text{সকাল } ৭টা - ৩ \text{ ঘণ্টা } ৪২ \text{ মিনিট}$$

$$= ৩টা ১৮ \text{ মিনিট অর্থাৎ তোর } ৩টা ১৮ \text{ মিনিট}$$

উত্তর : ‘খ’ শহরের স্থানীয় সময় ভোর ৩টা ১৮ মিনিট।

উদাহরণ ৪ : ঢাকা ও টোকিওর স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ও ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড। ঢাকার দ্রাঘিমা $৯০^{\circ} ২৬'$ পূর্ব হলে টোকিওর দ্রাঘিমা কত?

সমাধান

ঢাকা ও টোকিওর সময়ের ব্যবধান ও ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড

$$= (180 + 17) \text{ মিনিট } 16 \text{ সেকেন্ড} = 197 \text{ মিনিট } 16 \text{ সেকেন্ড}$$

প্রতি ৪ মিনিটে 1° এবং প্রতি ৪ সেকেন্ডে ১ মিনিট সময়ের পার্থক্য হিসাব করে পাওয়া যায়,

$196 \text{ মিনিট-এর জন্য } 49^{\circ}$ এবং বাকি ১ মিনিট ১৬ সেকেন্ড-এর জন্য $19' \text{ অর্ধাং } 49^{\circ} 19'$ ।

সুতরাং টোকিও ঢাকার পূর্বে বলে এর দ্রাঘিমা হবে $= ৯০^{\circ} ২৬' + ৪৯^{\circ} ১৯' = ১৩৯^{\circ} ৪৫'$ পূর্ব।

উত্তর : $১৩৯^{\circ} ৪৫'$ পূর্ব।

মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস (GPS and GIS Maps)

বর্তমানে মানচিত্র তৈরি, পঠন এবং ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে জিপিএস এবং জিআইএস। জিপিএস-এর ইংরেজি হলো Global Positioning System (GPS)। কোনো একটি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান জানতে চাইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জিপিএস-এর মাধ্যমে জানা।

জিপিএস দ্বারা যেসব কাজ করা যায় তা হলো :

জিপিএস দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায়। এছাড়া ঐ স্থানের উত্তর দিক, তারিখ ও সময় জানা যায়।

জিপিএস-এর কার্যনীতি (Working Principle of GPS)

জিপিএস তার রিসিভার দিয়ে ভূ-উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে (চিত্র ৩.৭)। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য জিপিএস-এর মোটামুটি মেষমুক্ত পরিকার আকাশের প্রয়োজন হয়। তখন জিপিএস যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। কোনো কোনো সময় উচু খাড়া পাহাড়, উচু ইমারত থাকলে তখন জিপিএস দ্বারা সেই স্থানের অবস্থান নির্ণয়ে সমস্যার সমুক্তীন হতে হয় এবং এতে সময় বেশি লাগে।

জিপিএস-এর সুবিধা : প্রযুক্তির নব নব আবিকারের মধ্যে ভূগোলবিদদের জন্য জিপিএস একটি অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে আমরা কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে জানতে পারছি। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভূমির জরিপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বামেলা হয়।

চিত্র ৩.৭ : জিপিএস এখন আমরা জিপিএস-এর মাধ্যমে বামেলা ছাড়াই জমির সীমানা চিহ্নিত করতে পারব। ০৫



এতে করে সময় অনেক কম অপচয় হবে। যে কোনো দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা এই জিপিএস-এর মাধ্যমে কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাণ্ড জানতে পেরে তার সঠিক অবস্থান জেনে সেখানে সাহায্য পাঠাতে পারব।

জিপিএস-এর অসুবিধা : জিপিএস-এর সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। তা হলো— এর মূল্য বেশি তাই সহজলভ্য নয়, বেশিরভাগ জনগণ এর সঙ্গে পরিচিত নয়, বেশিরভাগ লোক এটি চালাতে পারে না। এছাড়া রয়েছে সন্তানী পদ্ধতি না ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা।

জিআইএস (Geographical Information System)

ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জিআইএস বলে। এটি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক তথ্যগুলোর সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানিক ও পারিসরিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, মানচিত্রায়ণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। এই জিআইএস-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে বেশি দিন হয়নি। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম এই কোশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১৯৮০ সালের দিক থেকে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, পানি গবেষণা, আঞ্চলিক গবেষণা, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতি বহুবিধ কাজে জিআইএস ব্যবহার হচ্ছে।

জিআইএস-এর মাধ্যমে একটি মানচিত্রের মধ্যে অনেক ধরনের উপাত্ত উপস্থাপন ঘটিয়ে সেই উপাত্তগুলোকে মানচিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণ করে মানচিত্রটির উপযোগিতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন— একটা মানচিত্রের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা, টপোগ্রাফি, ভূমি ব্যবহার, যোগাযোগ, মুক্তিকা, রাস্তা এই সবগুলো জিনিস দেখিয়ে আমরা তার মধ্য দিয়ে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের পুরো চিত্র সম্পর্কে জানতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দেয়াল মানচিত্র কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়?

- | | |
|----------------|-------------|
| (ক) শ্রেণিকক্ষ | (খ) মাঠ |
| (গ) পর্বত | (ঘ) জলবায়ু |

২। মূল মধ্যরেখা থেকে 5° পূর্ব দিকে সরে গেলে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হবে?

- | | |
|--------|--------|
| (ক) ১৬ | (খ) ২০ |
| (গ) ২৪ | (ঘ) ২৮ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন যে গ্রামে বসবাস করে সেখানে সমভূমি ও নিম্নভূমি উভয়ই রয়েছে। মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার অধ্যায় পাঠ শেষে সে তার গ্রামের একটি মানচিত্র অঙ্কন করল।

৩। সুমনের গ্রামের মানচিত্রটি কোন ধরনের মানচিত্র?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (ক) এটলাস | (খ) প্রাকৃতিক |
| (গ) সাংস্কৃতিক | (ঘ) ক্যাডাস্ট্রোল |

৪। সুমনের গ্রামের মানচিত্রে ভূমির জন্য কোন রং ব্যবহার করা হবে?

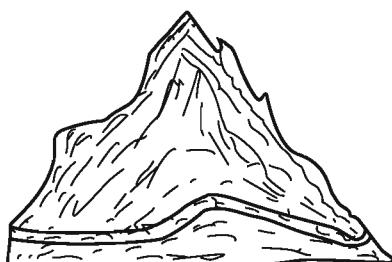
- | | |
|----------|------------|
| (ক) নীল | (খ) সাদা |
| (গ) সবুজ | (ঘ) বাদামি |

সূজনশীল প্রশ্ন

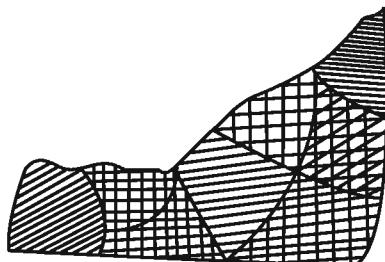
১। ফ্লোরা বেগম শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকা থেকে লভনের উদ্দেশে রওনা দিলেন। লভনের হিথো বিমানবন্দরে নামার পর তিনি দেখলেন বিমানবন্দরের ঘড়িতে সম্মিয়া ৬টা। কিন্তু নিজের ঘড়িতে তখন রাত ১২টা।

- ক. স্থানীয় সময় কাকে বলে?
- খ. প্রমাণ সময় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. ফ্লোরা বেগমের দেখা শহরটির দ্রাঘিমা 0° হলে ঢাকার দ্রাঘিমা কত? নির্ণয় কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানের সময়ের সঙ্গে ঢাকার সময়ের তারতম্য হওয়ার কারণ— বিশ্লেষণ কর।

২।



চিত্র ১



চিত্র ২

- ক. জিআইএস-এর পূর্ণ রূপ কী?
- খ. প্রতিভূ অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- গ. উপরের ১ নম্বর চিত্রটি কোন মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আমাদের জীবনে চিত্র ২-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

Internal and External Structure of the Earth

সৃষ্টির উক্ততে পৃথিবী ছিল এক উৎক্ষেপণ গ্যাসপিণ্ড। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এ সময় এর উপর যে আস্তরণ পড়ে তা হলো ভূত্তক। ভূগর্ভের রয়েছে তিনটি ভর। অশুমড়ল, গুরুমড়ল ও কেন্দ্রমড়ল। ভূত্তক যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সাধারণ নাম শিলা। পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া শিলা ও খনিজের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন দূরকম। ধীর পরিবর্তন ও আকস্মিক পরিবর্তন। এ অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন, বিভিন্ন রকম শিলা, ভূপৃষ্ঠের ধীর ও আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করব।



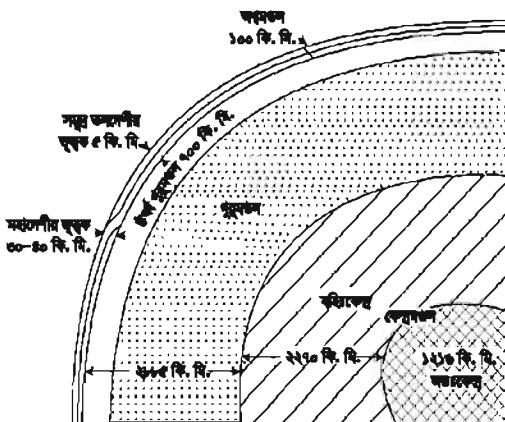
এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যাত্পাতের কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নদী দ্বারা সৃষ্টি ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- তথ্য-উপাদান পর্যালোচনার ভিত্তিতে অতীতে সংয়োগ কোনো একটি সুনামির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure of the Earth)

সূর্যের সময় পৃথিবী ছিল একটি উজ্জ্বল গ্যাসপিণ্ড। উজ্জ্বল অবস্থা থেকে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের ভারী উপাদানগুলো এর কেন্দ্রের দিকে ঝমা হয়। আর হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে নিচের থেকে উপরে ত্বরে ত্বরে ঝমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন ভরকে মডেল বলে। উপরের ভরটিকে অশুমড়ল বলে। অশুমড়লের উপরের অংশ ভূত্তক নামে পরিচিত।

ভূত্তক (Earth's Crust) : ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই ভূত্তক (চিত্র ৪.১)। ভূঅভ্যন্তরের অন্যান্য ভরের তুলনায় ভূত্তকের পুরুত্ব সবচেয়ে কম; গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্তক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার এবং সমূদ্র তলদেশে তা গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে মহাদেশীয় ভূত্তকের এ ভরকে সিয়াল (Sial) ভর বলে, যা সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত, যা সিয়াল ভরের তুলনায় ভারী এবং এর প্রধান খনিজ উপাদানের সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, এ ব্যাসট ভরই সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ ও গভীর সমূদ্র তলদেশে বিদ্যমান। ভূত্তকের উপরের ভাগেই বাহ্যিক অবয়বগুলো দেখা যায়। যেমন- পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি। ভূত্তকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে 30° স্লেসিয়াস তাপমাত্রা বাঢ়ে।



চিত্র ৪.১ : পৃথিবীর গঠন কাঠামোর আড়াআড়ি চিত্র
উৎস : Trabuck and Lutgens (1994)

গুরুমড়ল (Barysphere) : ভূত্তকের নিচে প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরুমড়লকে গুরুমড়ল বলে। গুরুমড়ল মূলত ব্যাসট (Basalt) শিলা দ্বারা গঠিত। এ অংশে রয়েছে সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। গুরুমড়ল দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) উর্ধ্ব গুরুমড়ল যা ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মড়ল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত। (খ) নিম্ন গুরুমড়ল প্রধানত আয়রন অজ্ঞাইড, ম্যাগনেসিয়াম অজ্ঞাইড এবং সিলিকন ডাইঅজ্ঞাইড সমৃদ্ধ খনিজ দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্রমড়ল (Centrosphere) : গুরুমড়লের ঠিক পরে রয়েছে কেন্দ্রমড়ল। গুরুমড়লের নিচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত এই মড়ল বিস্তৃত। এ ভর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু। ভূক্ষেত্র ভরজ্ঞের সাহায্যে জানা গেছে যে, কেন্দ্রমড়লের একটি তরল বহিরাবরণ আছে, যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু এবং একটি কঠিন অঙ্গভাগ আছে, যা ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, কেন্দ্রমড়লের উপাদানগুলোর মধ্যে লোহা, নিকেল, পারদ ও সিসা রয়েছে। তবে প্রধান উপাদান হলো নিকেল ও লোহা।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন উপাদান : শিলা ও খনিজ (Rocks and Minerals)

ভূত্তক শিলা দ্বারা গঠিত। শিলা বিভিন্ন খনিজের সমিশ্রণে গঠিত। জানা যাক, খনিজ বলতে কী বোঝায়? শিলা ও খনিজের পার্থক্য কী? কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। খনিজ হলো একটি প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ যার সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। আর শিলা হলো এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। খনিজ দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত হলেও কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন— হীরা, সোনা, তামা, বুপা, পারদ ও গন্ধক।

শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যদিও বেশিরভাগ শিলাই একাধিক খনিজ দ্বারা গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ। উদাহরণ হলো, পাললিক শিলা চুনাপাথর। এটি ক্যালসাইট নামের একটি খনিজ। শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত।

শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between rocks and minerals) : খনিজ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত আর শিলা এক বা একাধিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। খনিজ সমস্ত অজৈব পদার্থ, শিলা অসমস্ত পদার্থ। খনিজ কঠিন ও স্ফটিকাকার হয়, কিছু কিছু শিলা কঠিন হলেও স্ফটিকাকার হয় না। খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত আছে, শিলার কোনো রাসায়নিক সংকেত নেই। খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কাজ : নিম্নে ছক্কের মধ্যে শিলা ও খনিজের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।	
শিলা	খনিজ
•	•
•	•
•	•
•	•

শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rocks)

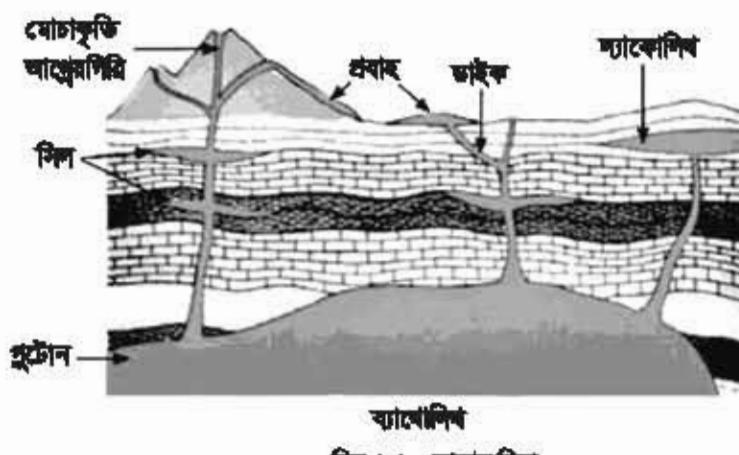
ভূত্তক যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারণ নাম শিলা। ভূত্ত্ববিদগণের মতে দুই বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের সমিশ্রণে এসব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূত্তক গঠনকারী সকল কঠিন ও কোমল পদার্থই শিলা। উদাহরণস্বরূপ নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাদা, বালি প্রভৃতি। গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) আঙুয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) বৃপ্তান্তরিত শিলা।

১। আল্ট্রুর শিলা (Igneous Rocks) : জলের পথে পৃষ্ঠীয় একটি উভত গ্যাসপিট হিল। এই গ্যাসপিট জমাঘরে ভাগ বিকিরণ করে ভরল হয়। পরে আরও ভাগ বিকিরণ করে এর উপরিভাগ শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এভাবে গলিত অবস্থা থেকে ঘনিষ্ঠুত বা কঠিন হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাকে আল্ট্রুর শিলা বলে। আল্ট্রুর শিলা পৃষ্ঠীয় পথে পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তাই এই শিলাকে প্রাচীমিক শিলাও বলে। এ শিলার কোনো জরুর নেই। তাই আল্ট্রুর শিলার অপর নাম অভ্যরণীভূত শিলা। এই শিলায় জীবাশ্য নেই। এই শিলার বৈশিষ্ট্য হলো— (ক) স্ফটিকাকার, (খ) অভ্যরণীভূত, (গ) কঠিন ও কম ভজনু, (ঘ) জীবাশ্য দেখা যায় না এবং (ঙ) অপেক্ষাকৃত ভারী।

আল্ট্রুরগিরি বা ভূমিকচ্ছের ফলে অনেক সময় ভূভূকের দূর্বল অংশে কঠিলের সৃষ্টি হয়। তখন পৃষ্ঠীয় অভ্যরণ থেকে উভত গলিত ভাতা পৰিষ্ঠ হয়ে আল্ট্রুর শিলার সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যাসট ও শানাইট শিলার সৃষ্টি হয়। আল্ট্রুর শিলাকে সুই ভালে ভাল করা যায়। যথা— (ক) বহিতজ আল্ট্রুর শিলা ও (খ) অভ্যরণ আল্ট্রুর শিলা।

(ক) বহিতজ আল্ট্রুর শিলা (Extrusive Igneous Rocks) : ভূগর্ভের উভত ভরল পদার্থ যান্ত্রিক আল্ট্রুরগিরি অভ্যরণে অভ্যরণীভূত বা অন্য কোনো কারণে বেলিরে এসে শীতল হয়ে জমাট বৈধে বহিতজ আল্ট্রুর শিলার সৃষ্টি হয়, এদের দানা খূব সূক্ষ্ম, ঝঁঝ গাঢ়। এই শিলার উদাহরণ হলো ব্যাসট, রাজোলাইট, অ্যান্ডিসাইট ইত্যাদি।

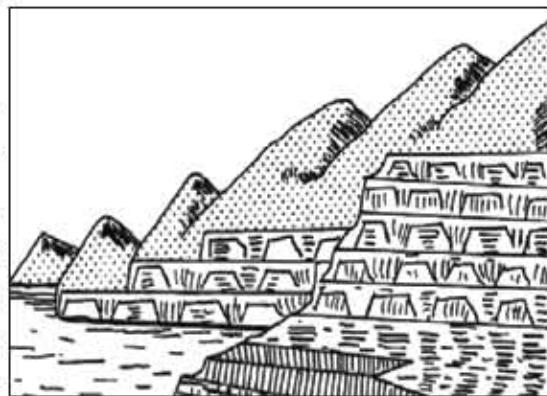
(খ) অভ্যরণ আল্ট্রুর শিলা (Intrusive Igneous Rocks) : উভত যান্ত্রিক ভূগর্ভের বাইরে স্থা এসে ভূগর্ভে জমাট বীধে তৈরি হয় অভ্যরণ আল্ট্রুর শিলা। এর দানাগুলো সূক্ষ্ম ও হালকা রঙের হয়। শানাইট, প্যান্টো, ডলোরাইট, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ, ডাইক ও সিল এ শিলার অন্যতম উদাহরণ (চিত্র ৪.২)।



চিত্র ৪.২ : আল্ট্রুর শিলা

২। পালিক শিলা (Sedimentary Rocks) : পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠিত হয়েছে তাকে পালিক শিলা বলে। সূক্ষ্ম, বালু, ফুরার, ভাল, সমুদ্রের ঢেউ অভ্যরণ পদাবে আল্ট্রুর শিলা অবস্থাত ও বিহুীভূত হয়ে সৃপান্তরিত হয় এবং কাঁকড়া, কালা, বালি ও খুলায় পরিণত হয়। কমিত শিলাকসা অলহোত, বালু এবং হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলান্ত্বে কোনো নিরুক্তি, তুল এবং সালমার্পে সঞ্চিত হতে থাকে।

প্রবর্তীতে এসব পদার্থ ভূগর্ভের উভাবে ও উপরের শিলাভ্রতের চাপে অমাট বৈধে কঠিন শিলাৰ গৱিষ্ঠত হয়। পালিক শিলা ভূগর্ভের মোট আমৃতনের শতকরা ৫ আৰু সখল কৰে আহে। তবে মহাদেৱীৰ ভূক্ষেত্ৰে আৰুৰশেৱে ৭৫ ভাগই পালিক শিলা। পলৰ বা ভূমিৰ থেকে গঠিত হয় বলে যুক্ত শিলাকে পালিক শিলা বলে (চিত্ৰ ৪.৩)। ভূতে ভূতে সক্রিয় হয় বলে একে জীৱুত শিলাৰ বলে। পালিক শিলা যৌগিক, জৈবিক বা রাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়ায় গঠিত হতে পাৰে। বেলোঘৰ, কয়লা, শেল, চূনাপাথৰ, কানাপাথৰ, কেওলিন পালিক শিলাৰ উদাহৰণ। জীৱদেহ থেকে উৎপন্ন হয় বলে কয়লা ও খনিজ ভেলকে জৈব শিলাৰ বলে। অনেক পালিক শিলাৰ মধ্যে নানাবিকাৰ উড়িন ও জীৱজীৱৰ সেছাবশেৰ বা জীৱাশ্ম দেখা যায়।



চিত্ৰ ৪.৩ : পালিক শিলা

পালিক শিলাৰ বৈশিষ্ট্য : পালিক শিলা জীৱুত, নৰম ও হালকা, সহজেই কৰপাণি হয়। এৱে যথে জীৱাশ্ম দেখা যায়। এই শিলাৰ ছিয়া দেখা যায়।

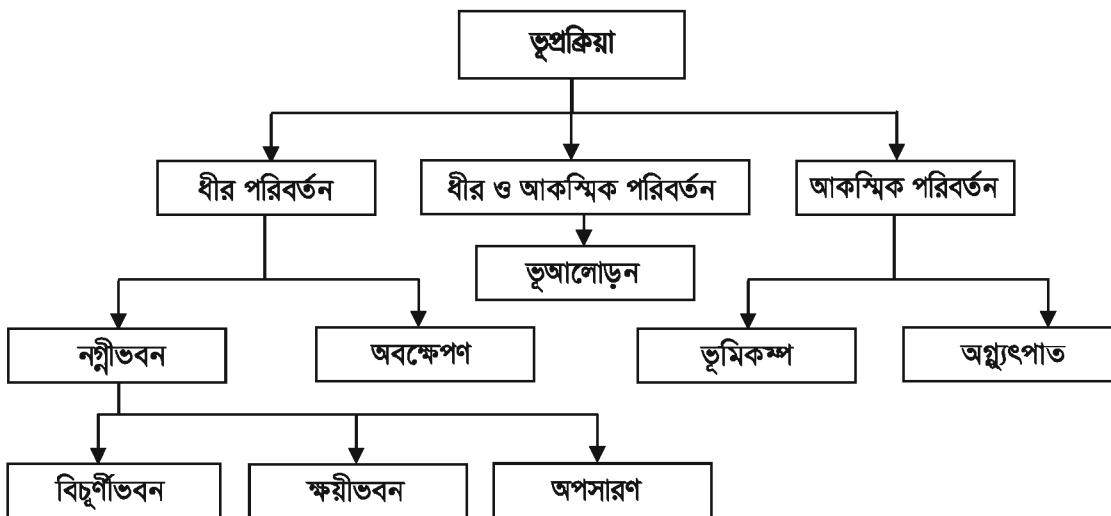
৩। **বৃগাতৰিত শিলা (Metamorphic Rocks) :** আঝোৱ ও পালিক শিলা যথন প্ৰচল চাপ, উভাব এবং রাসায়নিক ক্ৰিয়াৰ ফলে হৃণ পৱিতৰণ কৰে স্ফূন হৃণ থাৰণ কৰে কথন ভাকে বৃগাতৰিত শিলা বলে। ভূভাস্মোশন, অঞ্চলপাত ও ভূমিকলা, রাসায়নিক ক্ৰিয়া কিমো ভূগৰ্ভৰ তাপ আঝোৱ ও পালিক শিলাকে বৃগাতৰিত কৰে। চূনাপাথৰ বৃগাতৰিত হয়ে মাৰ্কেল, বেলোঘৰ বৃগাতৰিত হয়ে কোয়াচিজাইট, কানা ও শেল বৃগাতৰিত হয়ে স্টেট, শালাইট বৃগাতৰিত হয়ে শিস এবং কয়লা বৃগাতৰিত হয়ে শাকাইটে গৱিষ্ঠত হয়।

বৃগাতৰিত শিলাৰ বৈশিষ্ট্য : এই শিলা স্ফটিকস্ফূন, ধূৰ কঠিন হয়। এতে জীৱাশ্ম দেখা যায় না। কোনো কোনো বৃগাতৰিত শিলাৰ চেষ্ট খেলাবো ভূমি দেখা যায়।

কাজ : সমস্তভাৱে শিলাৰ প্ৰেশিভিভাসেৰ ছকটি পুৰণ কৰা।			
পঞ্জীয়নীয় অনুসূতৰ শিলাৰ প্ৰেশিভিভাস	শকান্তভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহৰণ
আঝোৱ শিলা			
পালিক শিলা			
বৃগাতৰিত শিলা			

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া (Changing process of the earth surface)

ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। নানাপ্রকার ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। যে সমস্ত কার্যাবলির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধিত হয় তা ভূপ্রক্রিয়া। যেমন- নদী অবক্ষেপণের মাধ্যমে প্লাবন ভূমি গড়ে তুলছে। এখানে নদী অবক্ষেপণ একটি প্রক্রিয়া। ভূপ্রক্রিয়া তার কার্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেয়। যেমন- মাধ্যাকর্ষণ, ভূতাপীয় শক্তি এবং সৌরশক্তি। এ সমস্ত শক্তির সাহায্যে ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনো কখনো খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির (যেমন- সৌরশক্তি) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। সুদীর্ঘ সময় ধরে ভূপৃষ্ঠে এই পরিবর্তন চলে বিধায় একে ধীর পরিবর্তন বলে। ধীর পরিবর্তন সাধারণত দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যেমন- নদীভবন ও অবক্ষেপণ। অপরদিকে অন্তঃশক্তির (যেমন- ভূমিকম্প) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে ভূত্তকের পরিবর্তন সাধনকারী ভূপ্রক্রিয়াসমূহের একটি ছক দেওয়া হলো।



ধীর পরিবর্তন : ধীর পরিবর্তন হলো আকস্মিক পরিবর্তনের একেবারেই বিপরীত অবস্থা। অনেকগুলো প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় তাকে ধীর পরিবর্তন বলে। এই ধীর পরিবর্তন বিশাল এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে।

আকস্মিক পরিবর্তন : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উন্নত ও গলিত অবস্থায় রয়েছে। এসব উন্নত বস্তুর মধ্যে তাপ ও চাপের পার্থক্য হলে ভূত্তকে যে আলোড়ন ঘটে তাকে ভূআলোড়ন বলে। এ ভূআলোড়নের ফলেই ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির প্রভাবে ভূগর্ভে সর্বদা নানারূপ পরিবর্তন হচ্ছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত, ভূকম্প, পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংকোচন, ভূগর্ভের তাপ ও অন্যান্য প্রচল্প শক্তির ফলে ভূপৃষ্ঠে হঠাতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে। এরূপ পরিবর্তন খুব বেশি স্থান জুড়ে হয় না। আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় প্রধানত ভূমিকম্প, সুনামি ও আগ্নেয়গিরি দ্বারা।

ভূমিকম্প (Earthquake)

পৃথিবীর কঠিন ভূতকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোনো কারণে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাতে কেঁপে শুষ্টে। ভূতকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূকম্পন সাধারণত কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় আবার কখনো কিছু সময় পর পর অনুভূত হয়। এ কম্পন কখনো অত্যন্ত মৃদু আবার কখনো অত্যন্ত প্রচন্ড হয়।

ভূমিকম্পের প্রধান কারণ (Main causes of earthquakes)

- পৃথিবীর উপরিভাগ কতকগুলো ফলক/প্লেট দ্বারা গঠিত। এই প্লেটসমূহের সম্পর্কে প্রধানত ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে।
- অগ্ন্যৎপাতের ফলে প্লেটসমূহের উপর ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

অপ্রধান কারণ

১। শিলাচ্যুতি বা শিলাতে তাঁজের সৃষ্টি : কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে বড় ধরনের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে তাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়। ১৯৩৫ সালে বিহারে এবং ১৯৫০ সালে আসামে এ কারণেই ভূমিকম্প হয়।

২। তাপ বিকিরণ : ভূতক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ফাটল ও তাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়।

৩। ভূগর্ভস্থ বাস্প : পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপের কারণে বাস্পের সৃষ্টি হয়। এই বাস্প ভূতকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেওয়ার ফলে প্রচন্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়।

৪। ভূগর্ভস্থ চাপের বৃদ্ধি বাহাস : অনেক সময় ভূগর্ভে হঠাতে চাপের বাহাস বা বৃদ্ধি হলে তার প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।

৫। হিমবাহের প্রভাব : হঠাতে হিমবাহ পর্বতগাত্র থেকে নিচে পতিত হলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে শুষ্টে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effects of earthquakes) : ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং বহু ধর্মসমূহে সাধিত হয়। ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ ও যাতায়াত ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়। এতে জীবনেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। নিচে ভূমিকম্পের ফলাফল আলোচনা করা হলো :

(১) ভূমিকম্পের ফলে ভূতকের মধ্যে অসংখ্য তাঁজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৮৭ সালে আসামে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় তাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদটি তার গতিপথ পাল্টে বর্তমানে যমুনা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

(২) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সমুদ্রতল উপরে উঠিত হয়, পাহাড়-পর্বত বা দ্বীপের সৃষ্টি করে। আবার কোথাও মূলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। ১৮৯৯ সালে ভারতের কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে প্রায় ৫,০০০ বর্গকিলোমিটার স্থান সমুদ্রগর্তে নিমজ্জিত হয়।

(৩) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত হয় বা কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো নদী শুকিয়ে যায়। আবার সময় সময় উচ্চভূমি অবনমিত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে দিবৎ নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

(৪) ভূমিকঙ্কের ফলে অনেক সময় পর্যবেক্ষণ থেকে হিমানীসম্প্রসারণ হয় এবং পর্যবেক্ষণ উপর শিলাপাত হয়।

(৫) ভূমিকঙ্কের ফলে বর্ষাতে কর্তৃ সমূহ উপকূল সহজে এলাকা অলোক্তাসে প্রাপ্তি হয়।

সুনামি (Tsunami)

সুনামি (Tsunami) একটি আগানি শব্দ। আগানি ভাষায় এর অর্থ হলো ‘পৌত্রাশের চেষ্ট’। সুনামির পানির চেষ্ট সমুদ্রের স্বাভাবিক চেষ্টারের মতো নয়। এটা সাধারণ চেষ্টারের চেমে অনেক বিশালাকৃতির। অতি দ্রুত ঝুলে ঝুলে ঝুঁটি জোয়াজের মতো বা উপকূল ও পার্শ্বকলী এলাকার অলোক্তাসের সৃষ্টি করে। সুনামির পানির চেষ্টাগুলো একের পর এক উচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে চেষ্টারের রেলগাড়ি বা ‘ওয়েভ ট্রেন’ বলে। সুনামি হলো পানির এক মাঝামাঝি চেষ্ট বা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল ঝুলে ভূমিকলা বা আগ্রেডলিভির অগ্রাহ্যপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানির নিচে কোনো পার্শ্বান্বিক বা অন্য কোনো বিষেকারণ, স্লাত ইভ্যাদি কারণেও সুনামি হতে পায়। সুনামির ক্রমক্রিয় সমূহ উপকূলীর এলাকাগুলোতে সীমান্ত থাকলেও এর আশেপাশে সুনামির ধ্বনিমাত্রক শীলা সংযোগিত হয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে যে সুনামি সৃষ্টি হয় তা এই মহাসাগরের আশেপাশে ১৪টি দেশে আঘাত হানে এবং মাঝামাঝি একটি দুর্বোল সৃষ্টি করে।

কাজ : ২০০৪ ও ২০১১ সালে এশিয়ায় দুটি সুনামি হয়। তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ভালিকা দলগতভাবে তৈরি কর।

আগ্রেডলি (Volcano)



চিত্র ৪.৪ : আগ্রেডলি

অগ্রেডলের শিলাভূমি সর্বত্র একই ধরনের কঠিন বা পটীর নয়। কোথাও স্থান আবাস কোথাও কঠিন। কোনো কোনো সময় দূপর্ণের চাগ প্রকল হলে শিলাভূমির কোনো দূর্বল অংশ কেটে থায় বা সূক্ষ্মজোর সৃষ্টি হয়। দূপর্ণের দূর্বল অংশের ফাঁচ বা সূক্ষ্ম দিয়ে দূপর্ণের ডিক বায়ু, পলিত শিলা, ধাতু, কম্বল, জলীয়বায়ু, উভত পাখরখন্দ, কাদা, ছাই প্রকৃতি প্রকলবেগে উদ্বের্দ উৎকিঞ্চ হয়। দূপর্ণে এই বিস্তৃপথ বা কাঁচলের চারপাশে কমপ জমাট বেঁধে বে উচু মোচাকৃতি পর্বত সৃষ্টি করে তাকে আগ্রেডলির বলে। আগ্রেডলির মুখকে ভূমামুখ এবং ভূমামুখ দিয়ে নির্ণিত গণিত পদার্থকে মাতা বলে (চিত্র ৪.৪)।

আগ্রেডলির অগ্রাহ্যপাতের কারণ (Reasons of Volcanism)

(১) ভূতকে দূর্বল হ্যান বা ফটিল দিয়ে ভূতজ্যভূমির গণিত ম্যাগমা, কম্বল, ধাতু প্রকলবেগে বের হয়ে অগ্রাহ্যপাত ঘটে।

(২) যখন ভূপৃষ্ঠের চাপ কমে যায় তখন ভূগর্ভের শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এতে শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে তরল পদার্থ দুর্বল স্থান ভেদ করে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অগ্ন্যৎপাতের সৃষ্টি করে।

(৩) কখনো কখনো ভূত্তকের ফাটল দিয়ে নদী-নালা, খাল-বিল এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করলে প্রচল উভাপে বাস্তীভূত হয়। ফলে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ভূত্তক ফাটিয়ে দেয়। তখন ঐ ফাটলের ভিতর দিয়ে পানি, বাস্প, তপ্ত শিলা প্রভৃতি নির্গত হয়ে অগ্ন্যৎপাত ঘটায়।

(৪) ভূগর্ভে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে প্রচুর তাপ বৃদ্ধি পেয়ে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাতে ভূঅভ্যন্তরের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অগ্ন্যৎপাত ঘটায়।

(৫) ভূআলোকনের সময় পার্শ্বাপে ভূত্তকের দুর্বল অংশ ভেদ করে এ উত্তপ্ত তরল লাভা উপরে উথিত হয়। এভাবে ভূআলোকনের ফলেও অগ্ন্যৎপাত হয়।

আগ্নেয়গিরির প্রকারভেদ (Types of Volcano) : অগ্ন্যৎপাতের ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিনি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত এখনও ব্যবহৃত হয়নি, তাকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- হাওয়াই দ্বীপের মাওনালেয়া ও মাওনাকেয়া।

২। **সুষ্ঠ আগ্নেয়গিরি (Dormant volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাত অনেককাল আগে ব্যবহৃত হয়ে গেছে; তাদেরকে সুষ্ঠ আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- জাপানের ফুজিয়ামা।

৩। **মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct volcano) :** যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্ন্যৎপাতের সম্ভাবনা নেই, সেগুলোকেই মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন- ইরানের কোহিসুলতান। আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

১। **শিল্ড আগ্নেয়গিরি (Shield volcano) :** গভুজ আকৃতির শিল্ড আগ্নেয়গিরিগুলোর তলদেশ চওড়া এবং ঢাল সামান্য, সাধারণত আকারে বৃহৎ। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি কেন্দ্রীয় নির্গমনপথে বা সারি সারি নির্গমনপথ দিয়ে দ্রুত বেগে প্রবাহিত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো লাভা দ্বারা গঠিত। হাওয়াই দ্বীপের মাওনালেয়া এর উদাহরণ।

২। **স্ট্রাটো আগ্নেয়গিরি (Strato volcano) :** ঝুলন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ভস্ম ও লাভার সমন্বয়ে ভরসমূহ দ্বারা এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি গঠিত হয়। অধিকাংশ স্ট্রাটো আগ্নেয়গিরি অনিয়মিতভাবে গঠিত পর্বতসমূহ যা পর্বত পার্শ্বে উৎপন্ন কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য নির্গমনপথ দিয়ে প্রবাহিত বিক্ষিপ্ত পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

৩। **সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি (Cinder cone volcano) :** আকারে ছোট আগ্নেয়গিরিগুলোকে সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এগুলো গ্যাসপূর্ণ ম্যাগমার পুনঃপুন ক্ষুদ্র বিস্ফোরণের ফল, যেগুলো

লাভা ও ভস্মেও সামান্য পরিমাণ নিষ্কেপ করে নির্গমনপথের আশপাশের ছেট এলাকায়। সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি এর গড় আকৃতি প্রায় ৮০০ মিটার চওড়া তল এবং ১০০ মিটার উচু। মেঞ্জিকোর পেরিকোটিন এর উদাহরণ।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলাফল (Effects of Volcanism) : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে এর দ্বারা সামান্য সূফলও পাওয়া যায়। নিম্নে আগ্নেয়গিরির ফলাফলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

১। অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত পদার্থ চারদিকে সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমুক্তিকাময় মালভূমি এরূপ নির্গত লাভা দিয়ে গঠিত।

২। সমুদ্র তলদেশেও অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। এ থেকে নির্গত লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বিপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বিপপুঁজি এভাবে সৃষ্টি একটি আগ্নেয় দ্বিপ।

৩। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ধসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বিপের মধ্যবর্তী অংশে অগ্ন্যৎপাতের ফলে এক বিরাট গহ্বর দেখা যায়।

৪। মৃত আগ্নেয়গিরির ঝালামুখে পানি জমে আগ্নেয় হৃদের সৃষ্টি করে। আলাক্ষার মাউন্ট আডাকামা, নিকারাগুয়ার কোসেগায়না এ ধরনের হৃদ।

৫। আগ্নেয়গিরির নির্গত লাভা, শিলা দ্রব্য প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে একটা স্থানে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এ ধরনের পর্বতকে আগ্নেয় পর্বত বলে। যেমন- ইতালির ভিসুতিয়াস।

৬। অনেক সময় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হতে হতে বিস্তৃত এলাকা নিম্ন সমভূমিতে পরিণত হয়। যেমন- উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলে লাভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম, নগর, কৃষিক্ষেত্র সব ধ্বংস করে। ১৮৭৯ সালে ইতালির ভিসুতিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের ফলে হারকিউলেনিয়াম ও পঙ্কেই নামের দুটি নগর উন্নত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির কারণে কেবল মানুষের অপকার নয় উপকারও হয়ে থাকে। এতে ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন- দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃক্তিকা কার্পাস চামের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অনেক সময় লাভার সঙ্গে অনেক খনিজ পদার্থ নির্গত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগ্ন্যৎপাতের জন্য অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে বা হৃদে লাভা ও ভস্ম সঞ্চিত হয়ে এরূপ ভূতাগ সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল (Cause and effect of slow changes of the earth's surface)

আমরা জানি পৃথিবীর আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য তিনটি প্রধান ভূমিরূপের সূচী হয়। তা হলো— পর্বত, মালভূমি এবং সমভূমি। এসব ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন— সূর্যতাপ, বায়ু, বৃক্ষ, নদী প্রভৃতি দ্বারা খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভূমিরূপে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ধীর পরিবর্তন বলে। এতে সূর্যতাপ, বায়ু, বৃক্ষ, নদী প্রভৃতি শক্তি খুব ধীরে ধীরে ভূত্বকের ক্ষয়সাধন করে থাকে। ফলে ভূত্বকের উপরিস্থিত শিলা তেজে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এই শিলা অপসারিত হয়, আবার নতুন করে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

যেসব প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের ধীর পরিবর্তন হচ্ছে তাদেরকে প্রধানত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

(ক) বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন (Weathering and Erosion)

(খ) অপসারণ (Transporation)

(গ) নগ্নীভবন (Denudation)

(ঘ) অবক্ষেপণ (Deposition)

(ক) বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন : শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশিষ্ট হওয়া কিন্তু স্থানান্তর না হলে তাকে বিচূর্ণীভবন বলে। সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত ও হিমবাহ দ্বারা শিলা ক্ষয়সাধন হয়। যে প্রক্রিয়ায় শিলাখন্ড স্থানান্তরিত হয় তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।

(খ) অপসারণ : নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ ও হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ পদার্থগুলো স্থানান্তরিত হয়। একে অপসারণ বলে।

(গ) নগ্নীভবন : বিচূর্ণীভবনের সময় শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। ক্ষয়ীভবন দ্বারা ঐ শিলা অপসারিত হলে নিচের অবিকৃত শিলাগুলো নগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ কার্যকে নগ্নীভবন বলে।

(ঘ) অবক্ষেপণ : বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে নানা স্থান থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলো যে প্রক্রিয়ায় কোনো একস্থানে এসে জমা হয়ে নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে অবক্ষেপণ বলে।

যেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়ীভবনের মধ্য দিয়ে ধীর পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে বায়ু, বৃক্ষিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রধান। এদের ক্ষয়কার্য নিম্নে আলোচিত হলো :

বায়ুর কাজ : বায়ুতে থাকা অঞ্জিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাস্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার বিচ্ছেদ ও ক্ষয়সাধন করে। বায়ুর ক্ষয়কার্য মরুভূমিতে অধিক দেখা যায়। মরু এলাকা শুক, প্রায় বৃক্ষহীন এবং গাছপালা শূন্য। মরু এলাকায় গাছপালা কম থাকার কারণে মৃত্তিকা সুস্থ নয়। এছাড়া দিনের বেলায় সূর্যের তাপে এবং রাতের শীতলতায় শিলার সংকোচন ও প্রসারণের ফলেও সংবন্ধিত শিথিল হয়ে যায়। এরপর বায়ুপ্রবাহের আঘাতে এ অঞ্চলের শিলা সহজেই বাহিত হয়ে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষয়সাধন করে।

বৃক্ষের কাজ : বৃক্ষের পানি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠকে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করে। প্রবাহিত হওয়ার সময় পানি শিলাকে আঘশিকভাবে ক্ষয় ও আলগা করে এবং ক্ষয়প্রাণ শিলাকে প্রসারিত করে। বৃক্ষবহুল অঞ্চলে কর্ষিত জমির মাটি বৃক্ষের পানির দ্বারা অপসারিত হয়। আবার পর্বতের মধ্যে কর্দম স্তরের উপর অনেক ভারী শিলা হেলানো অবস্থায় থাকে। পর্বতের ফাটল দিয়ে পানি প্রবেশ করে কাদার স্তরকে গলিয়ে দেয়, এতে বড় শিলাস্তর কাদার উপর থাকতে না পেরে নিচে ধসে পড়ে। একে ভূমিধস বলে। অভাবে অনেকদিন ধরে শিলা ক্ষয়প্রাণ হয়ে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন সাধিত হয়।

হিমবাহের কাজ : হিমবাহের দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। হিমবাহের নিচে নামার সময় এর নিচের প্রস্তরখণ্ড পর্বতগাত্র থেকে বিছিন্ন হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পতিত হয়। পর্বতগাত্রের মধ্যে ছিদ্র যদি থাকে তাহলে তার ভিতর পানি প্রবেশ করে বরফে পরিণত হয়ে প্রস্তরগুলোকে আলগা করে দেয়। ফলে হিমবাহের চাপে এটি পর্বতগাত্র থেকে খুব সহজেই পৃথক হয়ে যায়। এই হিমবাহ অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে হয় বলে এটি ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের একটি উদাহরণ।

নদীর কাজ : যেসব প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ধীর পরিবর্তন করছে তাদের মধ্যে নদীর কাজ অন্যতম। নদী যখন পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের আঘাতে বাহিত নুড়ি, কর্দম প্রভৃতির ঘৰণে নদীগর্ভ ও পার্শ্বক্ষয় হয়। পর্বত্য অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ বেশি থাকে। এতে নদী নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোনো সঞ্চয় হতে পারে না। যখন নদী সমতুমিতে আসে তখন নদী ক্ষয় এবং সঞ্চয় দুটোই করে। নদীর চলার পথে যেখানে নরম শিলা পাবে নদী ঠিক সেদিক দিয়ে ক্ষয় করে অগ্রসর হয়। ক্ষয়কৃত নরম শিলা অবক্ষেপণ করে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে। এভাবে নদী ক্ষয় ও সঞ্চয় করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। অনেকদিন ধরে এভাবে ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ চলে বলে একে নদীর দ্বারা ধীর পরিবর্তন বলে।

নদীর গতিপথ : আমাদের জীবনে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন যতগুলো শহর দেখতে পাই তার সবগুলোই নদীর পাশে অবস্থিত। কেননা অতীতে মানুষ পানিপথেই চলাফেরা করত সবচেয়ে বেশি। নদীর গতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে হলে নদী বিষয়ে আরও কিছু মৌলিক ধারণা থাকা দরকার। এগুলো হলো—

নদীর সহজা : নদীর গতিপথ সম্পর্কে বুবাতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে নদী কাকে বলে? উচু পর্বত, মালভূমি বা উচু কোনো স্থান থেকে বৃক্ষ, প্রস্তরণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ যখন মাধ্যাকর্ণ শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমতুমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাকে নদী বলে। যেখান থেকে নদীর উৎপন্নি হয় তাকে নদীর উৎস বলে। নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে। নদীর অধিক বিস্তৃত মোহনাকে খাড়ি বলে।

দোয়াব : প্রবহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে।

নদীসংগম : দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে নদীসংগম বলে।

উপনদী : পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশের তিণ্টা ও করতোয়া হলো যমুনা নদীর উপনদী।

শাখানদী : মূল নদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই হলো পদ্মা
নদীর শাখানদী।

নদী উপত্যকা : যে খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভ : নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

নদী অববাহিকা : উৎপন্নি স্থান থেকে শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে পতিত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলই নদীর অববাহিকা।

নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা (Life cycle of a river)

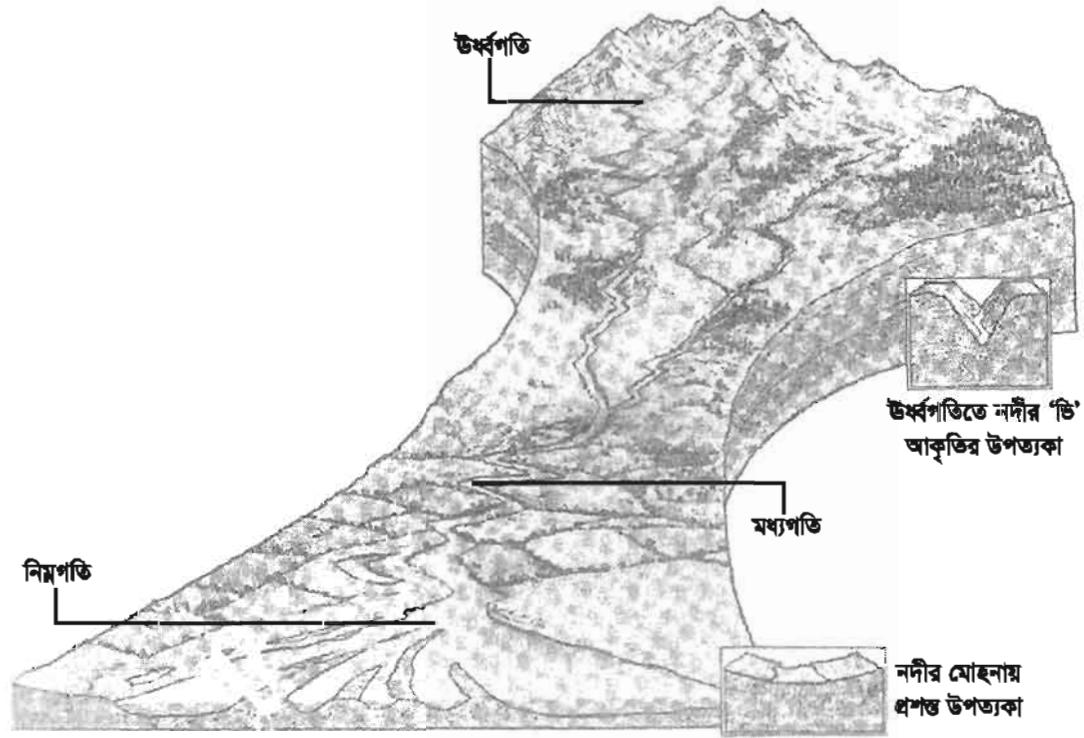
উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিগৰ্থের আয়তন, গভীরতা, ঢাল, স্রোতের বেগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নদীর গতিগৰ্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৪.৫)। যথা—

(ক) উর্ধ্বগতি (Youthful Stage/ Upper Course)

(খ) মধ্যগতি (Mature Stage/ Middle Course)

(গ) নিম্নগতি (Old Stage/ Lower Course)

(ক) উর্ধ্বগতি : উর্ধ্বগতি হলো নদীর প্রার্থমিক অবস্থা। পর্যন্তের যে স্থান থেকে নদীর উৎপন্নি হয়েছে সেখান থেকে সমভূমিতে পৌছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর উর্ধ্বগতি বলে। উর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্রয়সাধন। উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদী স্তুলভাবে ক্রয় করে এবং তা পরিবহন করে। এ অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ ক্রয় করা হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল কমে গেলে হঠাতে অধিক পরিমাণে পাথরের টুকরা এলে নদী তখন তা বহন করতে না পেরে হালকা সংক্ষয় করে।



চিত্র ৪.৫ : নদীর বিভিন্ন অবস্থা

(খ) মধ্যগতি : গীর্ভজ্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমতৃপ্তির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর বিজ্ঞান উৎর্ভূগতি অবস্থার ফুলনার অনেক বেশি হয় কিন্তু গভীরভা উৎর্ভূগতি অবস্থার ফুলনার অনেক কমে যায়। মধ্যগতি অবস্থায় নদীর সরুতে কাজ শুরু হয়। মধ্যগতিতে নদীর দূনিকের নিম্নভূমি পরি দ্বারা তরাট হয়ে থার সমতৃপ্তিতে পরিষ্ঠিত হয়। একে প্রাবন সমতৃপ্তি বলে। বালাদেশের অধিকাংশ জানাই এক বিশীর্ণ প্রাবন সমতৃপ্তি।

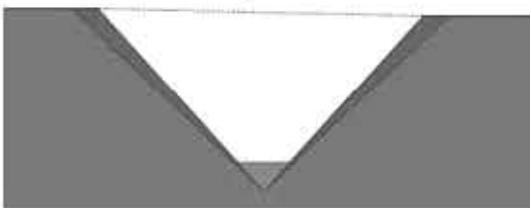
(গ) নিম্নগতি : নদীর জীবনচক্রের শেষ পর্যায় হলো নিম্নগতি। এ অবস্থায় স্রোত ধাকেবারে কমে যায়। নিম্নস্তর কম ও পার্শ্বক্ষয় হয়ে অর্থ পরিমাণে। নদী উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। স্রোতের বেগ কমে যাওয়ার পানিবাহিত বালুকণা, কাদা সৰীগৰ্তে ও মোহনার সংক্ষিপ্ত হয়।

নদী দ্বারা সৃষ্টি ভূমিকৃত (Create landforms by river)

নদী দুইভাবে ভূমিকৃতের সৃষ্টি করে। একটি হলো এর কর্মকার্য ও অপরটি হলো এর সকলকার্য। নিম্নে নদীর কর্মকার্য ও সকলকার্য ভূমিকৃত বর্ণনা করা হলো।

নদীর কর্মকার্য ভূমিকৃত (Landforms from river erosion)

'ডি' আকৃতির উপত্যকা ('V' Shaped Valley) : উৎর্ভূগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেল প্রবল হওয়ার কারণে নদী বড় বড় শিলাধাঁড়কে বহন করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। পর্বতশূলো কঠিন শিলা দ্বারা পঠিত হলেও মাঝে মাঝে নরম শিলাও থাকে। নদীগাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল বলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এভাবে কমপ করের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইঞ্জেছি 'V' আকৃতি হয়।



চিত্র ৪.৬ : 'ডি' আকৃতির উপত্যকা

গিরিধাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon) : উৎর্ভূগতি অবস্থার নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাম বেরে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে ছুপ্ট ক্ষয় হয় এবং ছুক্ত খেকে শিলাধাত শেঙে পড়ে। শিলাশূলো পরম্পরারের সঙ্গে এবং নদীধাতের সঙ্গে সংস্রবে যুক্ত হয়ে অনেক দূর চলে যায়। এসব পাথরের সংস্রবে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দুপাশের ভূমি কম কম হলে বা না হলে এসব খাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসব খাত খুব গভীর হয়। তখন একে খাতকে গিরিসংকট বা গিরিধাত বলে (চিত্র ৪.৭)।

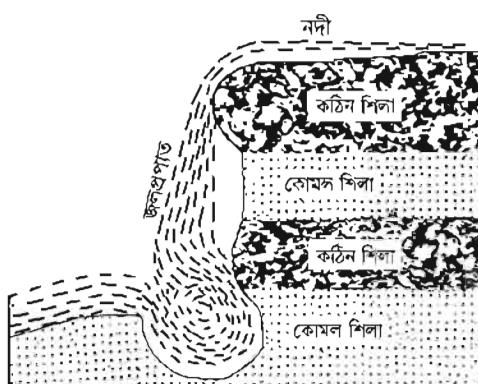


চিত্র ৪.৭ : গিরিধাত

নিম্ন নদের গিরিধাতটি আয় ৫১৮ মিটার গভীর। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ গিরিধাত।

নদী ষথন শূক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয়। এরপ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবী বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার বিস্তৃত, প্রায় ২.৪ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

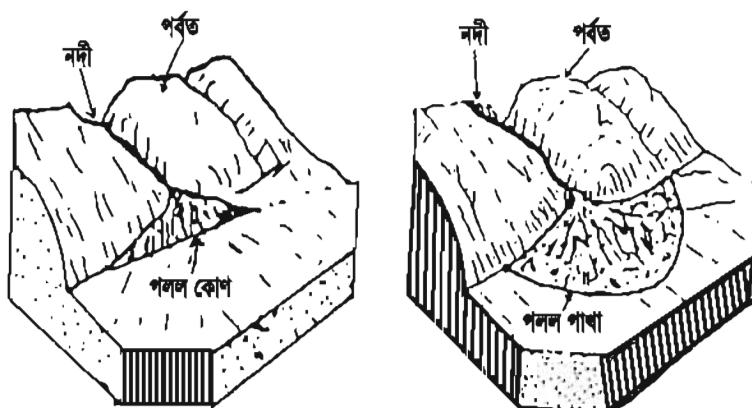
জলপ্রপাত (Waterfall) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলাস্তুরিটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তুরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তুর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এরপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে (চিত্র ৪.৮)। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লেরেন্স নদীর বিখ্যাত নামান্মা জলপ্রপাত এরপে গঠিত হয়েছে।



চিত্র ৪.৮ : জলপ্রপাত

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিকূপ (Landforms from river deposition)

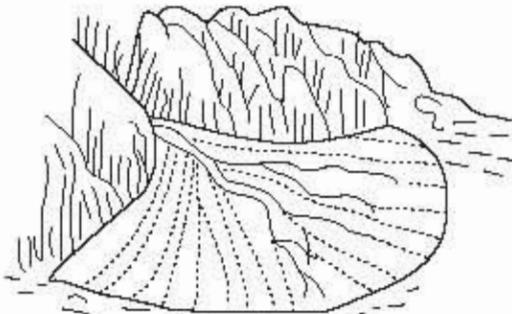
পলল কোণ ও পলল পাথা (Alluvial Cone and Alluvial Fan) : পার্বত্য কোনো অঞ্চল থেকে হঠাতে করে কোনো নদী ষথন সমতুল্যিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সমতুল্যিতে সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণ ও হাতপাথার ন্যায় তৃখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এরপ পললভূমিকে পলল কোণ বা পলল পাথা বলে (চিত্র ৪.৯)।



চিত্র ৪.৯ : পলল কোণ ও পলল শাখা

যেসব অঞ্চলে মাটি অধিক পানি শোষণ করতে পারে সেসব অঞ্চলে পানি শোষণের ফলে শিলাচূর্ণ অধিক দূরত্বে যেতে পারে না এবং সেসব অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ বলে। পানি বেশি শোষণ করে না বলে শিলাচূর্ণ বিস্তৃত হয়ে হাতপাথার ন্যায় তৃখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরপ পললভূমিকে পলল পাথা বলে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীর গতিপথে এরপ তৃখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়।

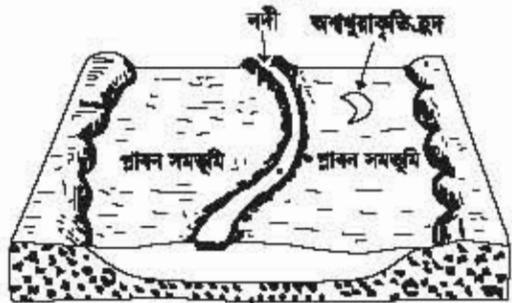
পাদদেশীয় পল্লব সমতৃষ্ণি (Piedmont Alluvial Plain) : অনেক সময় পাহাড়িয়া নদী পাদদেশে পলি সঞ্চয় করতে করতে একটা সময় পাহাড়ের পাদদেশে নতুন বিশাল সমতৃষ্ণি গঠন হওলো। এ ধরনের সমতৃষ্ণিকে পাদদেশীয় পল্লব সমতৃষ্ণি বলে (চিত্র ৪.১০)। বালাদেশের জিতা, আজাই, করতোয়া সংলগ্ন বংপুর ও দিলাজপুর জেলার অধিকাংশ জানহ পল্লব সমতৃষ্ণি নামে পরিচিত। এসব নদী উত্তরের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সহজেই পাহাড় থেকে পল্লব বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পল্লব সমতৃষ্ণি গঠন করেছে।



চিত্র ৪.১০ : পাদদেশীয় পল্লব সমতৃষ্ণি
অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পল্লব সমতৃষ্ণি গঠন করেছে।

প্রাবল সমতৃষ্ণি (Flood Plain) : বর্ষাকালে বিশেষ করে পানি ঝর্কির কারণে নদীর উচ্চারূপ প্রাবল করে তখন তাকে প্রাবল বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দুপাশের ভূমিতে খুব শুরু তর কাদা, পলি দেখতে পাওয়া যায়। এজেবে অনেকদিন পলি জয়তে জয়তে যে বিকৃত সমতৃষ্ণির সৃষ্টি হয় তাকে প্রাবল সমতৃষ্ণি বলে (চিত্র ৪.১১)। সমতৃষ্ণি বলা হলেও এর কোথাও কোথাও সামান্য উচ্চনিতু দেখা যায়।

কয়েকটি জেলা ব্যক্তিক মোটামুটি সময় বালাদেশেই পরা, ঘমুনা, মেঘনা অঞ্চল নদীবিধৌত প্রাবল সমতৃষ্ণি। প্রাবল সমতৃষ্ণির মধ্যে অনেক ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমিকল্প দেখা যায়। এদের মধ্যে ধৰ্মান কয়েকটি হলো— (ক) অর্ধশূরাকৃতি হৃদ, (খ) বালুচর, (গ) আকৃতিক বাঁধ।



চিত্র ৪.১১ : প্রাবল সমতৃষ্ণি

ব-বীণ (Delta) : নদী হ্রদ মোহনার কাছাকাছি আসে তখন তার স্রোতের বেগ একেবারেই কমে যায়। এতে বালি ও কাদা জলানিষ্ঠাপে সঞ্চিত হয়। নদীর স্রোতটোন যদি কোনো সাধারে এসে শক্তি হয় তাহলে এই সমস্ত বালি, কাদা নদীর মুখে জমে নদীমুখ খোঁ বক্ষ হয়ে যায় এবং থীরে থীরে এর তর সাধারের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চূড়ান্তিকে বেঁটে করে সাধারে শক্তি হয়। বিকোধাকার এই নতুন সমতলভূমিকে ব-বীণ বলে (চিত্র ৪.১২)। এটি দেখতে পাওয়ায় বালা ও এর মতো এবং এটি শব্দ 'জেল্টা'র মতো তাহি এর বালা নাম ব-বীণ এবং ইংরেজি নাম 'Delta' হয়েছে। হগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে মেঘনার সীমানা পর্যন্ত গঠিমূলক ও বালাদেশে সমস্ত মঙ্গলাচল গজা ও পজা নদীর বিদ্যুত ব-বীণ অঞ্চল।



চিত্র ৪.১২ : ব-বীণ

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন (External Structure of the Earth)

পৃথিবীর উপরিভাগে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপসমূহই পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন। নিম্ন প্রথান ভূমিরূপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ (The Main Landforms of the Earth)

ভূগুঠ সর্বত্র সমান নয়। এর আকৃতি, প্রকৃতি এবং গঠনগত বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ভূমির এই আকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যকেই ভূমিরূপ বলে। ভূগুঠের কোথাও রয়েছে উচু পর্বত, কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা, বন্ধুরতা এবং ঢালের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো— (১) পর্বত, (২) মালভূমি, (৩) সমভূমি।

পর্বত (Mountains)

সমন্ব্যতল থেকে অন্তত ১,০০০ মিটারের বেশি উচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাভূপকে পর্বত বলে। সাধারণত ৬০০ থেকে ১,০০০ মিটার উচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাভূপকে পাহাড় বলে। পর্বতের উচ্চতা সমন্ব্যপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন— পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্খল ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। যেমন— হিমালয় পর্বতমালা।

পর্বতের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of mountains)

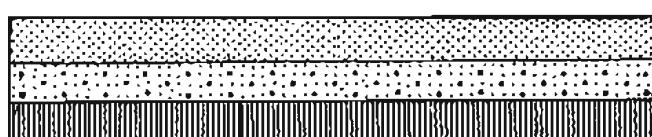
উৎপন্নিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার শ্রেণি প্রকার। যথা—

(ক) ভক্ষিল পর্বত (Fold Mountains)

(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains)

(গ) ছ্যাতি-ভূগ পর্বত (Fault-block Mountains)

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)



(ক) ভক্ষিল পর্বত : ভক্ষ বা ভাঁজ থেকে ভক্ষিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাতলাইক শিলার ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভক্ষিল পর্বত বলে। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উচুর

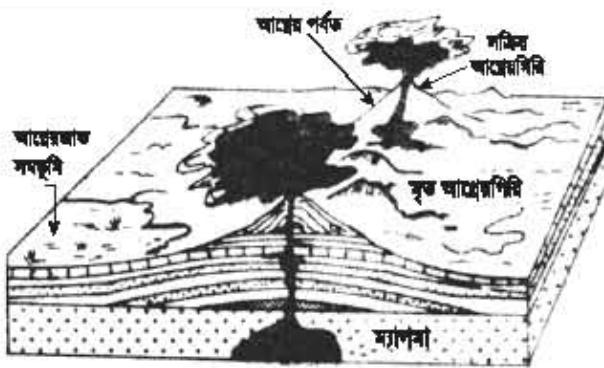


চিত্র ৮.১৫ : ভদ্রিল পর্বত

আমেরিকার রাফি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভদ্রিল পর্বতের উদাহরণ। ভদ্রিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ডাঙ। ভদ্রিল পর্বত কীভাবে সৃষ্টি হয়? সমুদ্র তলদেশের বিস্তারিত অবনমিত হ্যানে দীর্ঘকাল ধরে বিশুল পরিমাণ পাশি এসে জমা হয়। এর চাপে অবনমিত হ্যান আরও নিচে নেমে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভূআলোক্তন বা ভূমিকম্পের কলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে উর্ধ্বভূমি ও নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়। বিচৃক্ত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত উর্ধ্ব ও অধ্যভূমি সংবলিত ভূমিক্ষণ যিনোই ভদ্রিল পর্বত গঠিত হয় (চিত্র ৮.১৫)।

কাজ : পৃথিবীর অসিদ্ধ ডাঙ পর্বতের তথ্য সংরহ করে লেখ (দলগতভাবে)।

(৩) আঞ্চের পর্বত : আঞ্চেরপিণি থেকে উদগীরিত পদার্থ সক্রিয় ও জয়াট বেঁধে আঞ্চের পর্বত সৃষ্টি হয় (চিত্র ৮.১৬)। একে সক্রিয় পর্বতও বলে। এই পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical) হয়ে থাকে। আঞ্চের পর্বতের উদাহরণ হলো— ইতালির তিসুত্তিরাল, কেনিয়ার কিলিমানজুরো, আপালের ঝুঁজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বত।



চিত্র ৮.১৬ : আঞ্চের পর্বত



চিত্র ৮.১৭ : ছাতি-ছুপ পর্বত

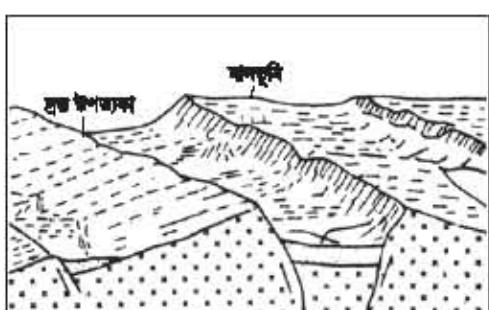
(চিত্র ৮.১৭)। ভারতের বিজ্ঞা ও সাতগুরা পর্বত, জার্মানির ব্র্যাক ফেরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত ছাতি-ছুপ পর্বতের উদাহরণ।

(৪) ছাতি-ছুপ পর্বত : ভূআলোক্তনের সময় ভূপ্লেটের শিলাঞ্চরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ এবং সংকোচনের অন্য ভূত্বকে কাটলের সৃষ্টি হয়। কালগ্রামে এ কাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে হ্যানচ্যাত হয়। ভূগোলের ভাষার অকে ছাতি বলে। ভূত্বকের এ হ্যানচ্যাত কোথাও উপরের দিকে হয়, আবার কোথাও নিচের দিকে হয়। ছাতির কলে উচু হওয়া অংশকে ছুপ পর্বত বলে

(৩) স্যাকোলিখ পর্বত : শুধুমাত্র অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা মাটামা বিভিন্ন গঠনের বারা হ্রান্তবিহীন হজে দ্রুতে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাঁচা পেরে এগুলো দ্রুতের উপরে না এসে দৃঢ়করে নিতে একহানে জমাট বাঁধে। উর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে দৃঢ়কের অণ্ডবিশের গম্ভীর আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্টি পর্বতকে স্যাকোলিখ পর্বত বলে (চিত্র ৪.১৬)। দাল সামান্য খাড়া সব অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত। এ পর্বতের কোনো শুল্ক থাকে না। আমেরিকা মুক্তবাস্তুর হেন্দেলি পর্বত এবং টানাহরণ।



চিত্র ৪.১৬ : স্যাকোলিখ পর্বত



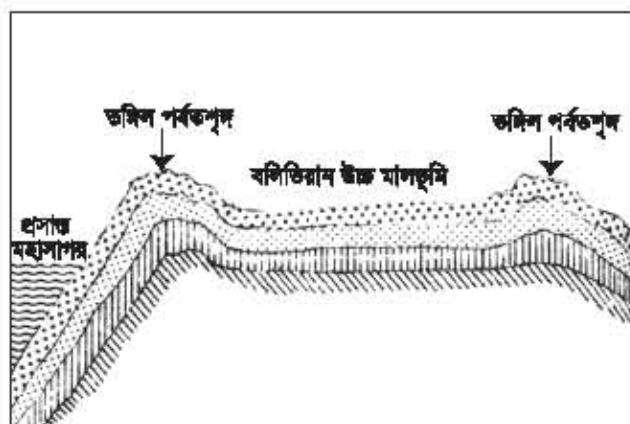
চিত্র ৪.১৭ : মালভূমি

মালভূমি (Plateaus)

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উচু খাড়া চালভূমি জেটি খেলানো বিভীর্ণ সমভলভূমিকে মালভূমি বলে (চিত্র ৪.১৭)।

মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। শুধুমাত্র মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৫,১১০ মিটার।

অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিনি ধরনের। যথা— (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি (Intermontane Plateau), (খ) পাদদেশীয় মালভূমি (Piedmont Plateau) ও (গ) মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau)।



চিত্র ৪.১৮ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি : এই মালভূমি পর্বতবেষ্টিত থাকে। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি বাবে উচ্চতার কুন্তুন ও সক্ষিপ্ত হিমাশয় পর্বত এবং শূর্ঘ-পিচিমেও পর্বত থিবে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, মধ্য আমেরিকার মেজিকো এবং এলিয়ার মালভূমি ও তারিম এ ধরনের মালভূমি (চিত্র ৪.১৮)।

(খ) পাদদেশীয় মালভূমি : উচু পর্বত কঢ়ান্ত হয়ে এর পাদদেশে ভূমি অঘে যে

মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। উভয় আমেরিকার কলোরাডো এবং সক্রিয় আমেরিকার পাতালোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি।

(গ) মহাদেশীয় মালভূমি : সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিভীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, ফিল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপবীপ এর অন্যতম উদাহরণ।

সমভূমি (Plains)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন— নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসবাস, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

উৎপন্নির ধরনের ভিত্তিতে সমভূমিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন— ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional plains) : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির যেমন— নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোনো উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। অ্যাপালেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি, ইউরোপের ফিল্যান্ড ও সাইবেরিয়া সমভূমি এ ধরনের ক্ষয়জাত সমভূমি। বাংলাদেশের মধুপুরের চতুর ও বরেন্দ্রভূমি দুটি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional plains) : নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পলি, বালুকণা, ধূলিকণা কোনো নিম্ন অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। এ ধরনের সঞ্চয়জাত সমভূমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যে কোনো অবস্থানে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— নদীর পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্টি প্লাবন সমভূমি, নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি ব-ধীপ, শীতপ্রধান এলাকায় হিমবাহের গ্রাবেরেখা দ্বারা সঞ্চয়কৃত পলি থেকে গড়ে উঠা হিমবাহ সমভূমি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি থেকে গ্রাফাইট উৎপন্ন হয়?

- | | |
|--------------|--------------|
| (ক) চুনাপাথর | (খ) কয়লা |
| (গ) বেলেপাথর | (ঘ) গ্রানাইট |

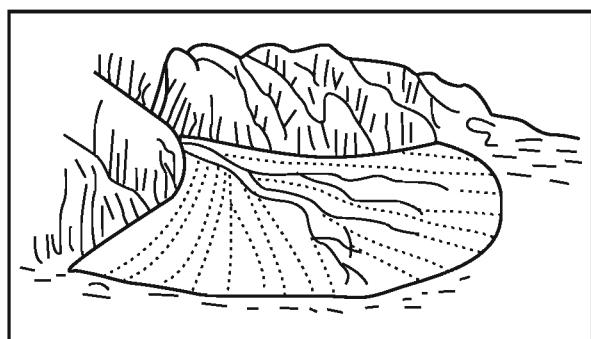
২। নিম্নগতিতে নদীর-

- স্রোতের গতি বেড়ে যায়
- গভীরতা কমে যায়
- পার্শ্বক্ষয়হ্রাস পায়

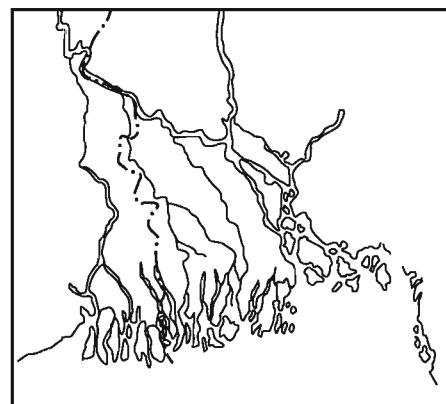
নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র ১



চিত্র ২

৩। চিত্র ১-এর ভূমিরূপ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে দেখা যায়?

- | | |
|------------------|-------------------|
| (ক) দক্ষিণ-পূর্ব | (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম |
| (গ) উত্তর-পশ্চিম | (ঘ) উত্তর-পূর্ব |

৪। চিত্র ১ ও চিত্র ২ উভয়ের ভূমি গঠিত হয়-

- পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে
- নদীর মোহনায়
- ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i & ii

(খ) i & iii

(গ) ii & iii

(ঘ) i, ii & iii

সূক্ষ্মশৈল প্রশ্ন

১। বিধান ও হিমেদি কর্মসংবন্ধনের উদ্দেশে ইতাপি প্রেসেন। একদিন বিকেলে তারা সুরক্ষে শিরে দেখতে পান একটি ঝানের ভূমি খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং দেখতে অনেকটা মোচাকৃতির। কথা অসমে তারা জানতে পারেন বিধানের বাড়ি বালাদেশের বাসন্তবালে এবং হিমেলের বাড়ি খুলনায়।

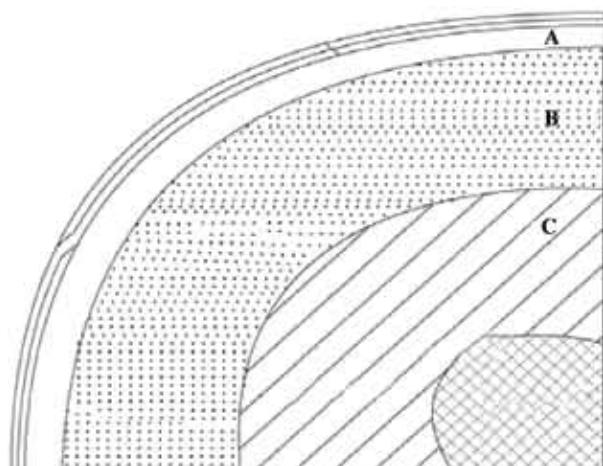
ক. নদী উপত্যকা কাকে বলে?

খ. উর্ধ্বগতিতে নদী উপত্যকা 'তি' আকৃতির হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিধান ও হিমেলের দেখা সূমিলপুরি অগ্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাদের উভয়ের বাড়ি বে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চল মুক্তির সূমিল গঠন বৈশিষ্ট্যের ফুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।



ক. ধনিজ কী?

খ. পালালিক শিলার জীবাণু দেখা যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের টিক্কা 'A' টিক্কিত জরুর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

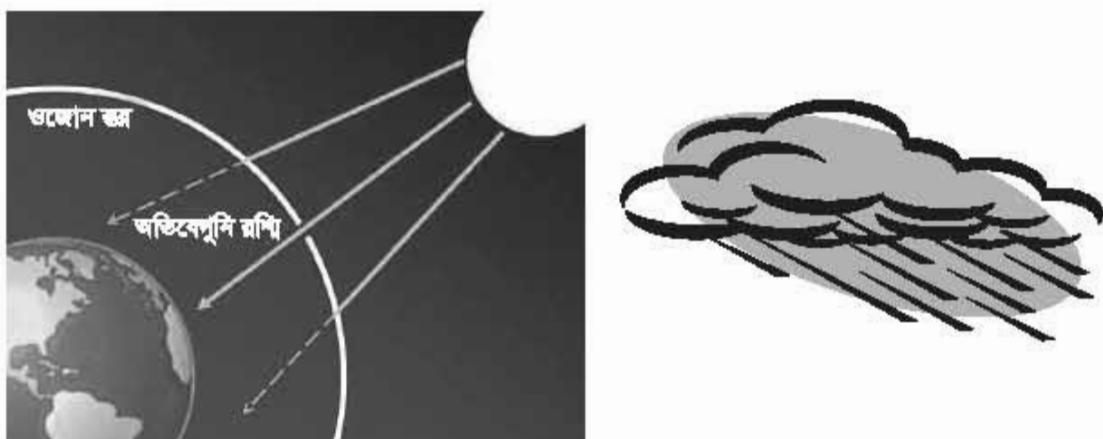
ঘ. উপরের টিক্কা 'B' ও 'C' জরুর গঠন বৈশিষ্ট্যের ডিগ্রিতা আছে কি? তোমার উভয়ের গক্ষে মুক্তি ১০
দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

Atmosphere

আমরা জ্বালতে পেতেছি এখন পর্যন্ত মহাকাশে আবিষ্কৃত সৌরজগতের বাসযোগ্য আসর্দ্ধ শহীটি হচ্ছে পৃষ্ঠিটী। স্পৃষ্টের চারদিকে জীবজগতের শাখা ধারণের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদান বেষ্টিত রয়েছে। এটাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। এই বায়ুর উপাদানসমূহ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছে। এগুলো পৃষ্ঠিটীর মানুষ ও অন্যান্য জীবজগতের জন্য কৃত সহায়তা, তা আমরা জ্বালাই ও বোঝাই চেষ্টা করব।



এ অধ্যায় গাঠ শেবে আমরা—

- বায়ুর উপাদান কৰতে পারব।
- বায়ুমণ্ডলের জ্বালিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের পুরুষ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- জলবায়ুর নিরামক কৰনা করতে পারব।
- বায়ুপ্রবাহ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধর্কাঙ্গের বৃক্ষিকাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বিশ্ব উৎকায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের পারম্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃষ্ঠিটীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভব্য হবে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনে বালাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

বায়ুর উপাদান (Composition of the Atmosphere)

জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীর জীবকুলের কাছে যেসব জিনিস অপরিহার্য বায়ুমণ্ডল তাদের মধ্যে অন্যতম। যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। তাই একে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। বায়ুমণ্ডলের বিশালতা এবং এর ক্রিয়াদী সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিরন্তর চলছে। বিভিন্ন উপগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের ব্যাপ্তি যত বিশাল হোক না কেন, এর প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ, উষ্ণিদি ও জীবজন্তুর উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন— বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাস্ত্ব এবং ধূলিকণা ও কণিকা (সারণি ১)।

সারণি ১ : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন, ওজেন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয়বাস্ত্ব	০.৮১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
মোট ১০০.০০	

বায়ুমণ্ডল নানাপ্রকার গ্যাস ও বাস্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান উপাদান দুটি— নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলে আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগ এবং বাকি শতকরা ১.২৭ ভাগ অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাস্ত্ব ও কণিকাসমূহ জায়গা জুড়ে আছে। জীবজগৎ পরম্পর অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বেঁচে আছে। ওজেন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগৎকে রক্ষা করে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য (Atmospheric layers and its characteristics)

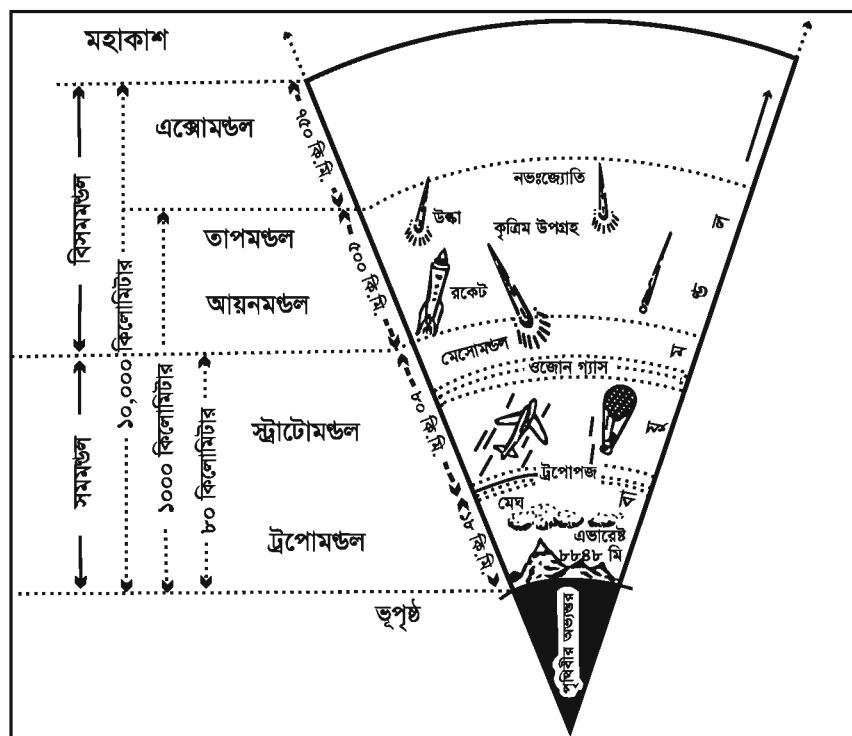
বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উক্ততার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা— ট্রিপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এক্সোমণ্ডল (চিত্র ৫.১)। উল্লিখিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল (Homosphere) এবং পরবর্তী দুটি বিষমমণ্ডল (Heterosphere)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রোপোস্ফের (Troposphere)

এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। মেঘ, বৃক্ষপাত, বজ্রপাত, বায়ুখুবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রোপোস্ফেরের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রোপোবিরতি (Tropopause)। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রোপোস্ফেরের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Troposphere)

- (ক) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব ও উর্ফতা কমতে থাকে। সাধারণভাবে প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় 6° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
- (খ) উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।
- (গ) নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাস্প বেশি থাকে।
- (ঘ) ধূলিকণার অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ এই স্তর বহন করে।
- (ঙ) যে উচ্চতায় তাপমাত্রা বন্ধ হয়ে যায় তাকে ট্রোপোবিরতি বলে। এখানে তাপমাত্রা -54° সেলসিয়াসের নিচে হতে পারে।



চিত্র ৫.১ : বায়ুমণ্ডলের শরণবিন্যাস

স্ট্রাটোমণ্ডল (Stratosphere)

ট্রিপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার ছিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause) বলে।

স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Stratosphere)

- (ক) এই স্তরেই ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে আছে। এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশি (Ultraviolet rays) শুষে নেয়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা 4° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- (খ) এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাঢ়া কোনোরকম জলীয়বাস্প থাকে না। ফলে আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুক। বড়বৃক্ষ থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে।
- (গ) প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত নির্ধারণ করে।

মেসোমণ্ডল (Mesosphere)

স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি (Mesopause) বলে।

মেসোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Mesosphere)

- (ক) এই স্তরে ট্রিপোমণ্ডলের মতোই উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। যা -83° সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। মেসোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে।
- (খ) মহাকাশ থেকে যেসব উক্ত পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়।

তাপমণ্ডল (Thermosphere)

মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলে।

তাপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Thermosphere)

- (ক) এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে 1480° সেলসিয়াসে পৌছায়।
- (খ) তাপমণ্ডলের উপরের স্তরে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে।
- (গ) তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশি ও অতিবেগুনি রশির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়।
- (ঘ) ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতারতরঙ্গ আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এক্সোমণ্ডল (Exosphere)

তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইট্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

এক্সোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Exosphere)

- (ক) এক্সোমণ্ডল, তাপমণ্ডল অতিক্রম করে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এটি ক্রমান্বয়ে আন্তর্গত স্থান (Interplanetary Space) এ প্রবেশ করে।
- (খ) এ স্তরের তাপমাত্রা প্রায় 300° সেলসিয়াস থেকে 1650° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।
- (গ) এ স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস যেমন— অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম ধারণ করে, কেননা মাধ্যাকর্ষণের ঘাটতির কারণে গ্যাস অণ্ড বা কণাগুলো সহজে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজ : নিচের ছকটিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো দলে কাজ করে লেখ।				
ট্রিপোমণ্ডল	স্ট্রাটোমণ্ডল	মেসোমণ্ডল	তাপমণ্ডল	এক্সোমণ্ডল

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব (Importance of Difference Layers of Atmosphere)

- বায়ুমণ্ডল ছাড়া যেমন কোনো শব্দতরঙ্গ স্থানান্তরিত হয় না, তেমনি ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতারতরঙ্গ আয়নন্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ট্রিপোমণ্ডল ছাড়া কোনো আবহাওয়ারও সূচী হতো না; বরফ জমত না; মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সূচী হতো না। শস্য ও বনভূমির জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হতো না।
- পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলীয় স্তর থাকায় এর দিকে আগত উষ্ণাপিণ্ড অধিক পরিমাণে বিদ্ধবন্ত হয়। ওজোন স্তর না থাকলে সূর্য থেকে মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে প্রাণিকুল বিনষ্ট করত।
- বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, বরং পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের মতো মরুময় হতো।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান (Elements of Weather and Climate)

আমরা পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট থেকে প্রতিদিন আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করে থাকি। আবহাওয়া মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের আবহাওয়া অফিস এ সংক্রান্ত উপাস্ত ও তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন সরবরাহ করছে। আবহাওয়া অফিসগুলোতে দিনের পর দিন আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা হয়। যে কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলো নিয়ে পরিবর্তনশীল। আবার পৃথিবীর সব স্থানের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। ফর্মা নং-১০, ভূগোল ও পরিবেশ-৯ম-১০ শ্রেণি

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে। কোনো একটি অঞ্চলের সাধারণত ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে। কাজেই জলবায়ু হলো কোনো একটি অঞ্চলের অনেক দিনের বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের সামগ্রিক অবস্থা।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা ও বারিপাত।

জলবায়ুর নিয়ামক (Factors of Climate)

পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম নয়। এর কোনো অঞ্চল উষ্ণ এবং কোনো অঞ্চল শীতল। আবার কোনো স্থান বৃষ্টিবহুল এবং কোনো স্থান বৃষ্টিহীন। কিছু ভৌগোলিক বিষয়ের পার্থক্যের কারণে স্থানভেদে জলবায়ুর এরকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়গুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে। বিভিন্ন নিয়ামকের বিবরণ ও জলবায়ুর উপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করা হলো :

১। অক্ষাংশ (Latitude) : সূর্যকিরণের মাত্রা অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন রকম হয়। নিরক্ষরেখার উপর সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। আর নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, সূর্যকিরণ তির্থকভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে।

২। উচ্চতা (Altitude) : সমুদ্র সমতল থেকে যতই উপরে উঠা যায়, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরাদির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু সম্পন্ন হয়। যেমন— দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতার তারতম্যের জন্য এদের জলবায়ু ভিন্ন রকম। উচ্চতা বেশি হওয়াতে শিলং-এ দিনাজপুরের চেয়ে তাপমাত্রা কম হয়।

৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from the sea) : জলভাগের অবস্থান কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন— কর্বাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু রাজশাহীর তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকার তাপমাত্রায় শীত-গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য হয় না। এ ধরনের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। কারণ স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা যেমন দুর্ত উষ্ণ হয়, আবার দুর্ত ঠান্ডাও হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগের এলাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, আবার শীতকালে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। এ ধরনের জলবায়ুকে মহাদেশীয় বা চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।

৪। বায়ুপ্রবাহ (Wind movement) : বায়ুপ্রবাহ কোনো এলাকার জলবায়ুর উপরে গ্রুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু কোনো এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন— বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর জলীয়বাস্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে শুক মহাদেশীয় বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

৫। **সমুদ্রস্রোত (Ocean currents)** : শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠাণ্ডা বা উষ্ণ হয়। যেমন— উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল ল্যাট্রাইট স্রোত উভৰ আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে।

৬। **পর্বতের অবস্থান (Location of the mountains)** : উচ্চ পার্বত্যময় এলাকা বায়ুপ্রবাহের পথে বাধা হলে এর প্রভাব জলবায়ুর উপর পরিসংক্ষিত হয়। যেমন— মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উভৰে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত হিমালয় পর্বতে বাধা পাওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ু ইউরোপের মতো তত শীতল হয় না।

৭। **ভূমির ঢাল (Slope of the land)** : সূর্যকিরণ উচ্চভূমির ঢাল বরাবর সম্ভবাবে পতিত হলে সেখানকার বায়ু এবং ভূমি বেশি উন্নত হয়। কিন্তু ঢালের বিপরীত দিকে সূর্যকিরণ কিছুটা ত্যর্কভাবে পড়ে বা কখনো সূর্যালোক খুব কম পায় ফলে বায়ু শীতল হয়।

৮। **মৃত্তিকার গঠন (Composition of the soil)** : মৃত্তিকার গঠন বা বুনট সূর্যতাপ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রস্তর বা বালুকাময় মৃত্তিকার তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। এজন্য তা দ্রুত উন্নত এবং দ্রুত শীতল হয়। যেমন— মরুভূমিতে দিনে প্রচন্ড গরম এবং রাতে প্রচন্ড ঠাণ্ডা।

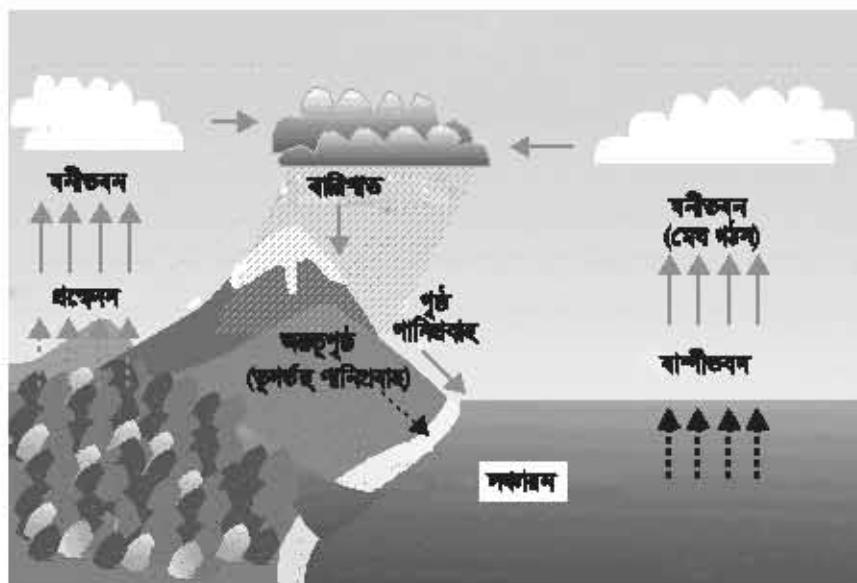
৯। **বনভূমির অবস্থান (Location of the forest)** : গাছপালা থেকে প্রস্তেবন (Transpiration) ও বাস্পীভবনের (Evaporation) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাস্পপূর্ণ এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাছাড়া বনভূমি ঝাড়-তুফান, সাইক্লোনের গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। বনভূমিতে সূর্যালোক মাটিতে পৌছতে পারে না, ফলে সেখানকার বায়ু তুলনামূলকভাবে শীতল হয়।

কাজ : বাংলাদেশের জলবায়ুর ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়ামকসমূহ কীভাবে প্রভাব রাখছে? তা দলে মাথা খাটিয়ে (Brain storming) ব্যাখ্যা কর। প্রত্যেক দল ১৫ মিনিট কাজ করবে এবং দলে কাজ সম্পাদন শেষে সমগ্র দল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় পাবে।

পানিচক্র (The Water Cycle)

সাধারণভাবে পানি কোথাও স্থির অবস্থায় নেই, বিভিন্নভাবে সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কারণ পানি বাস্তীয়, তরল ও কঠিন এ তিনি অবস্থায় থাকতে পারে। সমগ্র বিশ্বের পানি সরবরাহের সর্ববৃহৎ ও স্থায়ী আধার হচ্ছে সমুদ্র। বাস্পীভবনের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি উন্নত ও হালকা হয়ে বাস্পাকারে উপরে উঠে এবং সুবিশাল বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার উষ্ণিদ থেকে প্রস্তেবনের মাধ্যমে জলীয় অংশ বায়ুমণ্ডলে সম্পৃক্ত হয়। জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, তুষার, বরফ প্রভৃতিতে পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত

পানির কিছু অংশ বাণীভবনের মাধ্যমে গুরুতর বায়ুমণ্ডলে মিশে যাব, কিছু অংশ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে (Run off) সমুদ্রে পতিত হয়, কিছু অংশ উষ্ণিদ অভিবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় (Osmosis) থাইল করে এবং অবশিষ্টাংশ স্ফুর্তির শিলাঞ্চরের মধ্যে চুরে (Percolation) প্রবেশ করে। এভাবেই প্রকৃতিতে পানিচক্র চলতে থাকে (চিত্র ৫.২)।



চিত্র ৫.২ : পানিচক্র

পানিচক্রের প্রক্রিয়াগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১। **বাণীভবন (Evaporation) :** সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, ঝুম প্রভৃতি থেকে পানি ফ্রান্সান্ত বাল্পে পরিষ্কত হচ্ছে এবং তা অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে মিশে আস্ত্র্য হয়ে যাচ্ছে। একে বাণীভবন বলে। বায়ুর বাণী ধারণ করার একটা সীমা আছে। তা বায়ুর উক্তার উপর নির্ভর করে। বায়ু বক্ত উক্ত হয়, তত বেশি জলীয়বাণী ধারণ করতে পারে। সমুদ্রই জলীয়বাণীর প্রধান উৎস। উষ্ণিদজগৎ, নদ-নদী এবং ঝুম স্ফুর্ত জলাশয় থেকেও বায়ু জলীয়বাণী সংগ্রহ করে থাকে।

২। **বনীভবন (Condensation) :** পরিষ্কৃত বায়ু উক্তার হলে তখন এটি আরও বেশি জলীয়বাণী ধারণ করতে পারে। আবার বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের যতো বেশি জলীয়বাণী ধারণ করে রাখতে পারে না, তখন জলীয়বাণীর কিছু অংশ পানিতে পরিষ্কত হয়, তাকে বনীভবন বলে।

বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়বাণী ধারণ করতে পারে। কিছু বায়ু উক্তার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয়বাণী ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট উক্তার বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাণী ধারণ করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয়বাণী বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক জলীয়বাণী এহেন করতে পারে না। তখন তাকে সম্পূর্ণ বা পরিষ্কৃত বায়ু (Saturated air) বলে।

বায়ু যে উষ্ণতায় (জলীয়বাস্পরূপে) ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক (Dew point) বলে। তাপমাত্রা 0° সেলসিয়াস বা হিমাঞ্জের (Freezing point) নিচে নেমে গেলে তখন ঘনীভূত জলীয়বাস্প কঠিন আকার ধারণ করে এবং তুষার ও বরফরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু হিমাঙ্ক শিশিরাঞ্জের উপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) : জলীয়বাস্প বায়ুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুর জলীয়বাস্প ধারণ করাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাস্পের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম। বায়ুতে জলীয়বাস্প যখন একদম থাকে না, তাকে শুক বায়ু বলে। যে বায়ুতে জলীয়বাস্প বেশি থাকে, তাকে আর্দ্র বায়ু বলে। আর্দ্র বায়ুতে জলীয়বাস্পের পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ। বায়ুর আর্দ্রতা হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দুভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা— পরম আর্দ্রতা (Absolute humidity) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity)।

কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাস্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা বলে। অপরদিকে, কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাস্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে একই উষ্ণতায় পরিপূর্ণ করতে যে পরিমাণ জলীয়বাস্পের প্রয়োজন এ দুটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

৩। **বারিপাত (Precipitation) :** জলীয়বাস্প উপরে উঠে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ও তুষারকণায় পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে বারিপাত বলে। সকল প্রকার বারিপাত এই জলীয়বাস্পের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি অনুযায়ী বারিপাত বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা— তুষার, তুহিন, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

শিশির (Dew) : ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণের মাধ্যমে রাতে শীতল হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে বায়ুর জলীয়বাস্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলাবিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে সংক্ষিপ্ত হয়। এটাই শিশির নামে পরিচিত।

কুয়াশা (Fog) : কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলের ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয়বাস্প রাত্রিবেলায় অল্প ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভূপৃষ্ঠের কিছু উপরে ভাসতে থাকে। একে কুয়াশা বলে।

তুষারপাত (Snow fall) : শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঞ্জের নিচে নামলে জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুষার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে তুষারপাত বলে।

৪। **পানিশ্বাহ (Run off) :** বারিপাতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে আগত পৃষ্ঠপ্রবাহ পানিরূপে নদী, হ্রদ, সমুদ্রে পতিত হয়। আবার ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্তঃপ্রবাহরূপে নদী ও সমুদ্রে জমা হয়। পানির কিছু অংশ ভূগর্ভে জমা হয়। পানিশ্বাহকে আবার কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পৃষ্ঠপ্রবাহ (Surface flow)

(খ) অন্তঃপ্রবাহ (Subsurface flow)

(গ) চুয়ানো (Percolation)

(ঘ) পরিস্তবণ (Infiltration)

ভূঅভ্যন্তরস্থ পানি পুনরায় প্রস্তুত বাস্পীভবন প্রক্রিয়ায় বায়ুতে ফিরে আসে।

কাজ : নিচের শব্দগুলো দিয়ে কী বোরাম? তা দলে আলোচনা করে ছকে উত্তৰ কর।

বাস্তীত্বন	অনীত্বন	বারিশাত	পৃষ্ঠবাহ

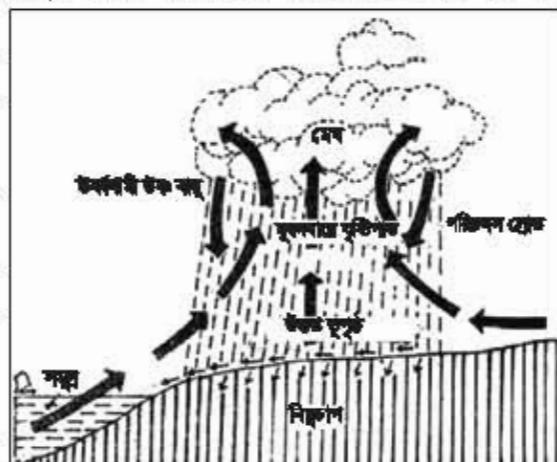
বৃষ্টিগাত (Rainfall)

স্থানবিক্রিয়াবে ভাসমান যেৰ অনীভূত হয়ে পানিৰ কোটা কোটা আকারে মাধ্যাকৰ্ষণ পদ্ধিৰ টানে অনুগতে পতিত হলে তাকে বৃষ্টিগাত বলে। এই বৃষ্টিগাত কখনো অবল এবং কখনো শুক্তি আকারে অনুগতে পতিত হয়। বৃষ্টিগাত বৃষ্টিমাপক যন্ত্ৰেৰ (Rain gauge) দ্বাৰা পরিমাণ কৰা হয়।

বৃষ্টিগাতেৰ কাৰণ (Causes of Rainfall) : সূৰ্যৰ উভালে সূক্ষ্ম জলীয়বাচ্চা উপত্রের শীতল বাহুৰ সম্পর্কে এলৈ সহজেই তা পৱিষ্ঠুত হয়। পৱে ঐ পৱিষ্ঠুত বাহু অতি ক্ষুদ্র অলকণায় পৱিষ্ঠত হয়ে বাহুমণ্ডলৰ ধূলিকণাকে আশ্রয় কৰে অমাটি বৈধে যেদেৱ আকারে ভাসতে থাকে। বাহুমণ্ডলৰ উক্ততা কোনো কাৰণে আৱণ হৃস পেলে ঐ যেৰ অনীভূত হয়ে পানিক্ষিপ্তত অথবা বায়ুকূচিতে পৱিষ্ঠত হয় এবং মাধ্যাকৰ্ষণ পদ্ধিৰ থতাবে তা অনুগতে নেবে আসে। এভাবে পৃষ্ঠীতে বৃষ্টিগাত হয়ে থাকে। সূতৰাং বৃষ্টিগাতেৰ কাৰণ হলো—(১) বাতাসে জলীয়বাচ্চেৰ উপত্রিতি, (২) উৰ্ধ্ব পমন এবং (৩) বাহুমণ্ডলৰ উক্ততা হৃস পাওৱা।

বৃষ্টিগাতেৰ প্ৰেণিভিতাণ (Classification of Rainfall) : জলীয়বাচ্চপূৰ্ণ বাহু বে কাৰণে উপৱে উত্তে অনীভূত হয়ে বৃষ্টিগাতে পৱিষ্ঠত হয়। সেই অনুসৰে বৃষ্টিগাতেৰ প্ৰেণিভিতাণ কৰা হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্য ও প্ৰকৃতি অনুসৰে স্থানবিক বৃষ্টিগাতকে প্ৰধানত চাৰটি প্ৰেণিতে ভাগ কৰা হয়ে থাকে। বৰ্তা—(১) পৱিচলন বৃষ্টি, (২) বৈশ্লেষিক বৃষ্টি, (৩) বাহুথাটিৱৰচনিত বৃষ্টি ও (৪) স্বৰ্ণ বৃষ্টি।

(১) **পৱিচলন বৃষ্টি (Convectional Rain) :** দিনেৰ কেৱল সূৰ্যৰ কিমখে পানি বাল্পে পৱিষ্ঠত হয়ে সোজা উপৱে উঠে বাব এবং শীতল বাহুৰ সম্পর্কে এসে ঐ জলীয়বাচ্চ অথবে যেৰ পৱে বৃষ্টিতে পৱিষ্ঠত হয়ে সোজাসুষি নিচে নেমে আসে। এৰূপ বৃষ্টিগাতকে পৱিচলন বৃষ্টি বলে। নিম্নকীয় অঞ্চলে (Equatorial region) হৃতালেৰ চেয়ে জলতালেৰ বিস্তৃতি বেশি এবং এখনে স্বৰ্ণকৰণ সাৱাৰছৰ লক্ষ্যতাৰে পড়ে। এ সূচি কাৰণে এখনকাৰ বাহুমণ্ডলৰ সাৱাৰছৰ জলীয়বাচ্চেৰ পৱিচলন বৈশি থাকে। জলীয়বাচ্চ হালকা বলে সহজেই তা উপৱে উঠে দিয়ে শীতল বাহুৰ সম্পর্কে এসে পৱিচলন বৃষ্টিহূপ্তে আৰে পড়ে। তাই নিম্নকীয় অঞ্চলে সাৱাৰছৰ প্ৰতিদিনই বিকেল অথবা সন্ধিয়াৰ সময় এৰূপ বৃষ্টিগাত হয়। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলৰ শীঘ্ৰকালেৰ শুৰুতে পৱিচলন বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময়ে এই অঞ্চলেৰ অনুগত পৱিচলন বৃষ্টি হলো উপৱে উঠে বাব এবং শীতল বাহুৰ সম্পর্কে এসে পৱিচলন বৃষ্টিহূপ্তে গতিত হয় (চিত্ৰ ৫.৩)।

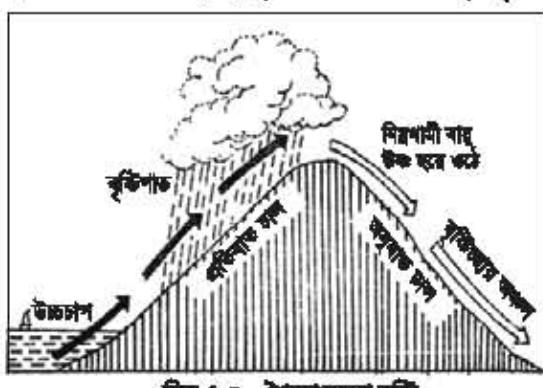


চিত্ৰ ৫.৩ : পৱিচলন বৃষ্টি

ପରିଚଲନ ବୃକ୍ଷ ନିଯୁତ୍ତିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁମୂଳନ କରେ ଥକେ ଥାକେ :

- শৈচাঙ্ক সূর্যকিরণে অনুষ্ঠি মুভ উভয়ে হয়ে ওঠে।
 - ভূপর্ণের উপর বায়ু উক এবং হাতকা হয়ে উপরের দিকে উঠে পরিচলনের সূচিটি করে।
 - উর্ধবসূর্যী বায়ু শুরু হৃদ্র ভাল ক্লাস হাজে সীতাম হতে থাকে এবং বায়ুতে বায়েক পরিষ্কার জলায়াবাসের উপরিভিত্তে ঘনীভবন হয়।
 - ঘনীভবনের ফলে মেঘ উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আক্রমণ মেঘের সূচিটি করে। এ ধরনের মেঘ থেকে বাড়সহ সুবলাধারে বৃক্ষ এবং কখনো কখনো শিলাবৃক্ষ এ বজ্রগাত হয়ে থাকে।

(২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic Rain) : জরীববাতশূর্প বায়ু স্থানগুলোর উপর দিয়ে অবাহিক হওয়ার সময় যদি পর্যন্তগুলো কোনো উচ্চ পর্বতস্তুপিতে আধা পাই ভাসলে এই বায়ু উপরের লিফে উঠে যায়। তখন জরীববাতশূর্প বায়ু কমথ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উচ্চ অংশে ধীভূত ও বনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত চালে (Windward slope) বৃষ্টিগাত ঘটায়। এরপে বৃক্ষগাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৪)।



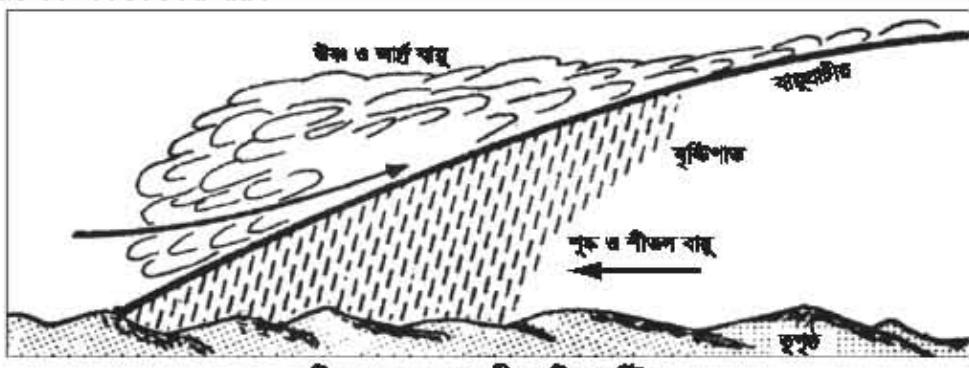
लिख ५.४ : वैद्यतांत्रिक चुक्ति

ପରିଷ ଅଣ୍ଡିକ୍ରମ କରେ ଏ ବାବୁ ସଥିନ ପରିଷରେ ଅଗର ନାଟ୍ରେ
ଆର୍ଦ୍ର ଅନୁଵାତ ଢାଳେ (Leeward slope) ଏଲେ ଶୌହାଗ
ତଥିନ ଜାଣିଯାଇଥିବା କମେ ଯାଏ । ଏହାଙ୍କ ନିଚେ ନାମାର ଫଳେ
ଏ ବାବୁ ଉକ୍ତ ଓ ଆଗରାପ ଶୂନ୍ୟ ହେ । ଏ ମୁଠୋ କାରାପେ ଏଥାନେ
ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ହେ ନା । ଏହୁଁ ଥାଏ ବୃକ୍ଷଧୀନ ହାନକେ
ବୁଝିଯାଇ ଅଗଳ (Rain-shadow region) ବାଲେ ।

ଅଶୀର୍ବାଦପୂର୍ବ ମଧ୍ୟିଷ-ଗନ୍ତିଷ ମୌଶୁମ୍ବ ବାହୁ ହିମାଳୟ
ପର୍ବତେ ବାଧା ପେନେ ଆଶକେ ଥାଇଁ ଶୈଳୋହକେଳ
ବୃକ୍ଷିଗାଡ ଦୋହାର । କିମ୍ବା ତାର ଉତ୍ତର ଦିକେ ଅବହିତ
ତିକାଙ୍କେ ଯାଲଭୁମିକେ ବୃକ୍ଷିଜ୍ଵାମ ଅଖଣ୍ଡ ଦଲେ ।
ବେଶ୍ବାସେ ସମ୍ପିଳାଙ୍କେ ପରିଚାପ ଦେଲେ କ୍ରମ ।

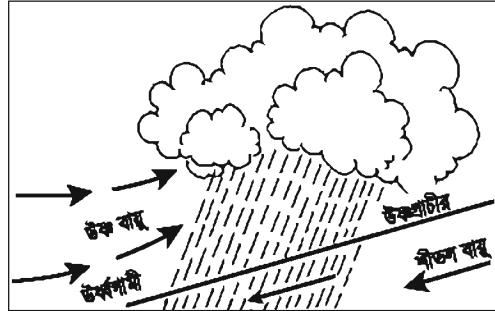
(c) वायुप्रतीक्षिक पूर्णि (Frontal Rain) : शीतल ओ उष्ण वायु मुख्यमयि उपस्थित होने उक वायु एवं शीतल वायु एक तिक्कात्तेन यालद्वयिके वृक्तिज्ञाय अधिक बहु। वेदामे वृक्तिपात्रेय परिवाप्त देवे कर्म।

অপৰের সঙ্গে মিশে না পাইয়ে ভাসের মধ্যবর্তী এলাকায় অদৃশ্য বাহুচাটিরে (Front) সৃষ্টি করে। বাহুচাটির নলগুলি এলাকায় শীতল বাহুর সহিতে উক্ত বাহুর ভাসমাজা ক্লাস পাও ফলে শিপিরাজের সৃষ্টি হয়। ফলে উক্ত বাহুর সহযোগসহ বৃক্ষিকাণ্ড ঘটে, একে বাহুচাটিরজনিক বৃক্ষ বলে (চিত্র ৫.১)। এ প্রকার বৃক্ষিকাণ্ড সাধারণত নাভিশীতোক অঞ্চলে দেখা যায়।



চিত্র ৫.৯ : বাস্থাটীরজনিত বৃক্ষ

(৪) ঘূর্ণি বৃষ্টি (Cyclonic Rain) : কোনো অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে জলভাগের উপর থেকে জলীয়বাস্পপূর্ণ উষ্ণ এবং জলভাগের উপর থেকে শূক শীতল বায়ু এই একই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অনুভূমিকভাবে ছুটে আসে। শীতল বায়ু তারী বলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপর ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। জলভাগের উপর থেকে আসা উষ্ণ বায়ুতে থুরু জলীয়বাস্প থাকে। এই বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠলে তার তিতারে জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণি বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৬)। এই বৃষ্টিপাত সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শীতকালে এরূপ বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।



চিত্র ৫.৬ : ঘূর্ণি বৃষ্টি

কাজ : বাহ্যাদেশে কী কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন হয়? তা ব্যাখ্যা কর। এ কাজটি শ্রেণিকক্ষে দলে আগোচন করে সম্পাদন কর।

বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement)

বায়ুর তাপ ও চাপের পার্শ্বকের জন্য বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল বায়ু চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

১। নিম্নচাপমণ্ডলের উভ্রন্তি ও হালকা বায়ু উর্ধ্বে উচ্চিত হলে বায়ুমণ্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে উচ্চচাপমণ্ডল থেকে শীতল ও তারী বায়ু সর্বদা নিম্নচাপমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

চাপ বলয় (Pressure Belts) : ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপের পার্শ্বক্য এবং গোলাকার পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি চাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয় : (১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, (২) আন্তরীয় উচ্চচাপ বলয়, (৩) উপ-মেরুবৃক্ষের নিম্নচাপ বলয়, (৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়।

২। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষেব্রো থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের কারণে গতিবেগ ক্রমান্বয়ে ঝুঁস পায়। এ উভয় কারণে সূর্যায়মান পৃথিবীপৃষ্ঠে গতিশীল গদার্থ (যেমন— বায়ুপ্রবাহ ও অলঙ্কার) সরাসরি উভয়-দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে উভয় গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। ফেরেলের সূত্র (Ferrel's Law) অনুসারে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়।

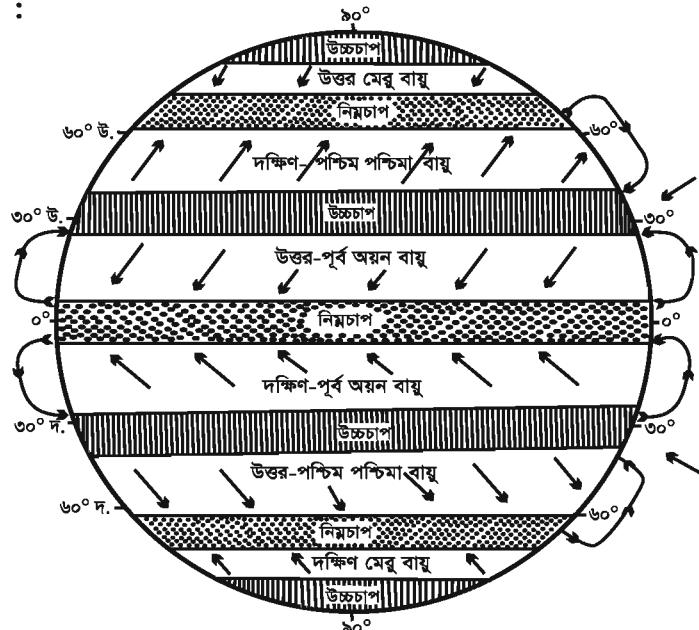
নিম্নে কয়েকটি বায়ুপ্রবাহ যেমন— নিয়ত বায়ু, সমুদ্র ও স্থলবায়ু, মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো।

নিয়ত বায়ু (Planetary Winds)

নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু তিনি প্রকারের। যথা— অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু (চিত্র ৫.৭)।

অয়ন বায়ু (The Trade Winds) :

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কক্টীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও তারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পরিচালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এ বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণে যাতায়াত করত বলে এগুলোকে অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে উঠে উত্তরে উঠে যায়। তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নিরক্ষরেখার উভয়দিকে উত্তর-দক্ষিণে 5° অক্ষাংশ পর্যন্ত একটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ বলয়কে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Doldrum) বলে।



চিত্র ৫.৭ : নিয়ত বায়ু

পশ্চিমা বায়ু (The Westerlies) : কক্টীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ব্যতীত আরও দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ুপ্রবাহকে পশ্চিমা বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ অধিক বলে স্থানীয় কারণে পশ্চিমা বায়ুর সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি বলে পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এজন্য এই বায়ুপ্রবাহকে প্রবল পশ্চিমা বায়ু (Brave west winds) বলে। 30° থেকে 40° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চলন্তি (Roaring forties) বলে।

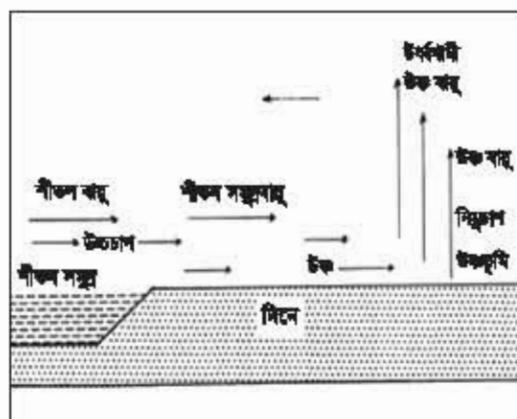
নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের ন্যায় ত্রাণীয় উচ্চচাপ বলয়েও দুটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। 30° থেকে 35° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ত্রাণীয় উচ্চচাপ বলয় দুটি অবস্থিত। বায়ু নিম্নগামী বলে এই অঞ্চলে অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা যায় না। প্রাচীনকালে যখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হতো তখন এ অঞ্চলে পৌছলে বায়ুপ্রবাহের অভাবে পালচালিত জাহাজের গতি মন্ত্র বা প্রায় নিচ্ছল হয়ে পড়ত। এ অবস্থায় নাবিকগণ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক সময় তাদের অশ্বগুলো সমুদ্রে ফেলে দিত। এজন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ত্রাণীয় শান্ত

কলায়কে অথু অক্ষাংশ (Horse latitude) বলে। উভয় পোলার্ডে 30° থেকে 60° উভয় অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলটিতে শীতকালেও গচ্ছিমা বায়ুর প্রভাবে বৃক্ষিকাত হয়।

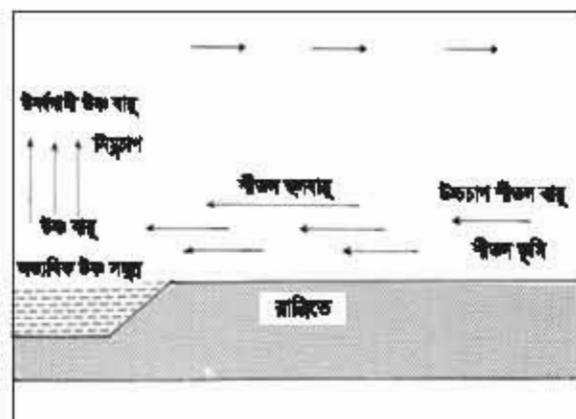
মেরু বায়ু (Polar Winds) : মেরু অক্ষাংশের উচ্চাংশ কলায় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উভয় পোলার্ডে নিম্নাংশ কলায়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উভয় পোলার্ডে উভয়-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ পোলার্ডে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহিতগতে উভয় সুমেরু বায়ু ও দক্ষিণ কুমেরু বায়ু বলে।

সমুদ্র ও হ্রদায় (Sea and Land Breeze) : পিনের ক্ষেত্রে হ্রদায় বেলি উভূত হয় বলে সেখানে নিম্নাংশের সূর্য হয়; কিন্তু অক্ষাংশ বেশি উভূত হয় না বলে সেখানকার বায়ু উচ্চাংশসূর্য হয়। ফলে তখন অক্ষাংশ থেকে হ্রদায়ের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রবায়ু বলে (চিত্র ৫.৮)।

আবাস জাতিকালে অক্ষাংশের চেয়ে হ্রদায় বেশি শীতল বলে হ্রদায়ের বায়ু উচ্চাংশসূর্য হয়। তখন হ্রদায় থেকে হ্রদায় বা সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে হ্রদবায়ু বলে (চিত্র ৫.৯)। বালাদেশের দক্ষিণে বজোগনাপর অবস্থানের কারণে সমুদ্রবায়ু ও হ্রদবায়ু নিরামিত প্রবাহিত হয়।



চিত্র ৫.৮ : সমুদ্রবায়ু



চিত্র ৫.৯ : হ্রদবায়ু

মৌসুমি বায়ু (Monsoon Wind) : আন্নবি ভাষায় ‘মণসুম’ শব্দের অর্থ থাহু। থাহু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বে বায়ুপ্রবাহনের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। সূর্যের উত্তুরাখণ ও দক্ষিণায়নের ফলে শীত-শীমে ঝুঁতুতেসে হ্রদায় ও অক্ষাংশের ভাগের তারতম্য ঘটে। সেজন্য মৌসুমি বায়ুর সূর্য হয়। উভয় পোলার্ডে শীতকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর নৃত্যাবে ক্রিয় দেয়। এর ফলে কর্কটক্রান্তি অক্ষাংশের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উভয়-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া অঞ্চলে হ্রদায়ের হ্রদায় অক্ষাংশের উভূত হয়। ফলে এ সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং একটি সুবৃহৎ নিম্নাংশ কেন্দ্রের সূর্য হয়। এ পরিবর্তিতে দক্ষিণ পোলার্ডের জীবীয় উচ্চাংশ কলায় থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অঘন বায়ু নিরক্রেত্বে অভিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের নিম্নাংশ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হুচে বায়। এ বায়ুকে উভয় পোলার্ডে শীমের মৌসুমি বায়ু বলে। নিরক্রেত্বে অভিক্রম করলে কেন্দ্রের সূর্য অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব অঘন বায়ুর গতি বৈকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উভয়-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য শীমের এ বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে। শীমের মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাণ্ডি থাকে। এটি আরব সাগরীয় ও ১৫

বঙ্গোপসাগরীয় এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। আরব সাগরীয় শাখা পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারতে এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বাহ্লাদেশ, মিয়ানমার এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এছাড়া মধ্য-এশিয়ায় নিম্নচাপের দরুন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়ে কথোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীন ও জাপানে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের স্ক্লিভাগ অত্যন্ত শীতল হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে স্ক্লিভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে। স্ক্লিভাগের উপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসে বলে এটা শুক। মৌসুমি বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ঝুঁতুর সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে ঝুঁতু আশ্রয়ী বায়ু। এর মধ্যে রয়েছে মৌসুমি বায়ু। আরও রয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় বায়ু।

স্থানীয় বায়ু (Local Wind) : স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কিংবা তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে স্থানীয় বায়ুর উৎপত্তি হয়। রকি পর্বতের চিনুক (Chinook), ফ্রাপ্সের কেন্দ্রীয় মালভূমি থেকে প্রবাহিত মিস্ট্রাল (Mistral), আজেন্টিনা ও উরুগুয়ের পম্পাস অঞ্চলের উত্তরে পাম্পেরু (Pampero), আড়িয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে বোরা (Bora), উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইতালিতে সিরকো (Sirocco), আরব মালভূমির সাইমুম (Simoom), মিসরের খামসিন (Khamsin) ও ভারতীয় উপমহাদেশের লু (Loo) কয়েকটি স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

কাজ : নিম্নের বায়ুসমূহ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়? তা নিয়ত বায়ুপ্রবাহ পাঠ করে উল্লেখ কর।		
অয়ল বায়ু	পশ্চিমা বায়ু	মেরু বায়ু

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন (Global warming and climate change)

বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব উষ্ণায়ন হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জলবায়ু কখনো এক থাকেনি। কখনো খুব উষ্ণ ও শুক থেকেছে। কখনো শীতল হয়ে বরফে ঢেকেছে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অনেক ধীর গতিতে। লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এবং বলা হয়ে থাকে এই পরিবর্তন হয়েছে কিছু প্রাকৃতিক কারণে (যেমন- পৃথিবীর কক্ষপথ বা পৃথিবীর আবর্তনের পরিবর্তন)। তবে সমকালীন পরিবর্তন নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত কারণ এ পরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত এবং এই পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ক্রিয়া-কর্ম। একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় প্রায় 0.6° সেলসিয়াস

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীগণ কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে অধিবাচনী করেছেন যে, ২১ শতকের সমাজিকাদের ঘরে পড় তাপমাত্রা থাই আরও অভিক্রিক্ষ ২.৫° থেকে ৫.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ঘূর্ণ হতে পারে। এর ফলে পর্যবেক্ষণ উপরিভাসের জমাকৃত বরফ এবং মেরু অঞ্চলের হিমবাহের মুক গলনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তাপমাত্রা পরিবর্তনের খালারে বড় ভূমিকা পালন করছে। একেব্যে বায়ুমণ্ডল হলো বিনহাউসের বা কাচ ঘরের কাচের সেকাশ বা ছান্দের মতো। সুর্বীর আঙ্গো পৃথিবীর সমস্ত তাপ ও পরিবর্তন মূল উৎস। পৃথিবীতে আসা সূর্যালোক ছুপ্ট পোষণ করে ও বায়ুমণ্ডল উৎসুক করে। মানুষের বিভিন্ন ক্ষিমাকলাপ বেশন— কাঠ করলা পেঁচালো, শাহ কাটা, কলকারখানার খোজা ইত্যাদি করলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ভাইজেনাইট, মিথেন ইক্যানিস পরিমাপ বৃক্ষ পার। এ প্রাস্তুলোকে কলা হয় বিনহাউস পাস। বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হলে কলা পুরু একটি (বিনহাউস) গ্যাসের ভর বা চান্দা। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে হেঢ়ে দেওয়া কাশ পুনরাবৃত্ত কেন্দ্র থাই না। কাশ শোষণের পরিমাপ বৃদ্ধি পার এবং কলা উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকছে। উক্ত বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই



চিত্র ৫.১০ : বিনহাউস

হলো বিনহাউস প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া। মেরু অঞ্চলে কর্তৃর ঘরে সৌন্দর্য আঁচকিরে সবজি চাব করাকে বিনহাউস বলে (চিত্র ৫.১০)।

বিশ্ব উকাইলের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় শান্তবের নেতৃত্বাচক কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে পিশেবভাবে নির্মিত বিনহাউস গ্যাসসমূহের উপরিভূতির মাঝের উভয়ভোজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে আমরা বিনহাউস প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করি। বিশ্ব উকাইলের অন্য দাঙ্গী গ্যাসসূলো হলো কার্বন ভাইজেনাইট, মাইট্রোস অজাইট, মিথেন ও ক্লোরোফ্রোরো কার্বন। শিলাইন, যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উচাঞ্চ ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে উল্লেখিত গ্যাসের পরিমাপ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিশ্ব উকাইলের ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মতো বালাদেশে অধিক বৃক্ষিক, বাণিজ বস্তা, ভূজলকার বৃদ্ধিকান্ত, খোজ প্রতি অলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল পৃথিবী ও তার পরিবেশকে এবং সেই সঙ্গে বালাদেশের মতো দেশসমূহকে এর বিশ্ব উকাইলের বিপর্য থেকে রক্ষা করতে পারে।

কাজ : বিদ্যালয়ে অর্থাৎ বাড়িতে ইটাইলেট স্টার্টিউজিং করে বিশ্বের অলবায়ুতে বিনহাউসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সাম্প্রতিক উচ্চসমূহ উপরিপুন কর।

অলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বিশ্ব প্রেক্ষিত (Effect of climate change in the world)

বিশ্বের আবহাওয়া ও ভাই ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। কোনো বিচ্ছুল্যেই আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে আতাবিক

আচরণ পাইছি না। বৃক্ষের সময়ে অনাবৃক্ষি, ধৰার সময়ে বৃক্ষি, গরমের সময়ে উভরে হাওয়া, শীতের সময়ে তঙ্গ হাওয়া কেমন বেন এলোমেলো আবহাওয়া লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুবায়ী ছিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যথা— কানাড়া, রাশিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোর জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। এ কারণে ঐসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একর জমি বরফমুক্ত হয়ে চাষাবাদ ও বসবাসবোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দুর্ভোগ বাড়বে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার দারিদ্র্য অধিবাসীদের। কারণ ছিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সম্মত উপকূলবর্তী পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শহর হবে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত (চিত্র ৫.১১)।



চিত্র ৫.১১ : ছিনহাউস প্রভাব

পৃথিবী উঞ্চায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীর সন্নাসির ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুলে উঠলে আবহাওয়ার প্রকৃতিই বদলে যাবে। সময়ে অসময়ে জলোচ্ছাসের শিকার হয়ে ফসল ঢুবে যাবে, দূষিত হবে সুপেয় পানি, লোনা পানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়বে, বনাঞ্চল ধ্বনি হবে, বন্য জীবজন্মের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং একই দেশের মানুষ অন্য অঞ্চলে হবে জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মত উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের মানুষ হবে প্রথম শিকার।

ছিনহাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিরতায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, আর উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোর মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিবেশ শরণার্থী হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দাভাব পরিস্কিত হচ্ছে এবং অনেক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি দারিদ্র্যসীমার

নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জলবায়ুর ধরন সাম্প্রতিক সময়ে সম্পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, শীতকালও পূর্বের তুলনায় বর্ষাসিক্ত হয়ে উঠেছে।

কাজ : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কৌ দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি তালিকা প্রত্যেকে তৈরি কর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Impact of climate change in Bangladesh)

মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসগুলো নির্গমনের কারণে বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছে তাতে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। আর এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে। অন্যান্য দেশ এ ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে এর মাত্রা আরও বাঢ়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাঢ়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর তথ্য অনুসারে ২০৩০ সালের পর নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, বাঢ়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাঢ়বে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। জলবায়ুর অন্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটির বেশি মানুষ সরাসরি পানি ও খাদ্য ঝুঁকিতে পড়বে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বে চাষাবাদ ২০ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনসিটিউট অব টেকনোলজি (MIT) অর্থনীতিবিদদের নতুন গবেষণা অনুসারে বিশ্ব উষ্ণায়ন ধৰ্মী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেবে।

২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপ্ত বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো—
মরুকরণ, বন্যা, বাঢ়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর অনিশ্চয়তা। এগুলোর প্রতিটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকার ৫টি ভাগের একটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণসহ ৩টিতে নাম আছে বাংলাদেশের। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ (সারণি ২)।

সারণি ২ : বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকা

মুন্দুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত
মালাউয়ি	*বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপদেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	*বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিহ্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিহ্বাবুয়ে
ভারত	কঞ্চোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিসিয়া	মালি
মোজাহিদিক	মোজাহিদিক	মলডোভা	ইণ্ডোনেশিয়া	জাহিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেঞ্জিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ	ভিয়েতনাম	চীন	*বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্দুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	বুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান

উৎস : বিশ্বব্যাংক, ২০০৯

১৯৯২ সালে UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) নামে জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন প্রতিবছর বিশ্বনেতাদের নিয়ে বিশ্ব জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা নিরসনে কাজ করা এর মূল লক্ষ্য। এই সম্মেলনকে সংক্ষেপে বলা হয় ‘কপ’ (COP- Conference of the Parties).

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ২০০৯ সালে জাতিসংঘের বিশ্বজলবায়ু সম্মেলনে তিন পৃষ্ঠার অঙ্গীকারনামাকে একটি নোট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অঙ্গীকারনামায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ২০১০-২০১২ সালের জন্য তিন হাজার কোটি ডলারের একটি তহবিলের কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু তহবিলের অর্থ বনায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যয় করা হবে। ফলে এই তহবিলের অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ যেমন- চীন, ভারত ও ব্রাজিল পাবে। জাতিসংঘ একে রাজনৈতিক সমরোতা হিসেবে উল্লেখ করেছে।

কাজ : সারণি ২-তে বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকায়
এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কতটুকু হুমকিতে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ কর
(দলগতভাবে)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আরগন গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে থাকে?

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (ক) স্ট্রাটোমণ্ডল | (খ) ট্রিপোমণ্ডল |
| (গ) এক্সোমণ্ডল | (ঘ) তাপমণ্ডল |

২। স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি—

- i. আর্দ্র বায়ুযুক্ত
- ii. বিমান চলাচলের উপযোগী
- iii. অভিবেগনি রশ্মি শোষণে সক্ষম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনন্য তার বাবার সঙ্গে সিলেট বেড়াতে যায়। সেখান থেকে তারা জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখতে গেল। দূর থেকে দেখল পাহাড়ের একটি ঢালে বৃক্ষ হচ্ছে কিন্তু বিপরীত ঢালে বৃক্ষ হচ্ছে না।

৩। অনন্য কোন ধরনের বৃক্ষিপাত দেখেছিল?

- | | |
|------------|----------------------|
| (ক) পরিচলন | (খ) শৈলোৎক্ষেপ |
| (গ) ঘূর্ণি | (ঘ) বায়ুপ্রাচীরজনিত |

৪। পাহাড়ের অপর ঢালে বৃক্ষ না হওয়ার কারণ—

- i. বায়ুতে জলীয়বাস্পের অভাব
- ii. বায়ু উষ্ণ ও শুক হওয়া
- iii. বায়ুতে জলীয়বাস্প বৃদ্ধি হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৫। বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় কেন?

- | | |
|--|---|
| (ক) বায়ুর গতিপথে পর্বতের অবস্থানের জন্য | (খ) তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য |
| (গ) চাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য | (ঘ) নিরক্ষীয় নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়ের জন্য |

৬। বাহ্যাদেশে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয় কেন?

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (ক) স্থলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় | (খ) উত্তরে হিমালয় পর্বত থাকায় |
| (গ) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করায় | (ঘ) নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় |

৭। মৌসুমি বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো-

- i. এটি একটি আঘংলিক বায়ু
- ii. খুতু আশ্রয়ী বায়ু
- iii. শীত ও গ্রীষ্ম খুতুভেদে এ বায়ুর দিক পরিবর্তন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

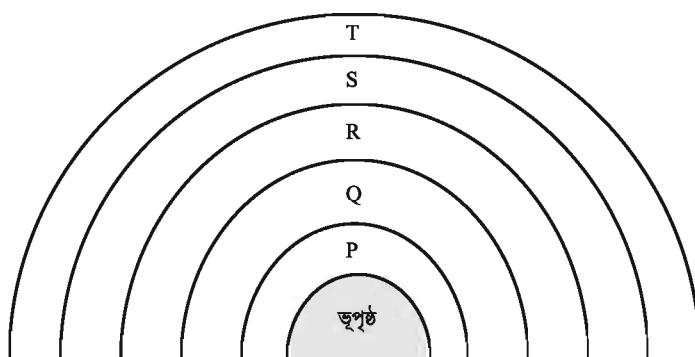
- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৮। নিম্নের কোন ক্যাটাগরিতে বাহ্যাদেশ বৈশ্বিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (ক) কৃষিক্ষেত্রে নিষ্যতা | (খ) ভূমিকম্প |
| (গ) তাপমাত্রা বৃদ্ধি | (ঘ) মরুকরণ |

সূজনশীল প্রশ্ন

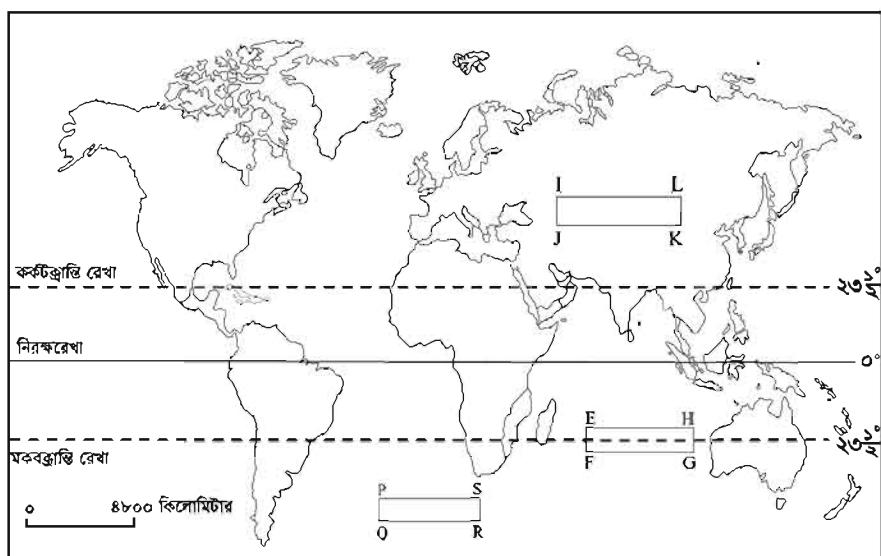
১।



- ক. বায়ুমণ্ডল কী?
- খ. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশি পরিমাণে থাকার সুবিধা কী বর্ণনা কর।
- গ. ‘Q’ স্তরটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘R’ এবং ‘S’ স্তরের মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ফর্মা নং-১২, ভূগোল ও পরিবেশ-৯ম-১০ শ্রেণি

২।



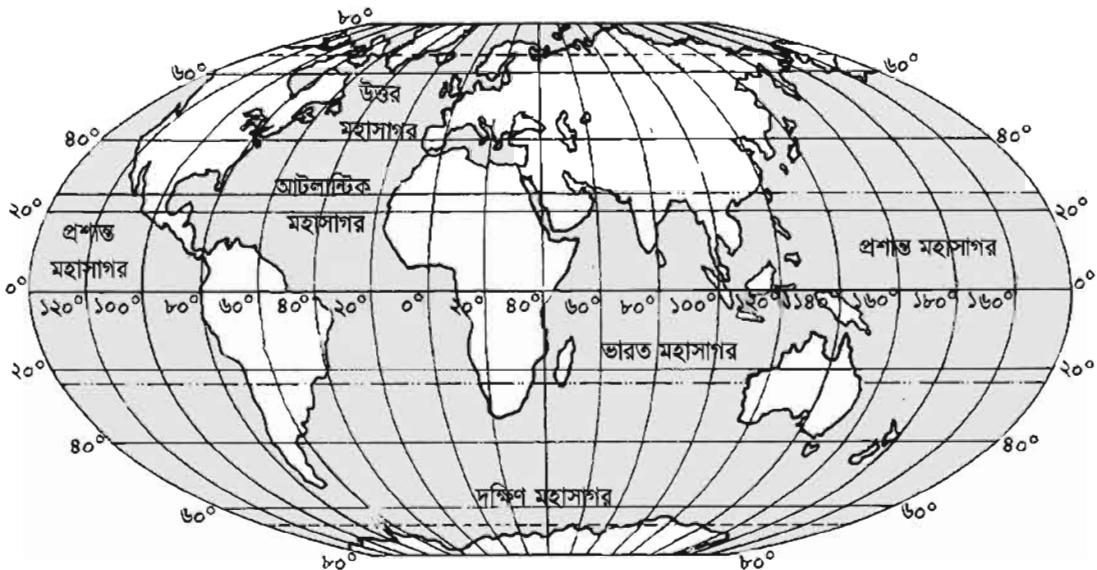
- ক. আমসিন কী?
- খ. ফেরেলের সূত্রটি লেখ।
- গ. মানচিত্রে 'ERGH' ঘনে বিরাজমান বায়ুপ্রবাহ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'IJKL' এবং 'PQRS' ঘনের বায়ুর বেগ কি একইরকম? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারিমণ্ডল

Hydrosphere

বারিমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাঢ়ছে এবং সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এর জন্য বারিমণ্ডলের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ বারিমণ্ডলের তলদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠন রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বারিমণ্ডলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর বর্ণনা করতে পারব।
- সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদ বর্ণনা করতে পারব।
- সমুদ্রস্ন্তোত্রের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জোয়ার-ভাটার কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

বারিমণ্ডলের ধারণা (Concept of Hydrosphere)

‘Hydrosphere’-এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। ‘Hydro’ শব্দের অর্থ পানি এবং ‘Sphere’ শব্দের অর্থ মণ্ডল। আমরা জানি পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে পানি। এ বিশাল জলরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে যেমন— কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাস্ত্ব) এবং তরল। বায়ুমণ্ডলে পানি রয়েছে জলীয়বাস্ত্ব হিসেবে, ভূপৃষ্ঠে রয়েছে তরল ও কঠিন অবস্থায় এবং ভূপৃষ্ঠের তলদেশে রয়েছে ভূগর্ভস্থ তরল পানি। সুতরাং বারিমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ (সারণি ১)। পৃথিবীর সকল জলরাশির শতকরা ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে (মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর)। মাত্র ৩ ভাগ পানি রয়েছে নদী, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ, হ্রদ, মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল ও জীবমণ্ডল। পৃথিবীর সমস্ত পানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন— লবণ্যাত্মক ও মিঠা পানি। পৃথিবীর সকল মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরের জলরাশি লবণ্যাত্মক এবং নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির উৎস।

সারণি ১ : জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ ও শতকরা হার

জলবিভাগের নাম	পরিমাণ (ঘনকিলোমিটার ^৩ × ১,০০,০০০)	শতকরা হার (%)
সমুদ্র	১৩৭০	৯৭.২৫
হিমবাহ	২৯	২.০৫
ভূগর্ভস্থ পানি	৯.৫	০.৬৮
হ্রদ	০.১২৫	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০৬৫	০.০০৫
বায়ুমণ্ডল	০.০১৩	০.০০১
নদী	০.০০১৭	০.০০০১
জীবমণ্ডল	০.০০০৬	০.০০০০৮

মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর

বারিমণ্ডলের উন্নত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণ্যাত্মক জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে, এগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর (চিত্র ৬.১)। এর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তম ও গভীরতম (সারণি ২)। আটলান্টিক মহাসাগর ভগ্ন উপকূলবিশিষ্ট এবং এটি অনেক আবন্ধ সাগরের (Enclosed sea) সৃষ্টি করেছে। ভারত

মহাসাগর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। 60° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে এন্টার্কটিকার হিমভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ মহাসাগরের অবস্থান। দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ বছরের সকল সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উত্তর গোলার্ধের উত্তর প্রান্তে উত্তর মহাসাগর অবস্থিত এবং এর চারদিক ঘৃণ্ডিত।



চিত্র ৬.১ : পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

সারণি ৩ : মহাসাগরের আয়তন ও গড় গভীরতা

মহাসাগর	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)	অবস্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০	আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী
আটলান্টিক মহাসাগর	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২	আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২	আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া
উত্তর মহাসাগর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪	পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ
দক্ষিণ মহাসাগর	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯	এন্টার্কটিকা ও 60° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী

মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর (Sea) বলে। যথা— ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, জাপান সাগর ইত্যাদি। তিনিদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে জল তাকে উপসাগর (Bay) বলে। যথা— বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ (Lake) বলে। যথা— রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত সুপিরিয়র হ্রদ ও আফ্রিকার ভিঞ্চোরিয়া হ্রদ ইত্যাদি।

কাজ : পৃথিবীর মানচিত্রে মহাসাগরের অবস্থান মানচিত্র নির্দেশক কাঠি দিয়ে ক্লাসের অন্যান্য সতীর্থদের দেখাও।

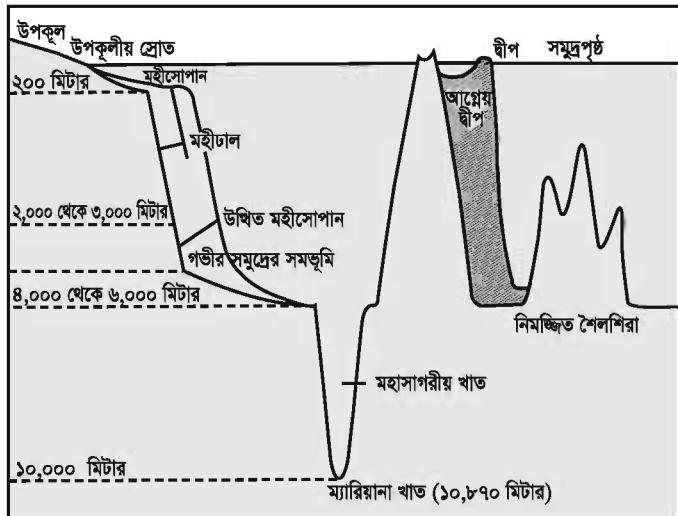
সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদ (Topography of Ocean Floor and Marine Resources)

ভূপৃষ্ঠের উপরের ভূমিরূপ যেমন উচ্চনিচু তেমনি সমুদ্র তলদেশও অসমান। কারণ সমুদ্রতলে আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা, উচ্চভূমি ও গভীর খাত প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। এ শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে পানির মধ্য দিয়ে প্রায় ১,৪৭৫ মিটার নিচে যায় এবং আবার ফিরে আসে। ফ্যাদোমিটার (Fathometer) যন্ত্রটি দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (চিত্র ৬.২)। যথা—

- (১) মহীসোপান (Continental shelf)
- (২) মহীচাল (Continental slope)
- (৩) গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deep sea plains)
- (৪) নিমজ্জিত শৈলশিরা (Oceanic ridges)
- (৫) গভীর সমুদ্রখাত (Oceanic trench)

(১) **মহীসোপান :** পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপে সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার। এটি 1° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে।

মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা ৭০ কিলোমিটার। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। মহীসোপানের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূলভাগের বন্ধুরতার উপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। উপকূল যদি বিস্তৃত সমভূমি হয়, তবে মহীসোপান অধিক প্রশস্ত হয়। মহাদেশের উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়। ইউরোপের উভয়ে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকায় উভয়ের মহাসাগরের মহীসোপান খুবই প্রশস্ত (প্রায় ১,২৮৭ কিলোমিটার)।



চিত্র ৬.২ : সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ

তবে ইউরোপের উভয়-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত। মহীসোপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ উভয়ের আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর পশ্চিমে উপকূল বরাবর উভয়-দক্ষিণ ভঙ্গিল রাখি পর্বত অবস্থান করায় সেখানে মহীসোপান খুবই সংকীর্ণ। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান মালভূমি বলে এর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মহীসোপান খুবই সরু।

স্থলভাগের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য হওয়ার কারণে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়। এছাড়া সমুদ্রতটে সমুদ্রতরঙ্গাও ক্ষয়ক্রিয়ার দ্বারা মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে থাকে।

(২) মহীচাল : মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূতাগ হঠাত খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায়। এ ঢালু অংশকে মহীচাল বলে। সমুদ্রে এর গভীরতা ২০০ থেকে ৩,০০০ মিটার। সমুদ্র তলদেশের এ অংশ অধিক খাড়া হওয়ার জন্য প্রশস্ত কর হয়। এটি গড়ে প্রায় ১৬ থেকে ৩২ কিলোমিটার প্রশস্ত। মহীচালের উপরিভাগ সমান নয়। অসংখ্য আন্তঃসাগরীয় গিরিখাত অবস্থান করায় তা খুবই বন্ধুর প্রকৃতির। এর ঢাল মৃদু হলে জীবজন্মের দেহবশেষ, পলি প্রভৃতির অবক্ষেপণ দেখা যায়।

(৩) গভীর সমুদ্রের সমভূমি : মহীচাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার। এ অঞ্চলটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর। কারণ গভীর সমুদ্রের সমভূমির উপর জলমগ্ন বহু শৈলশিরা ও উচ্চভূমি অবস্থান করে।

আবার কোথাও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়গিরি। এ সমস্ত উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার জলরাশির উপর দীপরূপে অবস্থান করে। সমুদ্রের এ গভীর অংশে পলিমাটি, সিন্ধুমল, আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত লাভা ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এ সকল সঞ্চিত পদার্থ স্তরে স্তরে জমা হয়ে পালিক শিলার সৃষ্টি করে।

(৪) নিমজ্জিত শৈলশিরা : সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। ঐসব আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। এগুলোই নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত। নিমজ্জিত শৈলশিরাগুলোর মধ্যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

(৫) গভীর সমুদ্রখাত : গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এ সকল খাতকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রখাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ প্লেট সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাত সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো অধিক প্রশংসন না হলেও খাড়া ঢালবিশিষ্ট। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৪০০ মিটারের অধিক।

প্রশান্ত মহাসাগরেই গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক। এর অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ সকল গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত (Mariana trench) সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার এবং এটাই পৃথিবীর গভীরতম খাত। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত (৮,৫৩৮ মিটার), ভারত মহাসাগরের শুভা খাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজ : দলগতভাবে নিচের ছকে বৈশিষ্টগুলো লেখ।

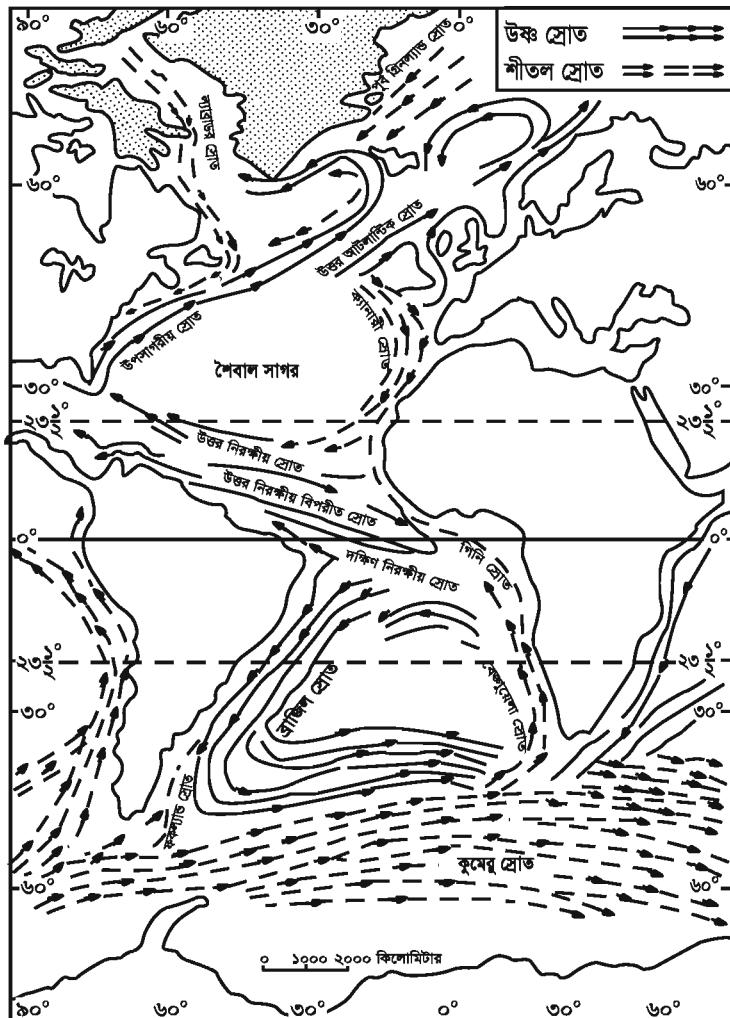
মহীসোপান	মহীচাল	গভীর সমুদ্রের সমভূমি	নিমজ্জিত শৈলশিরা	গভীর সমুদ্রখাত
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ। বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের পানির সঙ্গে ঘর্ষণ (Friction) তৈরি করে এবং ঘর্ষণের জন্য পানিতে ঘূর্ণন (Gyre/spiral pattern) তৈরি করে। সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে চলাচল করে, একে সমুদ্রস্রোত বলে।

সমুদ্রস্রোতকে উক্তার তারতম্য অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) উক্ত স্রোত ও (খ) শীতল স্রোত (চিত্র ৬.৩)।

(ক) উক্ত স্রোত : নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় জলরাশি হালকা হয় ও হালকা জলরাশি সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে উক্ত স্রোত (Warm currents) বলে।



চিত্র ৬.৩ : আটলান্টিক মহাসাগরের উক্ত ও শীতল স্রোত

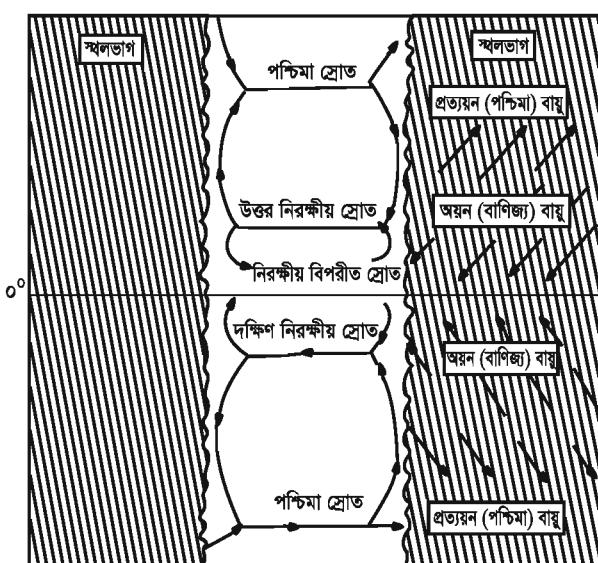
(খ) শীতল স্রোত : মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় উক্তমডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে শীতল স্রোত (Cold currents) বলে।

সমুদ্রস্রোতের কারণ (Causes of ocean currents)

১। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ : নিয়ত বায়ুপ্রবাহই সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ। এসব বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে। অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী প্রধান সমুদ্রস্রোতগুলোর সৃষ্টি হয় (চিত্র ৬.৪)।

২। পৃথিবীর আক্রিক গতি : পৃথিবীর আক্রিক গতির ফলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ুপ্রবাহের মতো সমুদ্রজল ও উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

৩। সমুদ্রজলের তাপমাত্রার পার্থক্য : নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের জল বেশি উষ্ণ বলে তা জলের উপরের অংশ দিয়ে পৃষ্ঠপৰ্বত বা বহিঃস্তোত্রপে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে মেরু অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপৰ্বত বা অন্তঃস্তোত্রপে নিরক্ষীয় উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইভাবে উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্তোত্রের সূচিটি হয়।



চিত্র ৬.৪ : সমুদ্রস্তোত্রের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

৪। মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের গলন : মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফ কিছু পরিমাণ গলে গেলে জলরাশি স্ফীত হয় ও সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে সমুদ্রস্তোত্রের সূচিটি হয়।

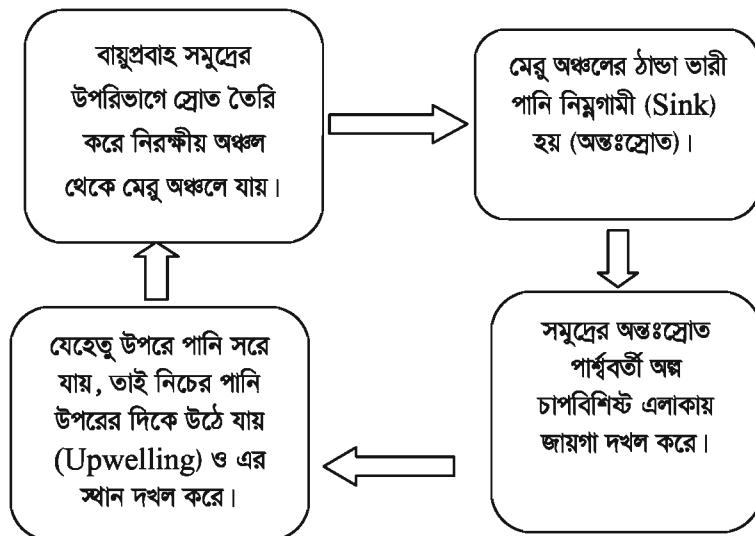
৫। সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য : সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য অনুসারে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। অগভীর সমুদ্রের জল দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উপরে ওঠে। তখন গভীরতার অংশের শীতল জল নিচে নেমে আসে। এজন্য উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী সমুদ্রস্তোত্রের সূচিটি হয়। সমুদ্রের পৃষ্ঠে গতি সবচেয়ে বেশি। সমুদ্রের ১০০ মিটার নিচ থেকে গতি কমতে থাকে।

৬। সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পার্থক্য : সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। অধিক লবণাক্ত জল বেশি ভারী বলে তার ঘনত্বও বেশি। বেশি ঘনত্বের জল কম ঘনত্বের দিকে নিম্ন প্রবাহরূপে প্রবাহিত হয় ও সমুদ্রস্তোত্রের সূচিটি করে।

৭। ভূখণ্ডের অবস্থান : সমুদ্রস্তোত্রের প্রবাহপথে কোনো মহাদেশ, দ্বীপ প্রভৃতি ভূখণ্ড অবস্থান করলে সমুদ্রস্তোত্র তাতে বাধা পেয়ে দিক ও গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় এর প্রভাবে সমুদ্রস্তোত্র একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়।

সমুদ্রস্তোত্রের প্রভাব (Influence of ocean currents)

নানাবিধি কারণে সমুদ্রস্তোত্রের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে এলাকার উপর দিয়ে সমুদ্রস্তোত্র প্রবাহিত হয় সেখানে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জলবায় এবং বাণিজ্যের উপর সমুদ্রস্তোত্রের প্রভাব অত্যধিক।



প্রবাহচিত্র : সমুদ্রের উপরের (Surface) এবং নিমজ্জিত (Deep) স্নোত একসঙ্গে সংঘালন স্নোত (Convection current) তৈরি করে, যার ফলাফলে সমুদ্রের জলরাশি একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়।

- ১। **উষ্ণ সমুদ্রস্নোতের প্রভাব :** উষ্ণ সমুদ্রস্নোতের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই শীতল অঞ্চলের উপর দিয়ে উষ্ণ স্নোত প্রবাহিত হলে শীতকালেও বরফ জমতে পারে না। বন্দরগুলো সারাবছর ব্যবহার করা যায়। যেমন— উষ্ণ উপসাগরীয় স্নোতের প্রভাবে নরওয়ে ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঁজের পশ্চিম উপকূল শীতকালে বরফমুক্ত থাকে, কিন্তু একই অক্ষাংশে অবস্থিত কানাডার পূর্ব উপকূলে বরফাচ্ছন্ন অবস্থা দেখা যায়।
- ২। **শীতল সমুদ্রস্নোতের প্রভাব :** শীতল সমুদ্রস্নোতের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের শীতলতা বৃদ্ধি পায়। যেমন— শীতল ল্যান্ডর স্নোতের প্রভাবে কানাডার পূর্ব উপকূলে ল্যান্ডর দ্বীপপুঁজের নিকটবর্তী অঞ্চল সারাবছর বরফাচ্ছন্ন থাকে। একই কারণে শীতল কামচাটকা স্নোতের প্রভাবে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে কামচাটকা উপদ্বিপের শীতলতা বৃদ্ধি পায়।
- ৩। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব :** সমুদ্রস্নোতের অনুকূলে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের সুবিধা হয়। তবে শীতল সমুদ্রস্নোত অপেক্ষা উষ্ণ সমুদ্রস্নোতে জাহাজ ও নৌচলাচলের সুবিধা বেশি। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রস্নোতের অনুকূলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক জাহাজ যাতায়াত করে। শীতল স্নোতের গতিপথে তীব্র শীত ও হিমশৈলের জন্য জাহাজ চলাচলের অসুবিধা দেখা যায়।
- ৪। **আবহাওয়ার উপর প্রভাব :** উষ্ণ সমুদ্রস্নোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে বায়ুপ্রবাহ প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাস্প সঞ্চাহ করে। এই উষ্ণ বায়ুর প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন— উষ্ণ উপসাগরীয় স্নোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু ব্রিটিশ দ্বীপপুঁজের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

অপরদিকে শীতল সমুদ্রস্তোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুক বলে বৃষ্টিপাত ঘটায় না। যেমন— কখনো শীতল মরুভূমির সৃষ্টি করে। দক্ষিণ আমেরিকার আতাকামা মরুভূমি শীতল পেরু স্ট্রোত-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫। কুয়াশা ও ঝড়বাঞ্ছা সৃষ্টি : উষ্ণ ও শীতল স্ট্রোতের মিলন অঞ্চলে অঞ্চল স্থানব্যাপী উৎপত্তার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এই অঞ্চলে ঘন কুয়াশা ও ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টির ফলে প্রবল ঝড়বাঞ্ছার সৃষ্টি হয়। জাহাজ ও বিমান চলাচলে অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন— উভর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে শীতল ল্যান্ড্রাইভ স্ট্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্ট্রোতের মিলনের ফলে এবং এশিয়ার উপকূলে শীতল কামচাটকা স্ট্রোত ও বেরিং স্ট্রোত এবং উষ্ণ জাপান স্ট্রোতের মিলনের ফলে এরূপ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

৬। সমুদ্রে অগভীর মগ্নচড়ার সৃষ্টি : উষ্ণ ও শীতল স্ট্রোতের মিলন স্থলে শীতল স্ট্রোতের সঙ্গে বাহিত বড় বড় হিমশৈল উষ্ণ স্ট্রোতের প্রভাবে গলে যায়। ফলে হিমশৈলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয় এবং একসময় মগ্নচড়ার সৃষ্টি করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক, সেবল ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ দ্বীপপুঁজের উপকূলে ডগার্স ব্যাঙ্ক এগুলো মগ্নচড়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৭। মৎস্য ব্যবসার সুবিধা : অগভীর মগ্নচড়াগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাটন (একপ্রকার অতি স্কুন্দ্র উজ্জিদ ও প্রাণী) জন্মায় ও বৎশবৃদ্ধি করে। এই প্ল্যাটন মাছের অতি প্রিয় খাদ্য। এই মগ্নচড়াগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাছ আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূল ও জাপান উপকূলে পৃথিবীর অধিকাংশ মাছ ধরা হয়।

৮। হিমশৈলের আঘাতে বিপদ : শীতল সমুদ্রস্তোতের সঙ্গে যেসব হিমশৈল (Iceberg) ভেসে আসে সেগুলোর কারণে জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে। যেমন— যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ ১৯১২ সালে প্রথম যাত্রাতেই হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল।

জোয়ার-ভাটার কারণ (Causes of High and Low Tide)

প্রধানত দুটি কারণে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো— (১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং (২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি।

(১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব : মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রতিটি জ্যোতিক পরম্পরকে আকর্ষণ করে। তাই এর প্রভাবে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চাঁদের আকর্ষণ বল বেশি হয়। কারণ সূর্যের ভর অপেক্ষা চাঁদের ভর অনেক কম হলেও চাঁদ সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর অনেক

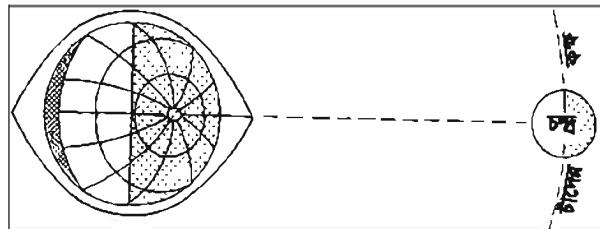
জোয়ার ও ভাটা (High Tide and Low Tide) :

সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদীর জলরাশি প্রতিদিনই কোনো একটি সময়ে ঐ জলরাশি ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার তা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। জলরাশির এরকম নিয়মিত স্ফীতি এবং ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

মহাকর্ষ (Gravitational) : এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।

নিকটে অবস্থিত। তাই সমুদ্রের জল তরল বলে টাঁদের আকর্ষণেই প্রধানত সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে ও জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার তত জোরালো হয় না। টাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে টাঁদ ও সূর্য উভয়ের আকর্ষণে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়।

(২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন ক্ষেত্রাতিগ
শক্তি : পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে অনবরত
আবর্তন করে বলে ক্ষেত্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ
শক্তির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রাতিগ শক্তির প্রভাবে
পৃথিবীর প্রতিটি অণুই মহাকর্ষ শক্তির বিপরীত
দিকে বিকর্ষিত হয় বা ছিটকে যায়। তাই পৃথিবীর
ক্ষেত্রাতিগ শক্তির প্রভাবে মেখানে মহাশক্তির প্রভাবে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের
জল বিক্ষিক্ত হয়েও জোয়ারের সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৫)।



চিত্র ৬.৫ : পৃথিবীর ক্ষেত্রাতিগ ও মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব
ক্ষেত্রাতিগ শক্তির প্রভাবে মেখানে মহাশক্তির প্রভাবে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের
জল বিক্ষিক্ত হয়েও জোয়ারের সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৫)।

জোয়ার-ভাটার প্রভাব (Effects of Tides)

মানব-জীবনের উপর জোয়ার-ভাটার যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিশ্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহে জোয়ার-
ভাটার নিম্নের প্রভাবসমূহ লক্ষ করা যায়।

- ১। জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।
- ২। দৈনিক দূবার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে ভাটার টানে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।
- ৩। জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্টি হোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়।
- ৪। বহু নদীতে ভাটার স্তোত্রের বিপরীতে বৌধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity) উৎপাদন করা হয়।
- ৫। জোয়ারের পানি নদীর মাধ্যমে সেচে সহায়তা করে এবং অনেক সময় খাল খনন করে জোয়ারের পানি
আটকিয়ে সেচকার্য ব্যবহার করা হয়।
- ৬। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের শবগান্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে নদীর
পানি সহজে জমে না।
- ৭। জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর
মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয় বলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ
করা সুবিধা হয়। আবার জোয়ারের টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে। বাণিদেশের
দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দর পতেঙ্গা ও মহলা এবং অন্যান্য উপকূলবর্তী নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার
ভূমিকা রয়েছে।

৮। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে অধিক মাত্রায় জোয়ারের সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়। এই অধিক জোয়ারে নদীর সংকীর্ণ মোহনায় শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হলে একে জোয়ারের বান বলে।

বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resources of the Bay of Bengal)

বাংলাদেশের প্রায় ৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরে রয়েছে অনেক সামুদ্রিক সম্পদ। এর সমূদ্র তলদেশে ৪৪২ প্রজাতির মৎস্য, ৩৩৬ প্রজাতির মলাক্ষস (Mollusks), ১৯ প্রজাতির চিখড়ি, নানারকম কাঁকড়া, ম্যানগ্রোভ বনসহ আরও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ। কঙ্কবাজারের উপকূলীয় এলাকায় পারমাণবিক খনিজ জিয়েকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিওটাইল ও লিউকলেন পাওয়া গেছে। এছাড়া সমূদ্র তলদেশে রয়েছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিমশৈল কী?

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (ক) এন্টার্কটিকায় জমাট বাঁধা বরফ | (খ) ছিনল্যান্ডে জমাট বাঁধা বরফ |
| (গ) সমুদ্রশ্বেতে ভেসে আসা বিশাল বরফখণ্ড | (ঘ) হিমালয়ের চুড়ায় জমাট বাঁধা বরফ |

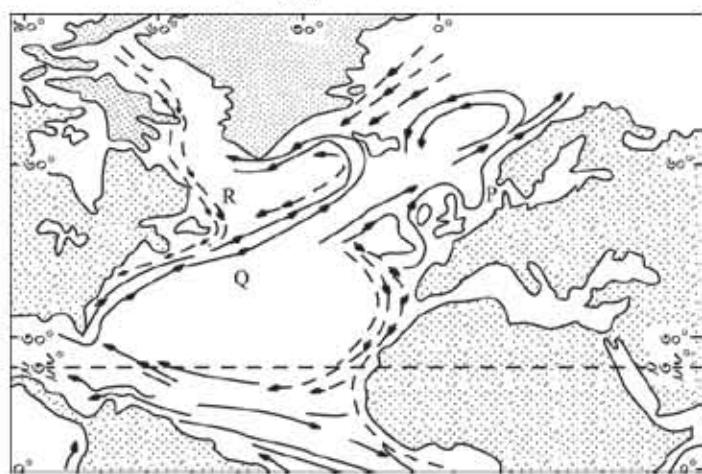
২। সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে সম্পর্কিত হলো-

- i. তপমাত্রা
- ii. সমুদ্রশ্বেত
- iii. লবণাক্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর অন্তরের উত্তর দাও :



৩। 'P' তিথিক স্থানে সামান্য জাহাজ চলাচল করতে পারে কেন ?

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| (ক) সমুদ্রের পাতীরভাব জন্য | (খ) অগ্ন উপকূলের জন্য |
| (গ) উক ব্রাতের জন্য | (ঘ) জাহাজের শক্তির জন্য |

৪। 'Q' ও 'R' স্থানের মিলেনে যথে সৃষ্টি হয়-

- মন্ডাডা
- হিমপ্রাচীর
- হিমশৈল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i & ii | (খ) i & iii |
| (গ) ii & iii | (ঘ) i, ii & iii |

সূর্যনগ্নীল অন্তর

৫।



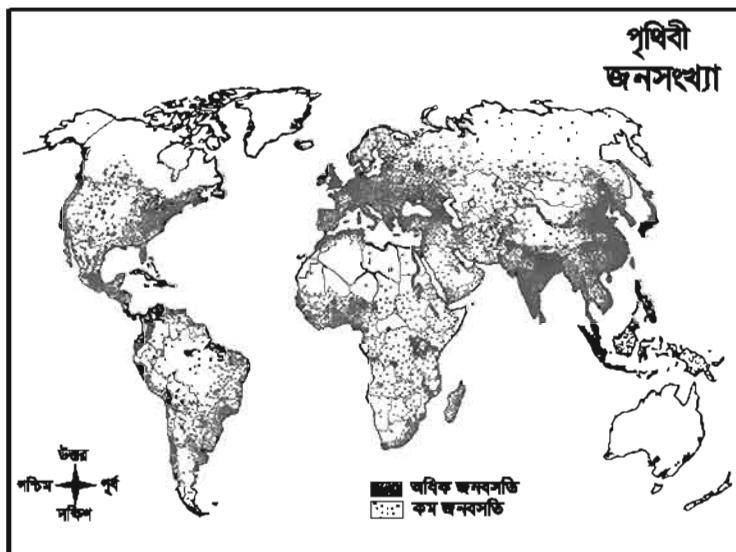
- ক. পৃথিবীর গভীরতম খাতের নাম কী?
- খ. মহীসোপানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
- গ. ‘A’ চিহ্নিত স্থানের পানির প্রবাহ স্থলভাগের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘P’ ও ‘B’ চিহ্নিত স্থানের পানিরাশির আবর্তন না হলে ঐ এলাকার বাণিজ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব— বিশ্লেষণ কর।
- ২। তুইন তার বাবার সঙ্গে কল্পবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যায়। সকাল বেলায় দেখতে পায় সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে উপরে উঠে এসেছে কিন্তু সন্ধ্যার সময় আবার নেমে গেছে।
- ক. সমুদ্রস্তোত্রের প্রধান কারণ কী?
- খ. জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পানির এরূপ আচরণের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুইনের দেখা সমুদ্রের পানির ঐরূপ আচরণ উপকূলীয় অঞ্চলে কিরূপ প্রভাব ফেলে বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

জনসংখ্যা

Population

বর্তমান পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, সক্রামক রোগ প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিকার, পুষ্টি কর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ফলে নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। মানুষের আয়ুকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার বৃদ্ধি কিছুটা কমলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ হার কমেনি। এর ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসংখ্যার গুরুত্ব রয়েছে। পরিমিত শ্রমশক্তি ব্যতীত উন্নয়ন সম্বন্ধে নয় আবার জনাধিক্যতা অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উপাদানগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানকে জনবহুল বা জনবিরল করে তোলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অভিবাসনের কারণ, সুকল ও কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অভিবাসনের সূকল-কুফল সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকেও সচেতন করব।
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বর্ণনের প্রভাবকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সৃষ্টি সমস্যা এবং সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

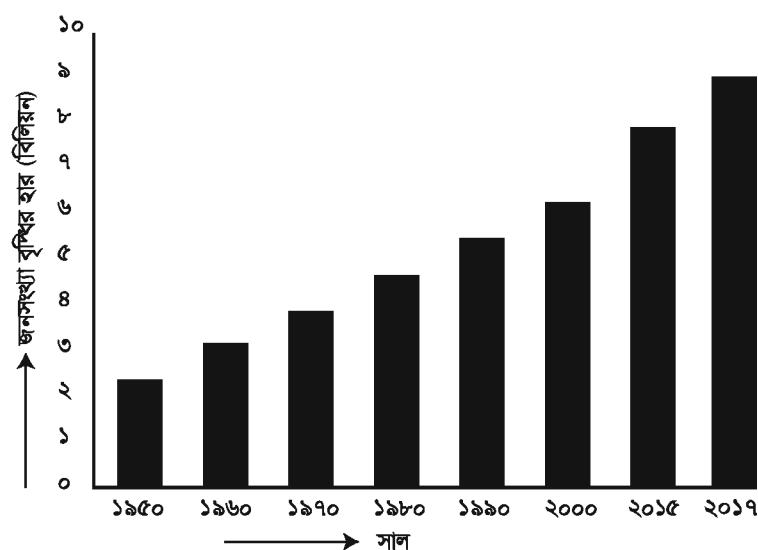
বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা (Present Situation of World Population and its Changing Pattern)

আমরা জানি এ পৃথিবী হাজার হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে। খ্রিস্টীয় সালের থারেষ্ট থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পৃথিবীর জনসংখ্যা খুব ধীরে এবং পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবে দুট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই যে, সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তনের তারতম্যকে জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিধারা বলে।

প্রতি দশ কিলো পাঁচ বছর অন্তর বর্তমান বিশ্বে জাতীয় ভিত্তিতে লোক গণনা করার প্রচলন রয়েছে। ১৬৫৫ সালের আগে তা ছিল না। ধীরে ধীরে এই লোক গণনা প্রসার লাভ করে, বর্তমানে সকল দেশেই জাতীয়ভাবে লোক গণনা করা হয়। লোক গণনায় দেখা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল কিন্তু সন্তুলণ শতাব্দীর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে আসে। তবে পরবর্তী ২০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দিগুণ হয়। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ মিলিয়ন, ১৮৫০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১.২ বিলিয়ন। ১৮৫০ সালের পর কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বৈপ্লাবিক উন্নয়ন সাধিত হয়, এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আরও দুট হয়। মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা আবারও দিগুণ হয়। ১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২.৫৩ বিলিয়ন। যা ২০১৭ সালে ৭.৬০ বিলিয়নে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ২০৩০ সালে অনুমিত জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮ বিলিয়নের উপরে (চিত্র ৭.১)।

পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিবর্তন

সাল	জনসংখ্যা (বিলিয়ন)
১৯৫০	২.৫৩
১৯৬০	৩.০৩
১৯৭০	৩.৬৯
১৯৮০	৪.৪৫
১৯৯০	৫.৩২
২০০০	৬.১৩
২০১০	৬.৯২
২০১৫	৭.৩৫
২০১৭	৭.৬০



চিত্র ৭.১ : বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা ১৯৫০-২০১৭

উৎস : UN, Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017

উপরের তথ্য ও বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

প্রাথমিক পর্যায় (Initial Stage)

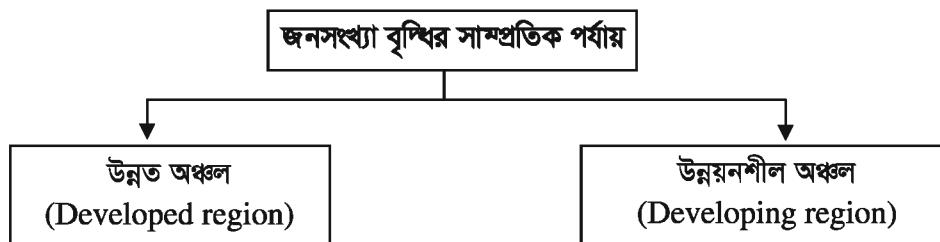
সুদূর অতীতকাল থেকে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে প্রাথমিক পর্যায় বলে। এ সময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার উভয় ছিল খুবই কম। এই পর্যায়ে পৃথিবীর সকল অঞ্চেই জন্ম এবং মৃত্যুর হার উভয়ই খুব বেশি ছিল।

মাধ্যমিক পর্যায় (Middle Stage)

১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মাধ্যমিক পর্যায় ধরা হয়। এই পর্যায়ে প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কিছু অঞ্চলে মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে এবং কিছু অঞ্চলে অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় পূর্বের মতো জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

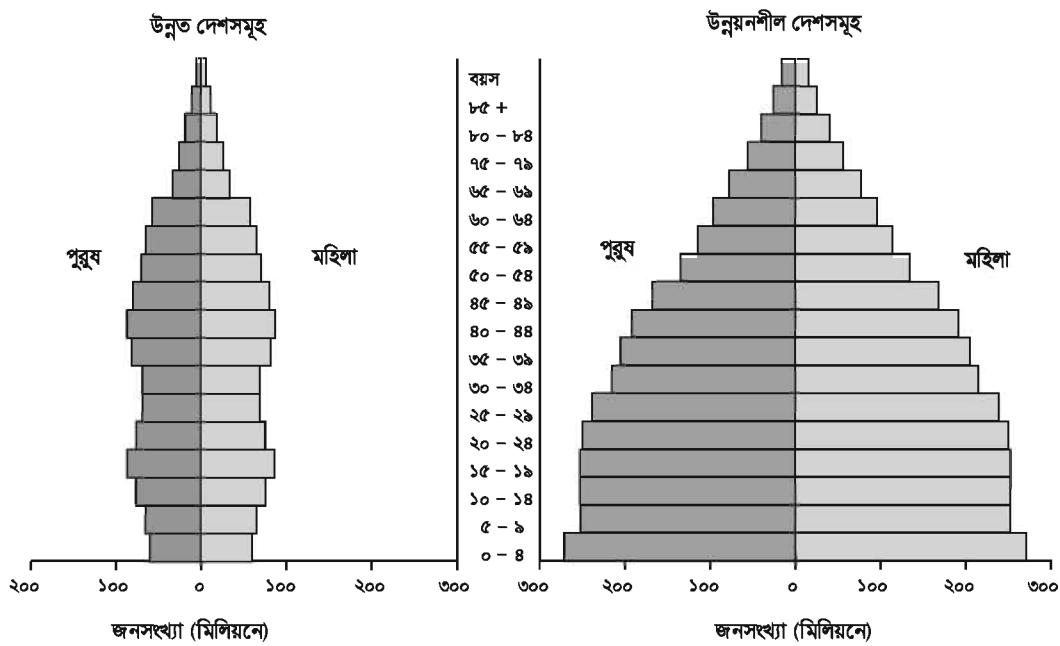
সাম্প্রতিক পর্যায় (Recent Stage)

১৯৫০ সাল থেকে ২০২০ সময় পর্যন্ত সাম্প্রতিক পর্যায়ভুক্ত। বিগত কয়েক দশকে সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সার্বিকভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিশ্বের অঞ্চল ভিত্তিতে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়।



উন্নত অঞ্চল বা উন্নত দেশসমূহ

উন্নত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে ও জনসংখ্যা স্থিতিশীল। জনসংখ্যা কাঠামো দেখলে বোঝা যাবে এর ভূমি কম প্রশস্ত, উপরের দিকে প্রশস্ততা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্ফীত হয়ে উপরের দিকে গিয়ে আবার সরু হয়েছে (চিত্র ৭.২)। উন্নত দেশসমূহে নারী ও পুরুষের শতকরা বৃদ্ধির হারের খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ কম। কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি, ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে তারা যথেষ্ট অবদান রাখে।



চিত্র ৭.২ : জনসংখ্যা কাঠামো

সাধারণত ০-১৮ বছর বয়সের শিশু এবং ৬৫ উক্ত বয়সের জনসংখ্যাকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলে। বাকিদের কর্মক্ষম জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হয়।

উন্নয়নশীল অঞ্চল বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ

বিশ্বের উন্নয়নশীল অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও যথেষ্ট বেশি। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিগত কয়েক দশকে যে হারে মৃত্যুর হার কমেছে, সে হারে জন্মার কমেনি। এ দেশগুলোর জনসংখ্যা কাঠামোর ভূমি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং শীর্ষভাগ সংকীর্ণ (চিত্র ৭.২)। মোট জনসংখ্যায় শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অনুপাত বেশি। যার ফলে

জনসংখ্যা কাঠামো (Population Structure) : নারী-পুরুষের বয়সভিত্তিক বিন্যাস গ্রাফে প্রকাশ করলে ত্রিভুজ বা পিরামিড সদৃশ যে নকশা তৈরি হয় তাকে জনসংখ্যা কাঠামো বলে। উল্লম্ব অক্ষে (Vertical axis) বয়স এবং অনুভূমিক অক্ষে (Horizontal axis) বামে পুরুষ ও ডানে নারীর সংখ্যা বা শতকরা হার স্পষ্টে স্থাপন করা হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের এরূপ জনসংখ্যা কাঠামোকে জনসংখ্যা পিরামিড (Population Pyramid) বলে।

নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কম থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সকল দেশ পিছিয়ে আছে।

কাজ : নিচের ছকটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য লেখ।

প্রাথমিক পর্যায়	মাধ্যমিক পর্যায়	সাম্প্রতিক পর্যায়

জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়মক (Factors of population change)

প্রত্যেকে তার আতীয়স্থজন এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ির বিগত পাঁচ বছরের জনসংখ্যার পরিবর্তন যদি লক্ষ কর—তাহলে দেখবে যে, এই পাঁচ বছরে দুই-একজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। আবার কোনো পারিবারিক সদস্য মারা গেছে, কেউবা চাকরি বা বিয়ের কারণে অন্যত্র চলে গেছে। আবার শহরে অস্থায়ী/কাঁচা বসতিতে অধিকসংখ্যক শিশু দেখা যায়। নারী-পুরুষও এসব অঞ্চলে অধিক।

এই যে চারপাশের জনসংখ্যার আপাত বৃদ্ধি, কমে যাওয়া এই দুই-এর পার্থক্য থেকে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বের করা যায়। জনসংখ্যার পরিবর্তন এভাবেই হয়ে চলেছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে, জনসংখ্যা একটি সক্রিয় পরিবর্তনশীল উপাদান। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন ঘটছে জন্ম, মৃত্যু ও অভিবাসনের কারণে। এগুলোকে আমরা জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নিয়মক বলতে পারি। এই নিয়মকগুলোর পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে কোনো সমাজ তথা দেশের জনমিতিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে থাকে। যার প্রভাব দেখা যায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও।

জন্মহার (Birth Rate)

স্বাভাবিক জন্মহার নারীদের সত্তান ধারণের সামর্থ্য নির্দেশ করে। তবে কোনো নির্দিষ্ট এক বছরের প্রতি হাজার নারীর সত্তান জন্মানের মোট সংখ্যাকে সাধারণ জন্মহার বলে। সাধারণত ১৫-৪৫ অথবা ১৫-৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা (Fertility) থাকে। কোনো দেশের বিশেষ কোনো বছরের জন্মিত সত্তানের সংখ্যাকে উক্ত বছরের গণনাকৃত প্রজননক্ষম নারীর মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সাধারণ জন্মহার নির্ণয় করা হয়।

এ বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে।

$$\text{সাধারণ জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মিত সত্তান}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা}} \times 1000$$

স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate)

সাধারণ জন্মহারের চেয়ে স্থূল জন্মহার বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হাজারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোনো বছরে জন্মিত সত্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয়। একে নিম্নোক্তরূপে দেখানো যেতে পারে।

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরের জন্মিত সত্তানের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

কোনো একটি স্থান বা দেশের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সত্তান ও জনসংখ্যা জানা থাকলে স্থূল জন্মহার বের করা সহজ।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে প্রজননশীলতার ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। একেক দেশের জন্মহার একেক রকমের। এর কারণ হিসেবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা প্রধান। সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়াবসির প্রভাবেই জন্মহারের ভিন্নতা দেখা যায়।

- ১। **বৈবাহিক অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য :** বিবাহের বয়স, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণ জন্মহার কম বা বেশির উপর প্রভাব ফেলে।
- ২। **শিক্ষা :** সাধারণ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেলে প্রজননশীলতা হ্রাস পায় এবং শিক্ষার মান ও হার কম হলে প্রজননশীলতা বেশি হয়।
- ৩। **পেশা :** সাধারণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত কর্মী এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার বেশি হতে দেখা যায়। অন্যদিকে শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি পেশাদার শ্রেণি এবং প্রশাসক, ব্যবসাপক ও চাকরিজীবীদের মধ্যে জন্মহার কম দেখা যায়।
- ৪। **গ্রাম-শহর আবাসিকতা :** গ্রাম এলাকায় সাধারণত জন্মহার বেশি এবং শহর এলাকায় জন্মহার কম দেখা যায়। তবে এই উপাদানটি আবার শিক্ষা ও পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মানব জন্মহারের তারতম্য একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ, ব্যক্তি-জীবনের বহুবিধি বিষয়, বিশেষ করে সামাজিক অবস্থান, সামাজিক ভূমিকা, তৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বৈবাহিক ধারা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, সমাজবৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় মানব প্রজননশীলতা তথা জন্মহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মৃত্যুহার (Death Rate)

মানুষ মরণশীল। মরণশীলতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকেই শুধু প্রভাবিত করে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপ করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য মৃত্যুহার জানা বিশেষ প্রয়োজন।

স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate)

স্থূল মৃত্যুহার মরণশীলতা (Mortality) পরিমাপের বহুল প্রচলিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। নির্দিষ্ট কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়।

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারী মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

কোনো স্থান বা দেশের মৃত্যুর সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলে স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা যায়। তবে মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য, বয়স-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার (Age-specific death rate) গুরুত্বপূর্ণ। যা বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যার মৃত্যুহার নির্দেশ করে, ফলে এই হার থেকে বার্ষিক ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি বোঝা যায়।

পরিগত বয়সে সামান্য অসুখবিসুখ বা আঘাতেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে। আবার অনেক সময় পরিগত বয়সের পূর্বেই মারা যায়। একে অকাল বা অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে। মৃত্যুহারের পার্থক্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

- ১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বাড়, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ।
- ২। যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। কুয়েত, আফগানিস্তান, ইরাক যুদ্ধে দেখা যায় তখন এই সব দেশে মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হয়।
- ৩। রোগ ও দুর্ঘটনা : সংক্রামক, শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ, ক্যান্সার, রক্ত সংঘালন সংক্রান্ত রোগ, আঘাত বা দুর্ঘটনা প্রভৃতির কারণে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।

অঞ্চলভেদে মরণশীলতার পার্থক্য রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুহার অনেক বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুহার কিছুটা কমে এসেছে এবং উন্নত দেশগুলোতে স্বাভাবিক মৃত্যুহার রয়েছে। আবার নারী-পুরুষের মৃত্যুহারের পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রজননকালীন নারীদের মৃত্যুহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার অনুন্নত দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুহারও বেশি দেখা যায়।

অভিবাসন (Migration)

জীবন ধারণের মৌলিক ও নানা প্রয়োজনে বহুলোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে অন্য শহরে, একদেশ থেকে অন্যদেশে অভিগমন করে। ফলে কোথাও জনসংখ্যা কমে আবার কোথাও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অভিবাসনে বাস্তুত্যাগীদের পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্রাম বা শহরের মোট জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। এতে সময় দেশের জনসংখ্যা বর্ণনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

সাধারণত কর্মের মজুরি, পণ্যের মূল্য, চাষ পদ্ধতি, বাজার ব্যবস্থা, শহর বা গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতি অভিবাসনকে প্রভাবিত করে। অনেক দেশে জনহার বেশি হয়। আবার জনহার বেশি এমন দেশের কিছু লোক অভিগমন করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি নাও থাকতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এই দেশের জনহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়। জনহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন প্রত্যেকটি বিষয় একটি অপরাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শুধু জনহার বা শুধু মৃত্যুহার বা অভিবাসন দিয়ে কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় না। জনসংখ্যার সঠিক তথ্য বুঝতে হলে এই তিনটি বিষয়ই সমানভাবে পর্যালোচনা করতে হয়।

প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—

১। অবাধ অভিবাসন (**Voluntary migration**) : নিজের ইচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করে আপন পছন্দমতো স্থানে বসবাস করাকে অবাধ অভিবাসন বলে।

২। বলপূর্বক অভিবাসন (**Forced migration**) : প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের মুখে কিংবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে অভিগমন করে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে বা যুদ্ধের কারণে কেউ যদি অভিগমন করে তবে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। বলপূর্বক অভিবাসনের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো স্থানে আগমন করে ও স্থায়ীভাবে আবাস স্থাপন করে তাদেরকে বলে উদাত্ত (Refugee)। আর যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুযোগমতো স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে তাদেরকে বলে শরণার্থী (Emigre)।

কাজ : রিনা ভৌমিকের পরিবার, সাদিয়ার পরিবার, সোহাগ, রবীন ও আরও অনেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমন করে। এর মধ্যে সাদিয়ার পরিবার, সোহাগ ও রবীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে চলে আসে। তাহলে নিচের ছকটি পূরণ কর।

যে এটা কোন ধরনের অভিবাসন?

যে এখানে উদাত্ত কারা?

যে এখানে শরণার্থী কারা?

যে অভিবাসী কে কে?

আবার তোমরা দেখবে দেশের বা রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে গ্রাম (Rural) থেকে শহরে (Urban) অথবা শহর থেকে গ্রামে অভিগমন ঘটে। আবার কাউকে কাউকে দেখবে দেশের বাইরে অন্যকোনো রাষ্ট্রে গমন করেছে। তাই স্থানভেদে অভিগমনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১। রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ (Internal)

২। আন্তর্জাতিক (International)

কাজ : এককভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।		
অভিগমনের স্থান		কোন ধরনের অভিগমন
ঢাকা	থেকে	চট্টগ্রাম
ঢাকা	থেকে	আমেরিকা
ময়মনসিংহ	থেকে	ঢাকা
বগুড়া	থেকে	ঢাকা

অভিবাসনের কারণ (Factors of Migration)

মানুষ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে অভিগমন করে। বাংলাদেশের বহু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। একটু তেবে দেখ কেন করেছে?

যে সমস্ত কারণ নতুন কোনো স্থানে বসতি স্থাপনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত বা প্রৱেচিত করে সেগুলোকে গন্তব্যস্থলের টান বা আকর্ষণমূলক কারণ (Pull factors) বলে। যে সমস্ত কারণে মানুষকে পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় সেগুলোকে উৎসস্থলের ধাক্কা বা বিকর্ষণমূলক কারণ (Push factors) বলে। তাহলে, অভিগমনের কারণগুলো হলো :

আকর্ষণমূলক কারণ

- (১) আতীয়স্বজন ও নিজ গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের নৈকট্য লাভ
- (২) কর্মস্থান ও অধিকতর আর্থিক সুযোগ সুবিধা
- (৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তাগত সুবিধা
- (৪) বিশেষ দক্ষতার চাহিদা ও বাজারের সুবিধা
- (৫) বিবাহ ও সম্পত্তি প্রাপ্তিমূলক ব্যক্তিগত সুবিধা

বিকর্ষণমূলক কারণ

- (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি
- (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা
- (৩) সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য
- (৪) অর্থনৈতিক মন্দি
- (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত ক্ষয়ক্ষতি

অভিবাসনের সুফল ও ক্রুফল (Merits and demerits of migration)

অভিবাসনের স্বাভাবিক ফলাফল হচ্ছে জনসংখ্যা বর্ণন বা অবস্থানিক পরিবর্তন। বস্তুত বিশ্বের জনসংখ্যা বর্ণনের তারতম্য আনয়নের ক্ষেত্রে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থানগত পরিবর্তন ছাড়াও অভিবাসনের ফলে বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনবৈশিষ্ট্যগত যে পরিবর্তন হতে পারে তা আলোচনা করা হলো :

১। **অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic impact)** : অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই মানুষ অভিবাসনে আগ্রহী হয়। উৎস ও গন্তব্যস্থলে ভূমি ও সম্পত্তির শরিকানা, মজুরির হার, বেকারত্ব, জীবনযাত্রার মান, বাণিজ্যিক গেনেদেনের ভারসাম্য, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারা প্রভৃতির পরিবর্তন হতে পারে। স্বল্পশিক্ষিত লোক সঠিক পদ্ধতিতে যদি অভিগমন না করে তবে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে কোথায় গমন করছি সে স্থানে যেয়ে কী করব তার যথার্থতা যাচাই করে অন্যত্র গমন করতে হবে। লোক মুখে শুনে প্রৱেচিত হয়ে গমন করলে অন্যদেশের আইন দ্বারা সে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে নিজের ও ফর্মা নং-১৫, ভূগোল ও পরিবেশ-৯ম-১০ শ্রেণি

দেশের অর্থনৈতিক কোনো লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়। আবার বলপূর্বক অভিবাসন উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সুবিধার চেয়ে দুর্ভোগই বেশি হয়।

২। সামাজিক ফলাফল (Social impact) : অভিবাসনের ফলে সামাজিক, আচার আচরণের আদান-প্রদান হয়। সামাজিক অনেক রীতিনীতি একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন রোগের বিভাগও ঘটে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের মধ্যে ভাব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়। ফলে জনগণের গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হবে। গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে পার্থক্য কমে আসে। তবে অধিকভাবে অন্য কালচার রংশ করার কারণে নিজের দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়।

৩। জনবেশিক্যগত ফলাফল (Impact on population) : অভিবাসনের ফলে উৎসহলে জনসংখ্যা কমে এবং গন্তব্যস্থলের মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। শিক্ষিত, যুবক ও পেশাজীবী অভিবাসন করলে গন্তব্যস্থলে জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। এর ফলে উভয় স্থানের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত ও নির্ভরশীলতার অনুপাত ব্যাপক পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় শিক্ষিত ও মেধাবী শ্রেণির লোক অভিগমন করে আর দেশে ফিরে আসে না এতে দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক দেশে জনসংখ্যা কম থাকায় তারা অন্যদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য আনে, এতে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন— অস্ট্রেলিয়া, কুয়েত। উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন— বাংলাদেশ শ্রম বাজারে জনশক্তি রঙানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

সরকারি নীতি (Government Policy) : ২০১২ সালের জনসংখ্যা নীতি রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের করণীয়

অধিক জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোনো দেশের জনসংখ্যা সংকোচন প্রধানত দুইভাবে কার্যকর করা যেতে পারে।

১। জনন্যহার হ্রাস

২। উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ অথবা বর্হিগমন বৃদ্ধি

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত কোনো দেশের জনন্যহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে কোনো দেশের জনন্যহার স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার ও জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রীসমূহ জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিপ্লব-কর্ণের সুষ্ঠু নীতি প্রণয় করা হাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে :

- ১। আইন করে বিবাহের বরস বৃদ্ধি করা।
- ২। সজ্ঞান সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য জনগণের উপর চাপ সূচিক উদ্দেশে বিভিন্ন একাধি আইন প্রণয়ন করা।
- ৩। সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ৪। শহিলাদের জন্য অধিক কর্মসংবন্ধের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৫। বৃদ্ধ বরস, সহকর্ত ও সূর্যোদার সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

অর্থনৈতিক কারণে কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত বিদেশি লোক নিয়োগ করে কোনো দেশ তার জনগুলির অভাব সামঞ্জিকতাবে পূরণ করতে পারে। এছাড়া মৃত্যুহার ক্রান্ত করে এবং জনবহুর বৃদ্ধি করে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য বৃক্ষা করা যাব।

জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বৈচিন্য (Population density and distribution)

জনসংখ্যা ঘনত্ব (Population density) : কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা এবং মোট ভূমির পরিমাণ বা অনুপাতের বে অনুপাত (Ratio) তা জনসংখ্যার ঘনত্ব। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব জানতে হলে মোট জনসংখ্যা ও দেশের আয়তন জানতে হবে।

$$\text{জনসংখ্যা ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট ভূমির আয়তন}}$$

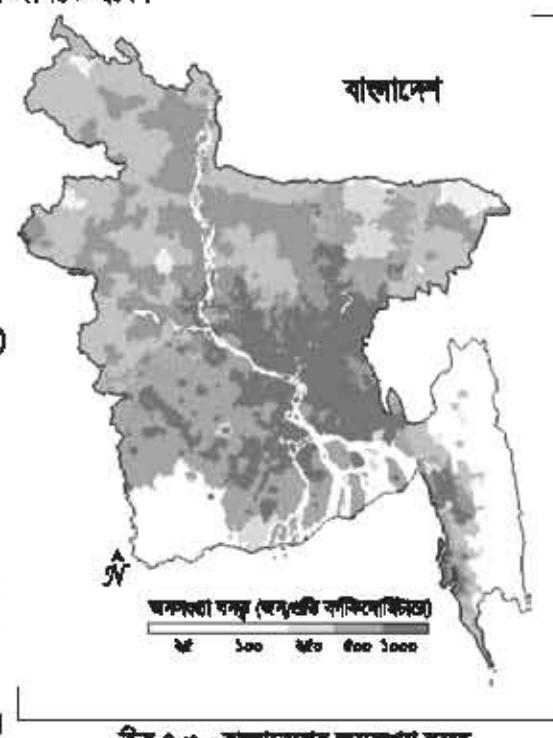
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন
এবং এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার

$$\therefore \text{জনসংখ্যা ঘনত্ব} = \frac{14,97,72,364}{1,47,570}$$

$$= 1,015 \text{ জন } (\text{প্রতি বর্গকিলোমিটার})$$

উপরের তথ্য থেকে আমরা দেখছি যে, দেশের জনসংখ্যার তুলনার আয়তন বড় হলে তার জনসংখ্যা ঘনত্ব কমে আসে আবার ঘনত্ব বেশি হলে তা ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি করে (চিত্র ৭.৩)।

মানুষ-ভূমি অনুপাত (Man-land ratio) : যে সকল ভূমি মানুষের কাজে লাগে এবং সমস্ত সৃষ্টি করতে পারে, তাকে কার্যকর ভূমি বলে। মানুষ-ভূমি অনুপাত বলতে এই কার্যকর ভূমির অনুপাতকে ধরা হয়।



চিত্র ৭.৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব

$$\text{মানুষ-ভূমি অনুপাত} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট কার্যকর ভূমির আয়তন}}$$

প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ কী রকম তা জানতে হলে সেই দেশের জনসংখ্যা ঘনত্বের পরিবর্তে মানুষ-ভূমি অনুপাত কত তা জানা প্রয়োজন।

কাম্য জনসংখ্যা (Optimum population) : কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকলেই তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এই দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা জনগণের ভোগ-সুখের বিস্তোবন্ত যতক্ষণ বজায় রাখা যায়, ততক্ষণই সেই দেশের কাম্য জনসংখ্যা বিদ্যমান। মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির আদর্শ অনুপাতের ভারসাম্য যখন নষ্ট হয় তখনই কোথাও অতি-জনাকীর্ণতা আবার কোথাও জনসংখ্যা স্বল্পতা দেখা দেয়।

অতি-জনাকীর্ণতা (Over population) : জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ অল্প থাকলে তাকে অতি-জনাকীর্ণতা বলে। এর ফলে মোট উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ, তথা মাথাপিছু উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ অল্প হয়। যা মাথাপিছু উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস করে।

জনস্বল্পতা (Under population) : জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ বেশি থাকলেও জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত সম্পদ এবং ভূমি ব্যবহার না করা গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে জনস্বল্পতা বলে। যেমন— অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা কম।

জনসংখ্যা বণ্টন (Population distribution) : জনসংখ্যা ঘনত্ব বা আকারগত তারতম্য থেকে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারছ যে ভূপৃষ্ঠে জনসংখ্যা সমভাবে বিস্তৃত নয়। স্থানতে জনসংখ্যার অবস্থানগত বিস্তৃতি বা বিন্যাস হচ্ছে জনসংখ্যা বণ্টন। কোথাও মানুষের বিপুল ঘন সমাবেশ। আবার কোথাও জনমানবহীন। ভূপৃষ্ঠের ৫০-৬০ শতাংশের মতো এলাকায় মাত্র শতকরা প্রায় ৫ ভাগ লোকের বসতি। স্থলভাগের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ এলাকায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বসবাস।

জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বণ্টনের প্রভাবক

তোমার নিজের দেশের কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি, কোথাও একদম কম। এ বিষয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে কিছু প্রাকৃতিক, কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় রয়েছে যা জনসংখ্যা ঘনত্ব কম বা বেশি হতে সাহায্য করে। এই বিষয়গুলোকে আমরা জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বণ্টনের প্রভাবক বলছি। প্রথমত একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) প্রাকৃতিক প্রভাবক, (২) অপ্রাকৃতিক প্রভাবক।

১। প্রাকৃতিক প্রভাবক (Physical factors)

ভূপৃষ্ঠি : মানুষ স্বভাবতই সমভূমি অঞ্চলে যেখানে কৃষি, শিল্প গড়ে তোলা যায় সেখানে বসবাস করতে চায়। তাই পৃথিবীর সমভূমি অঞ্চলে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার পাহাড়ি জঙ্গলময় অঞ্চলে জীবন ধারণ

অনেক কষ্ট ফলে ঐ সকল অঞ্চলে জনবসতি কম। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব খুবই কম।

জলবায়ু : জলবায়ুর প্রভাব জনবসতির বর্ণন নিয়ন্ত্রণ করে। চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর চেয়ে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে মানুষ বসবাস করতে পছন্দ করে।

মৃত্তিকা : মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য মানব বসতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকাজের উপযুক্ত হওয়ায় এ সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি।

পানি : যেখানে সুপেয় পানি পাওয়া যায় সেখানে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়। এজন্য নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি।

খনিজ : খনিজ প্রাণ্তির উপরও জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ভর করে।

২। অপ্রাকৃতিক প্রভাবক (Non-physical factors)

সামাজিক : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের জন্য যেখানে বেশি সুযোগ রয়েছে সে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি হয়। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মতো দেশসমূহে প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা না থাকলেও সামাজিক সুবিধাবলি পাওয়ার জন্য অভিবাসনের মাধ্যমে জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

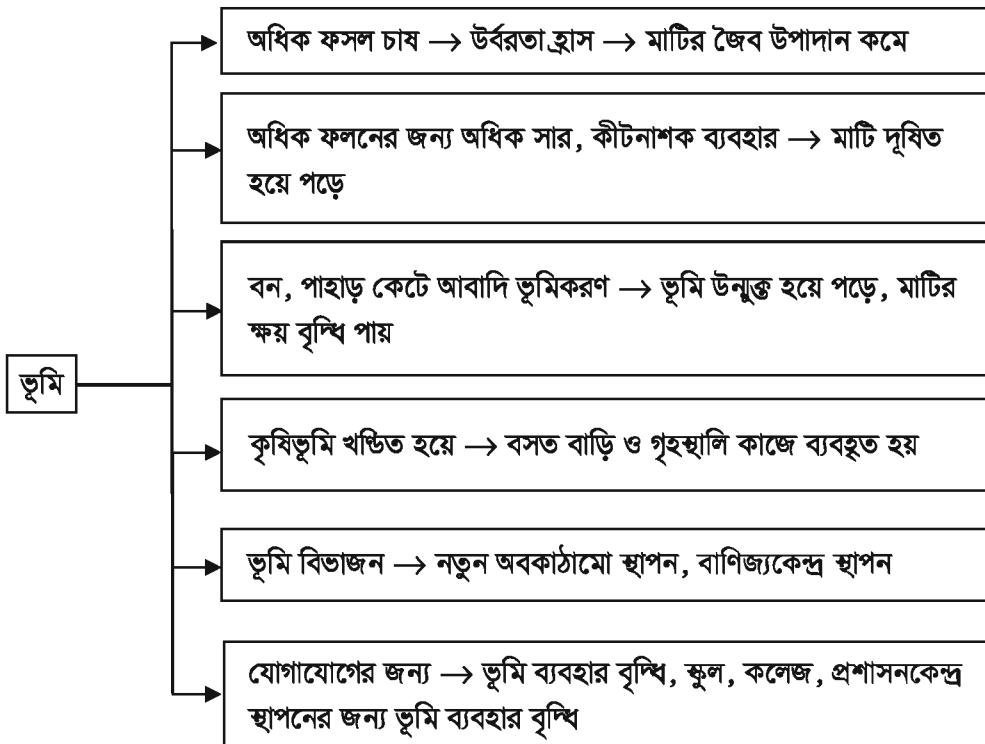
সাংস্কৃতিক : শিক্ষা, সংস্কৃতি আজকের যুগে মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের সুযোগ যেসব অঞ্চলে বেশি, সেসব অঞ্চলে জনবসতিও বেশি হয়।

অর্থনৈতিক : শিল্পাঞ্চলে, যেখানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং যেসব অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায় সেখানে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি। যেমন— জাপানের ওসাকা, ভারতের মুম্বাই প্রভৃতি স্থানে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি।

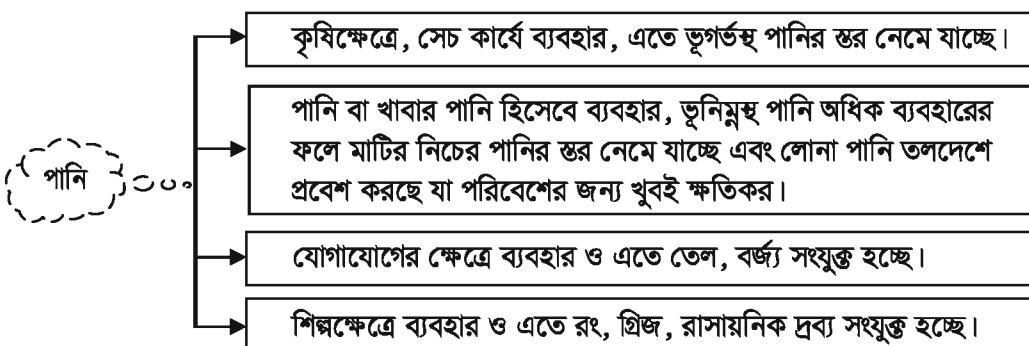
প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব (Impact of Excessive Population pressure on natural resources)

জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে সরাসরি প্রভাব পড়ে ভূমির উপর। একটি দেশের ভূমি সীমিত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমি অধিক ব্যবহার হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়।

ভূমির অধিক ব্যবহার, খনিতকরণ প্রভৃতির কারণে দিন দিন উৎপাদনযোগ্য ভূমি কমে যাচ্ছে। বসতি বিভারের ফলে উন্মুক্তস্থান, জলাশয় প্রভৃতি কমে যাচ্ছে। মাটিতে যে সকল অণুজীব, ক্ষুদ্রজীব বাস করে তা বাধাগ্রস্ত হয়। দৃষ্টিতে মাটিতে উচ্চিদ জন্মাতে পারে না। ফলে ভূমি মরুকরণ হতে থাকে। তাই যে কোনো দেশের ভূমি ব্যবহার সঠিকভাবে করার জন্য জনসংখ্যার ভারসাম্য থাকা দরকার।



মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পানির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পানি, কিন্তু সকল পানির শতকরা ৯৭ ভাগ লবণাক্ত বা লোনা। তাহলে আমাদের খাবার উপযুক্ত পানি মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। পানির ব্যবহার ও ক্ষতিকর দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেলে উপরিউক্ত কাজগুলো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, যা পানির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। জলজ স্কুল উচ্চিদ, প্ল্যাথেন, কচুরিপানা, শেওলা প্রভৃতি জন্মাতে পারছে না। পর্যায়ক্রমে ছোট মাছ ও বড় মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে জলজ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসস্থল নির্মাণ, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ভূমিহ্রাস প্রভৃতির কারণে বন, পাহাড় প্রভৃতি কাটা হচ্ছে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

কাজ : তোমার চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ (পানি, ভূমি, বনজ) কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার চার্ট তৈরি কর।

সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য, যে কোনো দেশের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা ও সম্পদ জাতীয় উন্নয়নের দুই উপাদান। সম্পদের অবস্থান, পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মানুষের অবদান রাখার সুযোগ খুবই সীমিত। তাই জনসংখ্যার যথাযথ সমন্বয় সাধন করার জন্য জনসংখ্যা নীতি (Population policy) গ্রহণ করা হয়। সমস্যা ও সমন্বয় ব্যবস্থার ভিন্নতার জন্য জনসংখ্যা নীতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উপর্যুক্ত নীতির মাধ্যমে জনসংখ্যা ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে যে কোনো দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান (Contemporary Population of Bangladesh, problems and solutions)

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আদমশুমারি রিপোর্ট মার্চ, ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪.৯৭ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১,০১৫ জন (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যা ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যা ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ঠ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার ত্রাস পাচ্ছে।
- আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি।
- নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।
- দেশের অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল।
- জনহার মৃত্যুহার অপেক্ষা কম ত্রাস পেয়েছে।
- অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে।
- উন্নত দেশগুলোর তুলনায় গড় আয়ুকাল অনেক কম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Population growth rate) : বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০০১ সালে ১.৪৮% এবং ২০১১ সালে ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে তার একটি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৮৮
২০০৯	১.৫
২০১১	১.৩৭

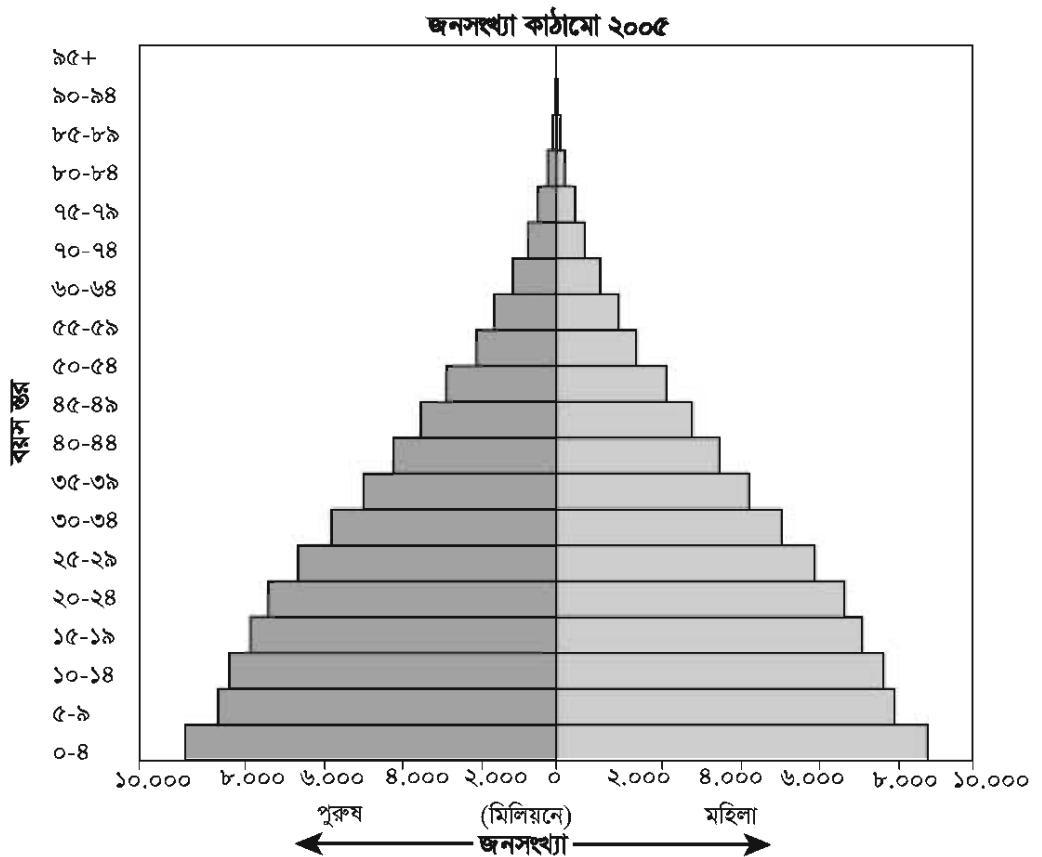
নিচে করি

৩.০					
২.৫					
২.০					
১.৫					
১.০					
.৫					
০	১	১	১	১	১
	২	২	২	২	২

→ সাল

বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যা বণ্টন (Population distribution according to age group)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীল বয়সের প্রাধান্য। বিভিন্ন সালের গগনা থেকে দেখা যায় দেশের প্রায় অর্ধেক শোক পরন্তরশীল শিশু-কিশোর, এছাড়া সামান্য বৃদ্ধ শোকও রয়েছে। ২০০৫ সালের কাঠামো থেকে দেখা যায় ৬০ থেকে ৯০ বছরের উধৰে জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের কম এবং পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। কাঠামো ব্যবহার করে নিচের কাজটি পূরণ কর।



- কাজ :**
- ১। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোন বয়সের?
 - ২। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কোন বয়স কাঠামোতে?
 - ৩। কর্মক্ষম জনসংখ্যার ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত বের কর।

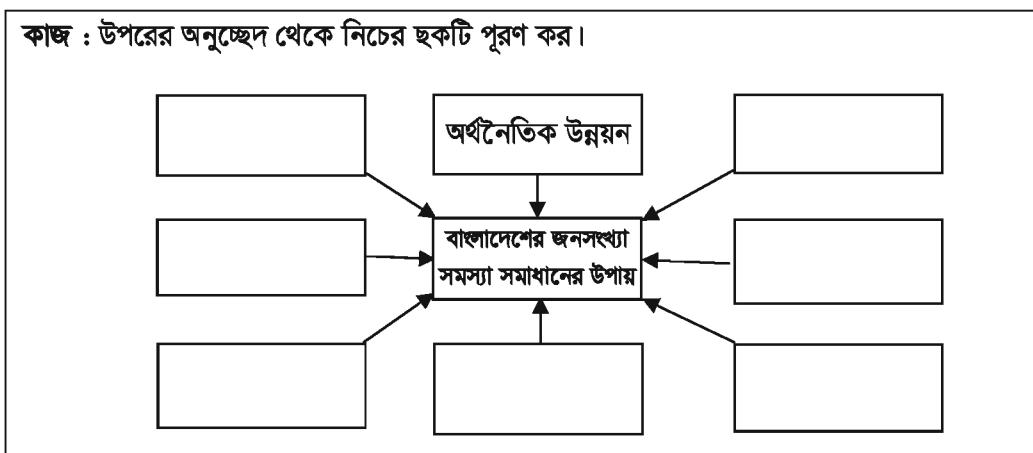
যে কোনো দেশের ভূমি সীমিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দিষ্ট। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূমি ও সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেও কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা (Population problem of Bangladesh)

- জমির খণ্ডবিখণ্ডন = উৎপাদন হ্রাস
- মাথাপিছু আয় হ্রাস = জীবনযাত্রার মান নিচু
- অত্যধিক জনসংখ্যা = স্বাস্থ্যসেবার মান কম
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি = স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল
- মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না = বেকারত্ব বৃদ্ধি
- মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবিকার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি বৃদ্ধি = সমাজ জীবনে নিরাপত্তার অভাব
- বাসস্থান চাহিদা বৃদ্ধি, জমির ব্যবহার বৃদ্ধি = কৃষি ভূমি হ্রাস
- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্য কম বৃদ্ধি = খাদ্য ঘাটতি
- বন নির্ধন, পাহাড় কাটা বৃদ্ধি, বন্তি বসতি বৃদ্ধি = পরিবেশ দূষণ
- খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি = বৈদেশিক মুদ্রা হ্রাস
- অত্যধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, ভর্তি সমস্যা, প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজের অভাব = শিক্ষার হার কম

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, দ্রুত শিল্পায়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে লোক স্থানান্তর করে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে।

জাতীয় আয়ের সুষম বর্ণনের ব্যবস্থা করা হলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে। কর্মদক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা গেলে সমস্যা হ্রাস পাবে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান সহজ হয়।



বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় (Measures taken to control population in Bangladesh)

জনসংখ্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের চেয়ে জনসংখ্যা যেন দ্রুত বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হলো জনসংখ্যা। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও সচেতনতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল প্রচার করেছে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এ দেশের জনশক্তি সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

- জননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।
- বিলম্ব বিবাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা।
- নারী শিক্ষা ও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশের জনগণের চিন্তিবিলোদনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।
- ধর্মান্ধতা, পুত্র সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা, বংশ রক্ষা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করা।

অনুশীলনী**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

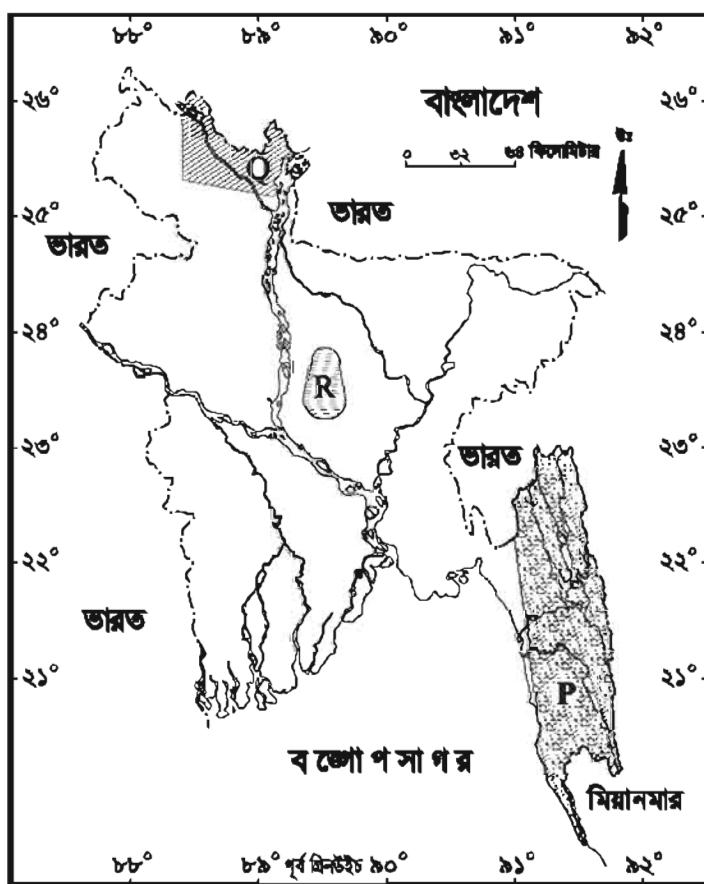
১। জনসংখ্যা বক্টরের কোনটি অপ্রাকৃতিক প্রভাবক?

- | | |
|----------------|----------|
| (ক) অধিনেতৃত্ব | (খ) খনিজ |
| (গ) মৃদ্ধিকা | (ঘ) পানি |

২। কোন সম্পর্কটিকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়?

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (ক) মানুষ ও বনজ সম্পদের ভারসাম্য | (খ) মানুষ ও ভূমির ভারসাম্য |
| (গ) মানুষ ও খনিজ সম্পদের ভারসাম্য | (ঘ) মানুষ ও শিল্পের ভারসাম্য |

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর অঙ্গের উত্তর দাও :



৩। মানচিত্রে ‘Q’ চিহ্নিত অঞ্চল থেকে ‘R’ চিহ্নিত অঞ্চলে অভিগমনের কারণ-

- i. কর্মসংস্থানের অভাব
- ii. নদীভাঙ্গন
- iii. সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৪। মানচিত্রে ‘P’ চিহ্নিত অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব কম হওয়ার কারণ-

- i. ভূমির বন্ধুরতা
- ii. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- iii. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

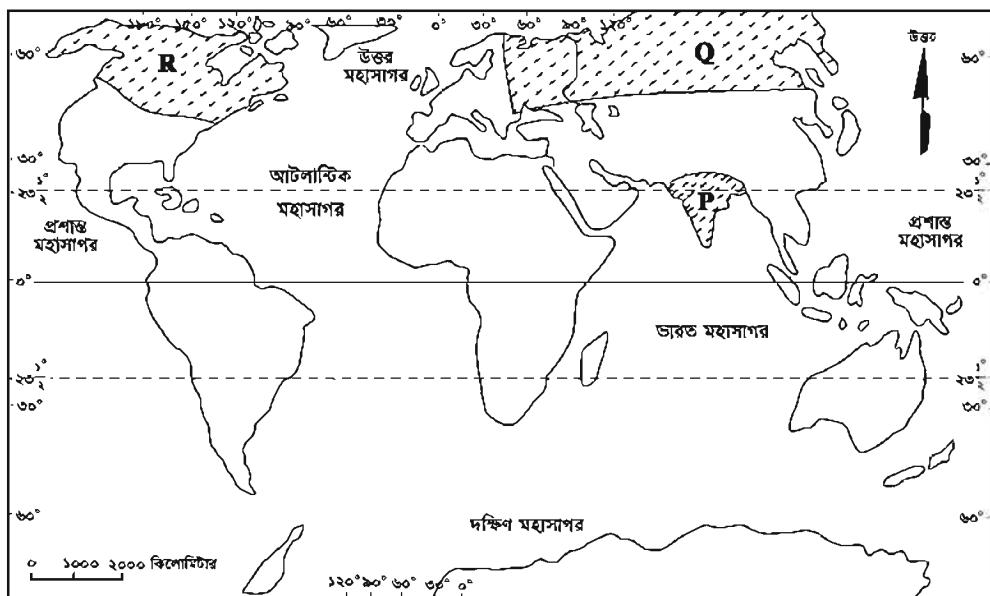
- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে বৌদ্ধ সম্মুদ্দায় ও সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা দেখা দেয়। ফলে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে রোহিঙ্গা মুসলমানগণ কঞ্চিবাজারের উথিয়াতে আশ্রয় নেয়।

- ক. অভিবাসন কী?
- খ. শরণার্থী বলতে কী বোঝায়?
- গ. কঞ্চিবাজারের উথিয়াতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় গ্রহণ কোন ধরনের অভিগমন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রোহিঙ্গাদের অভিগমন এই অঞ্চলের সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে- বিশ্লেষণ কর।

২।



- ক. স্বল্প জনসংখ্যা কী?
- খ. অতি-জনাকীর্ণতা ব্যাখ্যা কর।
- গ. মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব অধিক হওয়ার প্রাকৃতিক কারণ বর্ণনা কর।
- ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত অঞ্চল দুটির মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্য বিশ্লেষণ কর।

অক্তম অধ্যায়

মানব বসতি

Human Settlements

কোনো ধর্মটি হাসে মানুষ একত্রিত হয়ে জীবনভাবে বসবাস করলে তাকে মানব বসতি বলে। অকৃতির সঙ্গে নিজেকে উপরোক্তি করে চলার এটাই প্রথম অবস্থা। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোগসম্মত প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ শাকৃতিক অনুকূল অবস্থাকে কাছে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানব বসতি গড়ে তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শাকৃতিক তিনুভাব অন্য বিভিন্ন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে, বেদন—মেঝে দেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের একিমোরা ব্যবহৈর ঘরে এবং বালাদেশের অধিকাংশ আর্মীণ বসতিতে দোচালা ও টোচালা ধরনের ঘরে বাস করতে দেখা যায়। আর বিশ্বের বিভিন্ন শহরের বসতিতে আধুনিক নকশা ও নির্মাণসামগ্রী প্রয়োগ করে উচ্চ অস্তাশিকা তৈরি হচ্ছে। অনসংখ্যা বৃক্ষের সঙ্গে শারীর ও শহীদ প্রত্যয় হাসে বসতি বৃক্ষের হার বেড়েই চলেছে। বিশ্বভাবে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে পরিবেশ দূর্বল ব্যাপকভাবে হচ্ছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আসুন—

- বসতি হাসলের নিরামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীর বসতি ও নগর বসতির ধরন বর্ণনা করতে পারব।
- শারীর বসতির ধরন ও বিন্যাস বর্ণনা করতে পারব।
- নগরায়ণ কী তা বলতে পারব এবং নগরের প্রেমিকাদের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নগরায়ণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে স্রৃষ্টি সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিজ ধর্মকার বসতির ধরন ও বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিজের চারপাশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের ঘট্টের ব্যাপারে সচেতন ও জড়গ্রস্ত থাকব।

বসতি স্থাপনের নিয়ামক (Factors of settlement)

- ১। ভূপ্রকৃতি : জনবসতি গড়ে উঠার পেছনে ভূপ্রকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সমতলভূমিতে কৃষিকাজ সহজে করা যায়, কিন্তু পাহাড় এলাকার ভূমি অসম্ভব হওয়ায় কৃষিকাজ করা তেমন সম্ভব হয় না। ফলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কৃষিজমির নিকটে জনবসতি তৈরি হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতির ঘনত্ব সমতলভূমির তুলনায় কম।
- ২। পানীয় জলের সহজলভ্যতা : জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রথম ও প্রধান চাহিদা হলো বিশুদ্ধ পানীয় জল। এজন্যই নির্দিষ্ট জলপ্রাপ্ত্যতার স্থানে মানুষ বসতি গড়ে তোলে। মরুময় এবং উপমরুময় অঞ্চলে বরনা অথবা প্রাকৃতিক কৃপের চারদিকে মানুষ সংঘবন্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করে। পানীয় জলের প্রাপ্ত্যতার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা এই সমস্ত বসতিকে আর্দ্র অঞ্চলের বসতি বলে।
- ৩। মাটি : মাটির উর্বরা শক্তির উপর নির্ভর করে বসতি স্থাপন করা হয়। উর্বর মাটিতে পুঁজীভূত জনবসতি গড়ে উঠে, কিন্তু মাটি অনুর্বর হলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠে। মাটির প্রভাবে জার্মানি, পোল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে বিক্ষিপ্ত জনবসতির সৃষ্টি হয়েছে।
- ৪। প্রতিরক্ষা : প্রাচীনকালে প্রতিরক্ষার সুবিধার জন্যই মানুষ পুঁজীভূত বসতি স্থাপন করে। বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ বা বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ একত্রে বসবাস করত। কারণ প্রাচীনকালে আত্মরক্ষার জন্য কোনো আধুনিক অস্ত্রের প্রচলন ছিল না।
- ৫। পশুচারণ : পশুচারণ এলাকায় সাধারণত ছড়ানো বসতি দেখা যায়। পশুচারণের জন্য বড় বড় এলাকার দরকার হয়। ফলে নিজেদের সুবিধার জন্য তারা বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে থাকে।
- ৬। যোগাযোগ : প্রাচীনকাল থেকে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বসতি গড়ে উঠেছে। যেমন— নদী তীরবর্তী স্থানে নৌচলাচলের এবং সমতলভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এরূপ স্থানগুলোতে পুঁজীভূত বসতি গড়ে উঠেছে। মিসরের নীল নদীর তীরবর্তী আলেকজাণ্ড্রিয়া ও তাজিকিস্তানের সমতলভূমিতে সমরকল্প নগরের উৎপত্তি হয়েছে।

বসতির ধরন (Types of settlement)

গ্রামীণ বসতি : যে বসতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই বসতিকে সাধারণভাবে গ্রামীণ বসতি বলে। গ্রামীণ বসতি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীবন্ধ এর যে কোনোটি হতে পারে। এর কারণ হলো গ্রামে প্রচুর জমি থাকে। স্বত্বাবতাই, গ্রামবাসীরা খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন। ঘরবাড়ির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, নির্মাণ উপকরণ, বাড়ির নকশা ইত্যাদির বিচারে গ্রামীণ বসতি সহজেই চিনে নেওয়া যায় (চিত্র ৮.১)। শহরের ইট-সিমেন্টের নির্মাণ স্থাপনা থেকে গ্রামের মাটির, কাঠের, পাথরের বাড়িকে সহজেই আলাদা করা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামে গোলাবাড়ি,

গোয়ালবাড়ি, ঘোরের তিক্তে ঝঠান এসবই এক অতি পরিচিত দৃশ্য। শামে ঝঠানের চারপাশ থিয়ে শোবার ঘর, জানুয়ার, গোয়ালবাড়ির তৈরি করা হয়। ঝঠানে পূর্বজ্ঞা থান সেব্য করা, শুকানো এবং থান তাঁত ছাঢ়াও নানান কাজ করে থাকে। শামে শোবার ঘর, জানুয়ার, গোয়ালবাড়ির দেহন আলাদাভাবে গঁড়ে উঠে যা শহরে হয় না। বসতবাড়িতে অবস্থান আলাদাগৰক ইত্যার ছন্য এবং শাকুণিক বালুচৰাহের সহজ শবেশই আলাদাভাবে বসতি গঁড়ে উঠার পথান কারণ।



চিত্র ৮.১ : শামীণ বসতি

ইত্যাপি নামে চিহ্নিত করা যায়। বালাদেশের বিভিন্ন শামীণ অধিকার এ ধরনের অনেক শাম রয়েছে।

নগর বসতি : যে বসতি অঞ্চলে অধিকালে অধিবাসী অত্যুক্ত ভূমি ব্যবহার ব্যক্তিগত অন্যান্য অকৃতিকার্য দেহন— শামীণ অধিবাসীদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির শিল্পাত্মকরণ, পরিবহন, কল-বিক্রয়, অশাসন, শিক্ষা-সংকলন কার্য প্রভৃতি পেশাগত নিয়োজিত থাকে, তাকে নগর বসতি বলে।

বাহ্যিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শহরে অনেক রাজাঘাট ও কোনো কোনো কেন্দ্রে বিশাল বিশাল আকাশচূর্ণী অট্টালিকা (Skyscraper) রয়েছে (চিত্র ৮.২)। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগতিঠান,



চিত্র ৮.২ : নগর বসতি

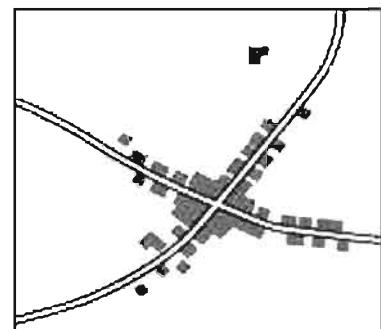
হাসপাতাল, নার্সিংহোষ, আমোদ-খমোদের ছন্য বহুপ্রকার সংস্থা, পার্ক ইত্যাদি থাকে। বড় কড় শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড চলে।

কাজ : গ্রামীণ ও নগর বসতির মধ্যে পার্শ্বক্য নিরূপণ কর (একক বা দলে কাজ দেওয়া)।

গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস (Patterns of rural settlements)

অবস্থানের প্রেক্ষিতে ও বাসগৃহসমূহের পরম্পরার ব্যবধানের ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

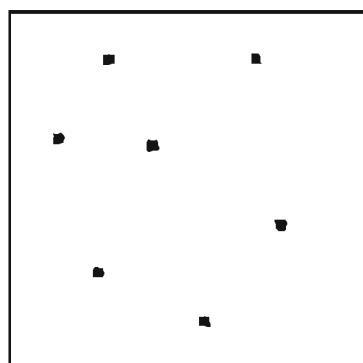
১। **গোষ্ঠীবন্ধ বা সংঘবন্ধ বসতি (Nucleated settlement) :** এই ধরনের বসতিতে কোনো একস্থানে বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে বসবাস করে (চিত্র ৮.৩)। এই ধরনের বসতি আয়তনে ছোটখাম হতে পারে, আবার পৌরণ হতে পারে। এই ধরনের বসতির যে লক্ষণ চোখে পড়ে তা হলো এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম ও বাসগৃহের একত্রে সমাবেশ। সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই বাসগৃহগুলোর মধ্যে পরম্পরার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যদি ঘনটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়, তবে সেখানে আরও বসতি ও রাস্তা গড়ে উঠবে। এভাবে একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে বর্ধিষ্ঠ বসতিটি কাশকুমে শহর বা নগরে রূপান্তরিত হবে। সমাজবন্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার জন্য একত্রে বসবাস করতে চায়। এছাড়া ভূগূণত, উর্বর মাটি ও জলের উৎসের উপর নির্ভর করে এ ধরনের বসতি গড়ে উঠে।



চিত্র ৮.৩ : গোষ্ঠীবন্ধ বা সংঘবন্ধ বসতি

২। **বিস্তৃত বসতি (Dispersed settlement) :** এই ধরনের

বসতিতে একটি পরিবার অন্যান্য পরিবার থেকে ছড়ানো-ছিটানো আবস্থায় বসবাস করে (চিত্র ৮.৪)।



চিত্র ৮.৪ : বিস্তৃত বসতি

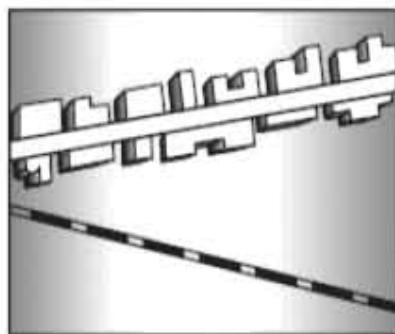
কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের ধারার বসতি ও অস্ট্রেলিয়ার মেষপালন কেন্দ্র এই ধরনের বসতির উদাহরণ। কখনো কখনো দুটি বা তিনটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। তবে এক্ষেত্রেও এদের অতি ক্ষুদ্র বসতি অপর ক্ষুদ্র বসতি থেকে দূরে অবস্থান করে। হিমালয়ের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে এমন কিছু বসতি আছে যেখানকার এক অঞ্চলের উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যদিকের উপত্যকাবাসীদের সাথা জীবনে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এই ধরনের বসতিগুলো বিস্তৃত বসতির পর্যায়ে পড়ে। বিস্তৃত বসতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- (ক) দুটি বাসগৃহ বা বসতির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান।
- (খ) অতি ক্ষুদ্র পরিবারভুক্ত বসতি।

(গ) অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা।

বিকিঞ্চ বসতি গড়ে উঠার পথেরে কঙকণুলো আকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে। পৃষ্ঠীয় অধিকালে বিকিঞ্চ বসতি বন্ধুর ভূগৃহীতিক অংশতে গড়ে উঠেছে। বন্ধুর ভূগৃহীতিতে যেমন কৃষিকাজের জন্য সমতলভূমি পাওয়া বাহু না, তেমনি এখানে বোগাবোগ ব্যবহাৰ গড়ে তোলাও কৃতসাধ্য। বিকিঞ্চ বসতি গড়ে উঠার অন্যতম কারণ জলাভাব, জলাভূমি ও বিল অঞ্চল, কয়িত ভূমিভাগ, বনভূমি, অনুর্ধ্ব মাটি অধিকালে কেজে বিকিঞ্চ বসতির জন্য দেয়।

৩। রৈখিক বসতি (Linear settlement) : এই ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একই সরলরেখায় গড়ে উঠে (চিত্র ৮.৫)। অধানত আকৃতিক এবং কিছু কেজে সামাজিক কারণ এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। নদীর আকৃতিক বৌধ, নদীর কিনারা, রাঙার কিনারা প্রভৃতি হালে এই ধরনের বসতি গড়ে উঠে। এই অবস্থায় গড়ে উঠা পুরীভূত রৈখিক ধরনের বসতিগুলোর মধ্যে কিছুটা কীকা থাকে। এই কীকা ঝান্টকু ব্যবহৃত হয় খামার হিসেবে। বন্যামুক্ত সমতল উচ্চভূমি এই ধরনের বসতির জন্য সুবিধাজনক।



চিত্র ৮.৫ : রৈখিক বসতি

কাজ : শারীর বসতির ধরন নিচের ছকাবলৰ ঘৰে দেখ (দলভিত্তিক কাজ)।

শোষীবন্ধ বা সহবন্ধ বসতি	বিকিঞ্চ বসতি	রৈখিক বসতি
•	•	•
•	•	•
•	•	•

নগরায়ণ (Urbanization)

কাজের আকৃতি ও বসতির ধরন অনুসৰে পৃষ্ঠীয় ধার সাতল কোটি মানুষকে শারীর ও সপ্তর এ সূচো প্রেসিতে বিস্তৃত করা যাব। মানুষ যখন তার খাদ্যের জন্য সঞ্চাহ এবং শিকাজের উপর নির্ভর কৰত, তখন মানুষ হিল বায়াবজ্জের মতো। কিন্তু যখন খাল্চ সঞ্চাজাজের সিঙ্গুল খালিকটা তাজ আয়তে এলো, তখন সে হিতোলী জনপোষীতে পরিষ্কৃত হতে আমুছ কৰল। গড়ে উঠল ঝুঁটী বসতি বা শাম। অনেকের মতে নগরায়ণ বিকাশের ধারাক্রম হচ্ছে— সঞ্চাহ ও শিকাজ, কৃষি এবং নগরায়ণ।

অনেকের ধারণা নগরের উৎপত্তি মধ্যে অর্থনৈতিক কারণগুলোই প্রাথম্য পেৱেছিল। মৌল নদের অববাহিকার ১
মেঘকিস, খেবস (৩০০০ ফ্রিটপুর্ব), সিল্প অববাহিকার মহেঝপাড়ো, হ্যাশ্বা (২৫০০ ফ্রিটপুর্ব) প্রভৃতি ২

নগরের উৎপত্তি ঘটে। এগুলো নগর সভ্যতার সূতিকাগার। প্রাচীনকালে রোম ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নগরী। রোমের পতনের কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নগর প্রবৃদ্ধির গতি স্থিরিত ছিল। ইতিহাসে এ সময়টি ‘অম্বিকার যুগ’ নামে খ্যাত। অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত নতুন নতুন শহর ও নগর গড়ে উঠতে থাকে। মুসলমানদের শাসন ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত প্রসার লাভ করে এবং টলিডো, কর্দেভা ও সেভিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়। যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য, বসতি, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে মোঝাসা, দারেস্সালাম, মালাক্কা, গোয়া, কলকাতা, সায়গন, জাকার্তা, বালটিমোর, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, কুইবেক, মন্ট্রিয়াল প্রভৃতি শহর ও নগর গড়ে উঠে। শিল্প বিপ্লবের পর নগরায়ণে নতুন মাত্রা ও গতি পায়। কাঁচামাল হিসেবে কয়লা, লোহা, তামা ও অন্যান্য খনিজসামগ্রী উৎপন্ননের কেন্দ্রগুলোতে গড়ে উঠল খনি শহর বা প্রাথমিক উৎপাদন কেন্দ্র। শিল্পকারখানাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল প্রস্তুতকারী শহর বা দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন কেন্দ্র। উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দেশে বিক্রি ও রপ্তানি করার জন্য গড়ে উঠল বাজার ও বস্তর বা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক কেন্দ্রসমূহ (সেবাকেন্দ্র)। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নগরায়ণের ফলে নগরে বসবাস করবে। নগরায়ণ দুটি সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত : (১) গ্রামীণ এলাকা থেকে পৌর এলাকায় মানুষের আগমন এবং এর ফলে গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা পৌর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া; (২) নগরের সঙ্গে জড়িত সংস্কৃতির কতিপয় ধরনসহ গ্রামীণ এলাকায় পৌর প্রভাবের বিস্তার এবং এই প্রভাব প্রসার লাভ করার ফলে অতিমাত্রায় নগরায়িত সমাজে গ্রামীণ ও পৌর জনসংখ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য হ্রাস পায়।

কাজ : নগরায়ণ কী? দলে আলোচনা করে পয়েন্টভিত্তিক খাতায়/পোস্টার পেপারে লেখ।

নগরের শ্রেণিবিভাগ (Classification of cities)

ভূগোলবিদরা বিভিন্নভাবে শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন শহর ও নগরের মধ্যে আয়তন, গঠন, জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এসব বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও পৌর বসতির বা নগর বসতির শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ক্রিয়াকলাপের উপর। তাই ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতিভেদে নগর বসতিগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

- (১) সামরিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর : প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সামরিক ও নৌ ধাঁচির দুর্গসমূহ গড়ে উঠে। এই সকল স্থানকে আশ্রয় করে কালৰূমে নগর বিকাশ লাভ করে। ক্ষটল্যান্ডের এডিনবরা, ফ্রান্সের লা-হাভার, রাশিয়ার পিটার্সবার্গ, স্পেনের জিব্রাল্টার, ভারতের আগ্রা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি সামরিক ধাঁচির নগর।

(২) প্রশাসনিক নগর : প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হলো নগর। শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সাধারণত কোনো কেন্দ্রীয় শহরকে রাজধানীর রূপ দেওয়া হয় এবং সেখানে পৌর বসতির প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের ঢাকা, ভারতের নয়াদিল্লি, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা প্রত্তি প্রশাসনিক নগর।

(৩) শিল্পতিক্রিক নগর : নগরায়ণের ক্ষেত্রে শিল্পতিক্রিক ক্রিয়াকলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিল্পকার্য নতুন শহরের জন্য দিলেও সাধারণত স্থায়ী শহর বা নগরের প্রতি শিল্পের আকর্ষণ অধিক হয়ে থাকে। শিল্প শক্তি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার পর কয়লা উৎপাদনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অনেক দেশে কয়লা নগরী গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ক্যাসল, ভারতের রানীগঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া ও রাশিয়ার ডোনেৎস অঞ্চলের নগরীসমূহ এইরূপ খনি শহর।

(৪) বাণিজ্যতিক নগর : ক্ষুদ্র বিনিময় কেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়ে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। সভ্যতার আদি পর্ব হতে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা চালু হয় এবং এই বিনিময়কে কেন্দ্র করে একটি বাজার সৃষ্টি হয়। এই সকল স্থানীয় বাজার বিভিন্ন দিক থেকে আগত পথের মিলনস্থলে গড়ে উঠে। শহর ও নগর বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আজও অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। মহাদেশীয় স্থলপথকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে সিরিয়ার দামেক ও আলেপ্পো, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কোর ফেজ শহর গড়ে উঠে। বাংলাদেশের বুড়িগঞ্চা নদীর তীরে ঢাকা ও কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহর গড়ে উঠেছে।

(৫) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপতিক নগর : অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও কোনো স্থানে পৌর বসতি গড়ে উঠতে পারে। ধর্মীয় কারণে শহর বা নগরের পক্ষন দেখা যায়। কোনো মহাপুরুষের জন্মস্থান, কর্মভূমি বা সমাধি স্থানকে অবলম্বন করে একটি স্থায়ী পৌর বসতির বিকাশ ঘটতে পারে। মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, আজমীর, গয়া, বারানসী প্রভৃতি এরূপ ক্রিয়াকলাপতিক শহর। বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কোনো স্থানে স্থাপিত হলে সেখানে পৌর বসতির বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতের নালদা, ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্ৰিজ, ইতালির পিসা নগরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নগর।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন— চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র শিল্প ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নগর গড়ে উঠে। ফ্রাসের প্যারিস চিত্রকলা, ভারতের মুম্বাই ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত।

(৬) স্বাস্থ্য নিবাস ও বিনোদনের কেন্দ্র : কর্মক্লান্ত মানুষের ক্লান্তি দূর ও অবসর বিনোদনের জন্য সাধারণত শহর বা নগরের কোলাহলের বাইরে সমুদ্রসৈকত বা শৈল নিবাসে স্বাস্থ্য ও প্রমোদ কেন্দ্র গড়ে উঠে। যেমন— বাংলাদেশের কক্ষবাজার, ভারতের পুরী এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামী ও হনলুলু সমুদ্রসৈকত কেন্দ্রিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

কাজ : বাংলাদেশের ৫টি নগর উল্লেখ করে গড়ে উঠার কারণ চিহ্নিত কর।

নগরায়ণের প্রভাব (Impact of urbanization)

নগরায়ণের ফলে স্ফট প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

- ১। জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব : সাধারণত শহর বৃহৎ জনসংখ্যাবিশিষ্ট এবং ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কোনো বসতিকে শহর হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য কমপক্ষে ৫,০০০ জনসংখ্যা এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৫০০ জনের বসবাস থাকতে হবে। শহরে জন্ম ও মৃত্যুর বৃদ্ধির হার গ্রামের মতো উচ্চ নয়। তবে অভিবাসনের কারণে শহরের জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ২। বসতবাড়ির ধরন : শহরে সাধারণত বহুতলবিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যা অধিক। এর ফলে স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক লোকের সংস্থান হয়। প্রশস্ত রাজপথ, পার্ক, কৃত্রিম লেক প্রভৃতি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। জীবন ধারণের জন্য আধুনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন— বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ পাওয়া যায়। সস্তা ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।
- ৩। পরিবহন ব্যবস্থা : নগরে যাতায়াতের জন্য অধিকসংখ্যক রাস্তা গড়ে উঠে। ফলে মানুষ সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারে।
- ৪। পরিবার : পরিবার হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শহর জীবনে সচরাচর একক পরিবার কাঠামো লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের পেশা ও শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে শহরের লোকেরা প্রায় অবসরহীন জীবনযাপন করে। ফলে তারা নিজ নিজ পরিমত্তের লোকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না।
- ৫। চালচলন : শহর জীবনে গতিময়তা খুব প্রবল। বিভিন্ন প্রকার পেশা গ্রহণের সুযোগ থাকায় শহরের মানুষ অনেক সময় পেশা পরিবর্তন করে উন্নততর সুযোগ সুবিধা গ্রহণে ব্রতী হয়। এখানে আয় দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে গ্রামের মানুষ স্বভাবত রক্ষণশীল। সনাতন সামাজিক রীতির প্রতি গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধাশীল থাকে। গ্রামে মানুষের সামাজিক অবস্থা জনসূত্রে নির্ধারিত হয়।
- ৬। খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ : নগর মানুষের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শহরের মানুষ পোশাক পরিচ্ছদে আধুনিক ফ্যাশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।
- ৭। অর্থনীতি : শহরের মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। নগরে মানুষের পেশা বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা প্রধানত শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন ও সেবা প্রভৃতি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত থাকে।
- ৮। সেবা সুবিধা : নগর জীবনে মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকার সেবা সুবিধা, যেমন— বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে গড়ে উঠে।

৯। শিক্ষা ও চিকিৎসা : নগরে মানুষ শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি নগরে গড়ে উঠে।

১০। বিনোদন ব্যবস্থা : নগরে কর্মকাণ্ড মানুষের চিন্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা থাকে। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলা প্রভৃতি বিনোদনমূলক কার্যকলাপ নগর জীবনের মানুষকে প্রভাবিত করে।

১১। অপরাধ বৃষ্টি : নগরে অপরাধের ঘটনা বেশি পরিলক্ষিত হয়, যেমন— চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ও মারামারি ইত্যাদি। এসব ঘটনা শহরের নাগরিক জীবনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে।

১২। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন : নগরে নাগরিক সংগঠনগুলো খুব সক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড শহর থেকেই পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও লোক ঐতিহ্যের মেলার আয়োজন করে থাকে। যা নগর জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।

কাজ : তোমার দেখা নগরায়নের ফলে সৃষ্টি সুবিধা ও অসুবিধা লিপিবদ্ধ কর।

অপরিকল্পিত নগরায়ণে সৃষ্টি সমস্যা (Problems of unplanned urbanization)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশের উপর নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ শিল্পোন্নত নয়। তবে শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। নগর প্রক্রিয়াও বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে সব নগরের বৃদ্ধি সমানভাবে হচ্ছে না। বড় নগরের বৃদ্ধির গতি ব্যাপক। কেননা সেখানে শিল্পকারখানা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সরকারি প্রশাসন ও সার্ভিস সেক্টর প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শহরে বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে যদিও শহরবাসীর সংখ্যা বাংলাদেশে কম কিন্তু বর্তমান সময়ে এ হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিবেশগত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি কমে যাওয়া, খাবার পানি ও উপযুক্ত পয়ঃনিকাশনের সংকট, বর্জ্য অপসারণ সমস্যা, পরিবহন ও যানজট সংকট, বাসস্থানের অভাব ও বন্তির সৃষ্টি, পানি, বায়ু, মাটি ও শব্দ দূষণ, খোলা জায়গা ও বিনোদন ব্যবস্থার অভাব।

বাংলাদেশে জনপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র 0.05 একর। শহরগুলো সাধারণত ভালো উর্বরা শক্তি জমির উপর গড়ে উঠে এবং ক্রমেই কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত এক একটি শহরে প্রতিদিন $1,37,36,263$ গ্যালন পানি প্রয়োজন। একমাত্র ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে প্রতিদিন 28.5 কোটি গ্যালন পানি প্রয়োজন। ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহের ক্ষমতা 18 কোটি গ্যালন এবং এর মধ্যে অপচয় ও অপব্যবহার সাড়ে তিনি কোটি গ্যালন। যার কারণে মোট ঘাটতি প্রায় 15 কোটি গ্যালনের উপর। শুক মৌসুমে শহরে পানি সংকট বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য একজন মানুষের গড়ে দৈনিক 7 গ্যালন পানি প্রয়োজন, কিন্তু দেশের শহরবাসী গড়পড়তা এর অর্ধেকও 20 পানি পায় না।

ঢাকা ওয়াসা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি চাদনীঘাট থেকে আহরণ করে পরিশোধন ও বিতরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে মেঘনা ও যমুনা নদীর পানির ব্যবহার জরুরি। ঢাকা শহরে দিনে গড়পড়তা ৯০০ টন বর্জ্য শহরের নিচু খোলা জায়গায় ফেলা হয়। এসব বর্জ্যের তীব্র দুর্গম্ব ও চোয়ানি ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিকে দূষিত করে থাকে। অনেক বস্তি এলাকার লোকজন এসব পানি ব্যবহার করে থাকে, যার কারণে চর্ম রোগসহ কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোর অবস্থা একই।

ক্রমবর্ধমান যানবাহন প্রতিটি নগরে লক্ষ্যীয়। যানবাহনের ধোয়ার সঙ্গে অবাধে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সীসা, অ্যাসবেস্টস, পারদ, নিকেল, সালফার ডাইঅ্যাহাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ ভেসে বেড়ায়। যার কারণে হাঁপানি, সর্দি, কাশি ও অন্যান্য এলার্জিজনিত রোগের মাত্রা বেড়ে যায়।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ বাসস্থানের তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। গ্রাম থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের আগমনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বস্তি। যার কারণে সৃষ্টি হয় দূষিত পরিবেশ এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাপক এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান, চিন্তবিনোদন ব্যবস্থা, সহজলভ্য জ্বালানি, হাটবাজার ইত্যাদি নগরায়ণের আবশ্যিকীয় উপাদান। ক্রমবর্ধমান নগরবাসীর জন্য তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে এসবের ব্যবস্থা করা দুর্ভ ব্যাপার। তাছাড়া পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থাপনা ও দুর্বল অর্থনীতির কারণে পরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে তোলা আরও কঠিন। যার ফলে ঘটে থাকে ব্যাপক পরিবেশ অবক্ষয়।

কাজ : অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে কী কী নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে এর তালিকা তৈরি কর (দলভিত্তিক)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মধ্যপ্রর বনে কোন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে?

- | | |
|--------------|---------------|
| (ক) পুঁজীভূত | (খ) বিক্ষিপ্ত |
| (গ) সংঘবন্ধ | (ঘ) রৈখিক |

২। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোগনের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?

- | | |
|-------------------|------------------|
| (ক) বসতি স্থাপন | (খ) পরিবার গঠন |
| (গ) পেশা নির্বাচন | (ঘ) শিক্ষা গ্রহণ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও :

সাদিয়া এমন একটি জায়গায় বসবাস করে যেখান থেকে সহজেই বাংলাদেশের সব জায়গায় যাতায়াত করা যায়। বর্তমানে এলাকাটিতে রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে প্রশস্ত সড়ক, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা আছে।

৩। সাদিয়ার এলাকাটির প্রকৃতি কিরূপ?

- | | |
|--------------|-------------|
| (ক) পাহাড়ি | (খ) সমভূমি |
| (গ) নদীর তীর | (ঘ) বনাঞ্চল |

৪। সাদিয়ার এলাকায় কোন পর্যায়ের সুবিধা রয়েছে?

- i. নাগরিক সুবিধা
- ii. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা
- iii. কর্মকাণ্ডের সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

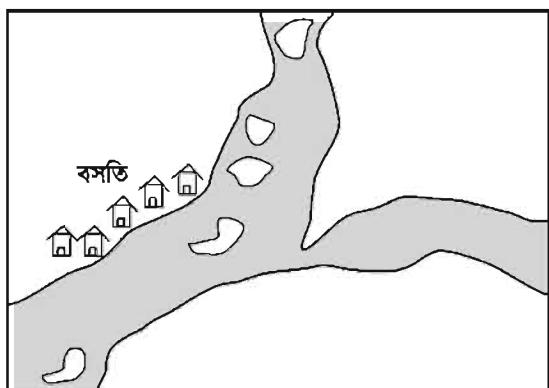
- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। বাদল ও শুভ দুজনেই শহরে বাস করে। তবে শুভের শহরটি একটি প্রশাসনিক শহর। অন্যদিকে বাদলের শহরে বাস করে সেটি আগে গ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে সেখানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা এখন শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

- ক. কোন সভ্যতায় নগরায়ণের প্রসার ঘটে?
- খ. মাটি কীভাবে বসতি স্থাপনে সহায়তা করে?
- গ. বাদলের শহরটি গড়ে উঠার পিছনে ইপিজেড-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শুভের শহরটি বাদলের শহর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২।



চিত্র ১



চিত্র ২

- ক. আমীগ বসতি কাকে বলে ?
- খ. বসতি কীভাবে গড়ে উঠে ?
- গ. ১ নম্বর চিত্রে বসতি গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ২ নম্বর চিত্রের বসতির গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

নথি অধ্যায়

সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যবলি

Resources and Economic Activities

মানুষের প্রাচ্যাধিক চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদ ধর্মোজন এবং এটি অর্থনৈতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সম্পদের ব্যবহারের ভিত্তিতে পৃষ্ঠীয় বিভিন্ন দেশের মানুষ কোম কোম ধর্মোজন অর্থনৈতিক কার্যবলির সঙ্গে জড়িত তা জানা যাবে। আর এ থেকে জানা যাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ কী ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে। আর শিল গড়ে উঠা কেবল কোম নিয়ামকের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন পদ্ধের আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা কেন হয়, তা আমরা জানতে পারব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আসুন—

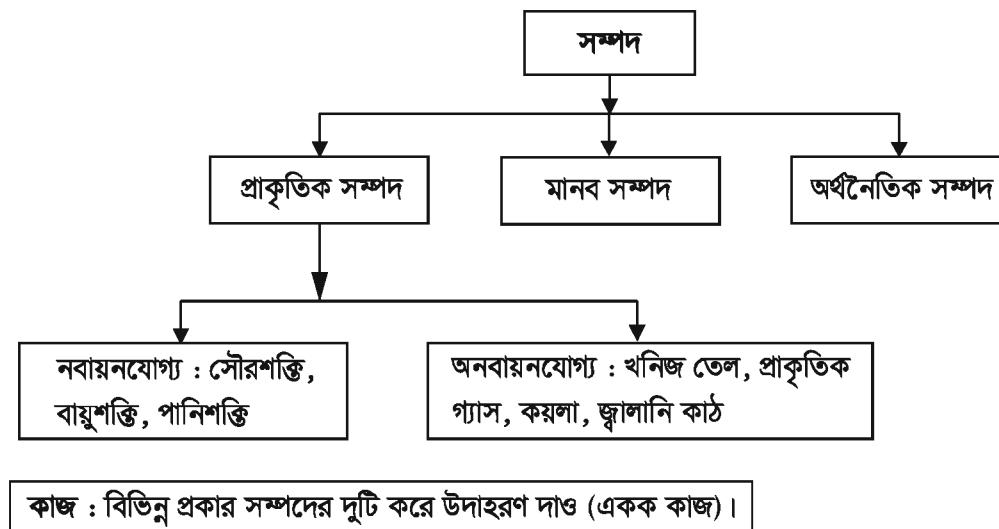
- সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সম্পদের প্রেপিবিন্যাস করতে পারব।
- সম্পদ সম্রক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সম্পদ সম্রক্ষণে যত্নবান হবো এবং অন্যকেও সম্পদ সম্রক্ষণ করতে উৎসাহিত করব।
- অর্থনৈতিক কার্যবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অনুমত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিল গড়ে উঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিলের প্রেপিবিন্যাস ও অবস্থানগত কানুন বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আমদানি ও রপ্তানি বাসিঙ্গ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্রক্ষ বিশ্লেষণ করতে পারব।

সম্পদের ধারণা (Concept of resources)

যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ। পেট্রোলিয়াম (খনিজ তেল)-এর ব্যবহার ও উত্তোলন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। অবস্থানগত কারণে কোনো ভূমির মূল্য কমবেশি হয়। তেমনি ব্যবহার জ্ঞানের পর অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। এভাবেই কোনো বস্তু মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। এক কথায় বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of resources)

সম্পদকে প্রাথমিকভাবে তিনি তাগে তাগ করা যায়— (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) মানব সম্পদ ও (৩) অর্থনৈতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার তিনি তাগে তাগ করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অনবায়নযোগ্য সম্পদ খুব ধীর গতিতে সৃষ্টি হয় এবং তাদের সরবরাহের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অনেক সম্পদ আছে যেগুলো সময়ের উত্তরণে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না, যেমন— কয়লার মজুদ অথবা আকরিক ধাতু। আবার অনেক সম্পদ সময়ের উত্তরণে ধ্বন্দ্বপ্রাণ হয়, যেমন—চোয়ানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ হ্রাসপ্রাণ হয়। নবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে বোঝাবে সেই জাতীয় সম্পদ, যা মূলত পুনঃসংগঠনশীল, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা হয়।



সম্পদ সংরক্ষণের উপায় (Conservation of resources)

সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ প্রাকৃতিক সম্পদের এমন ব্যবহার, যাতে ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সর্বাধিক মজলি নিশ্চিত করতে সহায় করে। সংরক্ষণ ধারণার অপর নাম জীবনাচরণ। শিক্ষা, মানবিক বৃদ্ধি, সত্যাচরণ, ন্যায়বিধান, সত্যানুসন্ধান, কর্তব্যপরায়ণতা বা প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার অপর নাম সংরক্ষণ। অর্থনীতিবিদদের মতে, সম্পদ অসীম নয়, সসীম। তাই সম্পদ ব্যবহারের উক্তম ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। উক্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি

সম্ভবপর। পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনাই উন্নত ব্যবস্থাপনা। অনবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারে, যেমন— তেল পোড়ানো। কিন্তু নবায়নযোগ্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ এবং পানিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তুকে রিসাইক্লিং করে পুনরায় সম্পদরূপে ব্যবহার করা যায়, এতে সম্পদের অপচয় কম হয়। আবর্জনা থেকে তেল উৎপাদন করে আবর্জনা বহনকারী গাড়ি চলছে।

সৌর এবং মহাজাগতিক বিকিরণ ব্যতীত পৃথিবী একটি ক্লোজ সিস্টেম, তাই সম্পদের বাছাইকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ একের পরিবর্তে অন্যটির গুরুত্ব অনুধাবনে সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অজৈব সারের প্রয়োগে প্রাথমিকভাবে ফলন বাঢ়লেও, পরবর্তীতে অধিক সারের প্রয়োগে জমির ক্ষতি সাধিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে জৈবিক সারের বৃদ্ধি সাধনের ব্যাপারটি চিন্তা করা যায়। কৃষি মৃত্তিকা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন— সোপান চাষ, শস্য আবর্তন। এছাড়া অকৃষি অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে সংরক্ষণ করা যায়। তাই বাংলাদেশের ভূমি, পানি, বিভিন্ন খনিজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সকলকে সচেতন হওয়া উচিত এবং এগুলোর অপচয় রোধ করা গেলে আমাদের সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে (3R : Reduse, Reuse, Recycle) সম্পদ সংরক্ষণে সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, সম্পদের পুনব্যবহার ও সম্পদের পুনর্বায়ন এই তিনি পদ্ধতির ব্যবহার জরুরি।

কাজ : সম্পদের অপচয় কীভাবে রোধ করা যায় (দলীয় কাজ) ?

অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Economic activities)

পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিয়ন এবং ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো মানবীয় আচরণের প্রকাশই অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থনৈতিক কার্যাবলি তিনি ভাগে বিভক্ত : প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Primary economic activities) : প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে, প্রকৃতি এই বীজকে অঙ্গুলিত করে শস্যে পরিণত করে। প্রকৃতির এই অবদান মানুষ প্রৱক্ষারস্বরূপ গ্রহণ করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশুপালন, খনিজ উৎপাদন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Secondary economic activities) : দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। খনিজ লোহ আকরিক উৎপাদন করে তা থেকে লোহাশলাকা, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়। রন্ধনকার্য থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ (Manufacturing) সকল প্রকার কার্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Tertiary economic activities) : তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্ভৃতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভবপর হতে পারে ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদির মাধ্যমে। পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, এজেন্ট, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত, রিকশাচালক ও টেলাগড়িওয়ালা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কার্যাবলি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

কাজ : দোকানদার, কামার, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী, নার্স-এর অর্থনৈতিক কার্যকে নিচের ছকে উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)।

প্রথম পর্যায়	দ্বিতীয় পর্যায়	তৃতীয় পর্যায়

অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (The economic activities of undeveloped, developing and developed countries)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর বিশ্বকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিনি ভাগে ভাগ করা যায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, যেমন— বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, কঙ্গোডিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া ইত্যাদি দেশ। এসব দেশের লোকজন কৃষিকার্য, মৎস্য শিকার, পশুপালন, কাঠ আহরণ ও কায়িক শুমে নিয়োজিত আছে। আর উন্নত বিশ্বের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের শতকরা ৮০ ভাগের উপরে মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। যেমন— কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্স, ব্যবসা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতি, গবেষণা ও জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। এসব দেশে শিক্ষার হার, জীবন্যাত্ত্বার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক (The factors of industrial development)

শিল্প প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো হলো— (১) জলবায়ু, (২) শক্তি সম্পদের সামিধ্য, (৩) কাঁচামালের সামিধ্য এবং অর্থনৈতিক নিয়ামকগুলো হলো— (৪) মূলধন, (৫) শ্রমিক সরবরাহ, (৬) বাজারের সামিধ্য, (৭) সুস্থ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, (৮) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, (৯) সরকারি বিনিয়োগ নীতি, (১০) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ (Natural factors)

(১) জলবায়ু : জলবায়ু বলতে এখানে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জলীয়বাস্প ও আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রভাবকে বোঝানো হয়েছে। অধিক তাপমাত্রার কারণে উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোতে কলকারখানা গড়ে তোলা কঠিন, কারণ কারখানার শ্রমিকরা অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এতে পর্যবেক্ষণ উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অথচ নাতিশীতোষ্মমণ্ডলীয় ও শীতপ্রধান দেশগুলোতে কলকারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে। বস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন হয়, যদিও কৃত্রিম উপায়ে এখন কারখানার ভিতরে আর্দ্রতার ব্যবস্থা করা যায়। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে শিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

পরোক্ষভাবেও জলবায়ুর উপর শিল্পের অবস্থান নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে নানা ধরনের কাঁচামাল জন্মে থাকে। যেমন— বাংলাদেশের জলবায়ুতে পাট ভালো জন্মে বলে বলু পাটকল গড়ে উঠেছে। খুননার নিউজপ্রিস্ট কারখানা সুন্দরবনের সুন্দরি কাঠের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

(২) শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য : শক্তি সম্পদের উপরও শিল্পের অবস্থান নির্ভরশীল। কারণ কারখানা চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানা চালানোর জন্য কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্তায় শক্তি সম্পদ ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সাধারণত বিভিন্ন প্রকার শিল্প ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

(৩) কাঁচামালের সান্নিধ্য : শিল্পকারখানার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন। তাই যে স্থানে কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই স্থানে বা এর নিকটে শিল্প গড়ে উঠে। যেমন— বাংলাদেশের রাঙামাটির চন্দেশোনায় বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সেখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ (Economic factors)

(৪) মূলধন : শিল্প স্থাপনে মূলধনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ভূমি ও কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের বেতন এবং পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যে সকল স্থানে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে সেখানেই শিল্প গড়ে উঠে। কোনো দেশে মূলধনের অভাব হলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

(৫) শ্রমিক সরবরাহ : কারখানায় কাজ করার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বলে ঐ সকল দেশে অধিক শিল্প গড়ে উঠে। কোনো কোনো শিল্পের জন্য প্রচুর সুদক্ষ অথচ সন্তায় শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং পাট শিল্প এই জাতীয় শিল্প।

(৬) বাজারের সান্নিধ্য : শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উপযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন বাজারের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত বাজার পাওয়া না গেলে শিল্পের টিকে থাকা দুরুহ হয়ে পড়ে। এজন্য বাজারের নিকটবর্তী স্থানে শিল্প সাধারণত গড়ে উঠে। যে অঞ্চলে জনবসতি ঘন, সেই অঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বেশি।

(৭) সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা : শিল্প স্থাপনের জন্য ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। যে দেশে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথ যত উন্নত, সেই দেশে অধিকসংখ্যক শিল্প গড়ে উঠেছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো বলেই বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে।

(৮) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার : শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত কোনো দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এজন্য জাপানের পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী।

(৯) সরকারি বিনিয়োগ নীতি : শিল্পে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কোনো দেশের সরকারকে প্রশংসনামূলক কিছু নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোনো দেশের ঘোষিত বিনিয়োগ নীতি বিনিয়োগকারীদের যত অনুকূল হয়, শিল্প স্থাপনের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়।

(১০) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম নিয়ামক। পৃথিবীর যে দেশসমূহে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, সেই দেশসমূহে শিল্প স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে দেশের অর্থনীতি মজবুত হয়।

শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Industries)

খনিজ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও বনজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়ে উঠে। সাধারণত শিল্পের আকার অনুসারে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) ক্ষুদ্র শিল্প, (২) মাঝারি শিল্প, (৩) বৃহৎ শিল্প।

(১) ক্ষুদ্র শিল্প : যে শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ শিল্পে শ্রমিক ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকে। কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়। এই ধরনের শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠে, যেমন— তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি।

(২) মাঝারি শিল্প : যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে মাঝারি শিল্প বলে। যেমন— চামড়া শিল্প ও তৈরি পোশাক শিল্প ইত্যাদি।

(৩) বৃহৎ শিল্প : এই শিল্পে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়, যেমন— লোহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত শিল্প, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিমান শিল্প প্রভৃতি। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই শিল্প সাধারণত শহরের কাছাকাছি স্থানে গড়ে উঠে।

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য (Import and export trade)

পৃথিবীর কোনো দেশই সকল সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি এবং উদ্ভৃত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে থাকে। আর এটাকেই আমরা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বলে থাকি। যেমন— জাপান লোহ ও ইস্পাতের তৈরি ভারী যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্সসামগ্রী, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিভিন্ন শিল্পব্যবস্য রপ্তানি করে এবং এ দেশ বিভিন্ন দেশ থেকে লোহা ও কয়লা আমদানি করে। বাংলাদেশ চাল, গম, তোজ্যতেল, সুতা, পেট্রোলিয়াম শিল্পসামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আমদানি এবং তৈরি পোশাক, কৃষিজাত পণ্য, চা, চামড়া, সিরামিকসামগ্রী, জুতা, হিমায়িত খাদ্য, কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদি রপ্তানি করে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে।

বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক (Trade balance and development of relationship)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সমান নয়। অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে উন্নয়ন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যবধান কর্মতে পারে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ এই সব দেশ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। এটাকে বাণিজ্য ঘাটতি বলে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সাথেও বাণিজ্যে উদ্ভৃত অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির অনুপাতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বিদ্যমান (সারণি ১)।

সারণি ১ : বাংলাদেশের গত ৬ বছরের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা

বছর	আমদানি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ব্যয় বেশি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৩	৩৩৫৭৬.০	২৭০২৭.৮	৬,৫৪৩.৬
২০১৪	৩৬৫৭১.০	৩০১৭৬.৮	৬,৩৯৪.২
২০১৫	৪০৬৮৫.০	৩১২০৮.৯	৯,৪৭৬.১
২০১৬	৩৯৭১৫.০	৩৪২৫৭.২	৫,৪৫৭.৮
২০১৭	৪৩৪৯১.০	৩৪৬৫৫.৯	৮,৮৩৫.১
২০১৮	৫৪৪৬৩.২	৩৬৬৬৮.২	১৭,৭৯৫.০

উৎস : ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনি পণ্য কোনটি?

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| (ক) ভোজ্যতেল | (খ) পোশাক |
| (গ) পেট্রোলিয়াম পদার্থ | (ঘ) ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি |

২। কীভাবে নবায়নযোগ্য সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়?

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| (ক) উভয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে | (খ) সংরক্ষণের মাধ্যমে |
| (গ) কর্তব্যপরায়ণ হয়ে | (ঘ) জীবনাচরণের মাধ্যমে |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তুহিন যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করে তার বিপুল শ্রমিকের সংখ্যা, বিশাল মূলধন ও ব্যাপক অবকাঠামো রয়েছে।

৩। তুহিন কোন শিল্পকারখানায় কাজ করে?

- | | |
|----------------------|----------------|
| (ক) সাইকেল | (খ) বৃহৎ শিল্প |
| (গ) টেলিভিশন কারখানা | (ঘ) মোটরগাড়ি |

৪। এই ধরনের শিল্পের অবস্থান হয়ে থাকে—

- i. শহরের পাশে
- ii. শহরের কাছাকাছি
- iii. শহরের ভিতর

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার অদূরে ডেমরা থেকে নারায়ণগঞ্জ শহর পর্যন্ত শীতলক্ষ্য নদীর তীর থেঁথে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ইপিজেড, জুটমিলস্, কটনমিলস্ উল্লেখযোগ্য।

- ক. কৃষিকাজ কোন ধরনের কর্মকাণ্ড?
- খ. বাণিজ্য ঘাটতি বলতে কী বোঝায়?

- গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত শিল্পগুলো কোন শ্রেণির ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত অঞ্চলে শিল্প গড়ে উঠার প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ কর।
- ২। আবেদ এবং শাহেদ দুই বন্ধু। আবেদ বেড়িবাঁধ এলাকায় ৮০টি বিদেশি গ্রু নিয়ে একটি দুশ্ম খামার তৈরি করেছে। অপরদিকে শাহেদ আশুলিয়ায় একটি পোশাক শিল্পকারখানা তৈরি করে, যার পোশাকের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
- ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কত প্রকার?
- খ. বাণিজ্যিক ভারসাম্যতা বলতে কী বোঝায়?
- গ. আবেদের খামারটি কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শাহেদের শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ক্রিয়প ভূমিকা পালন করে উন্নরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

Geographical Description of Bangladesh

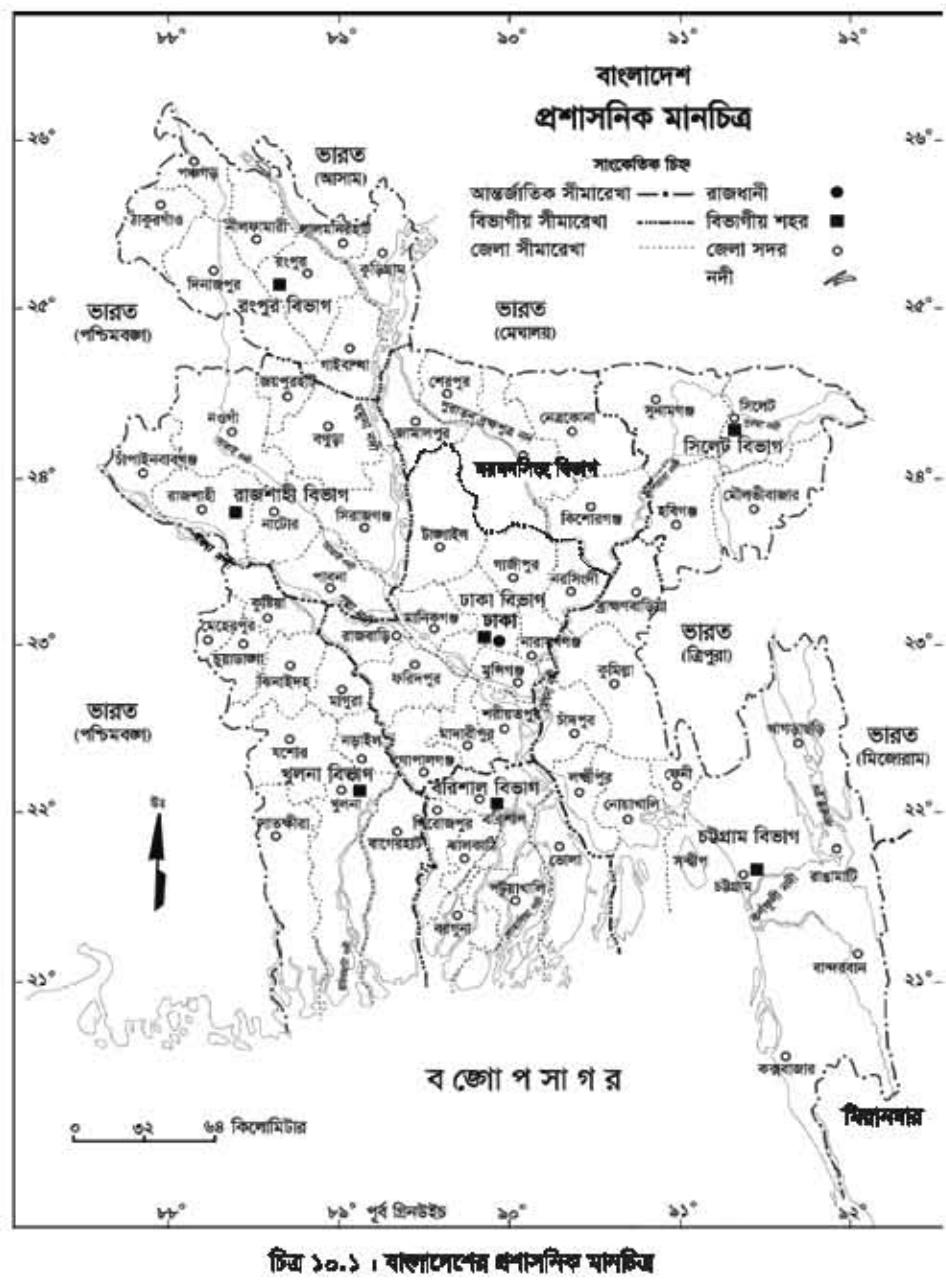
বাংলাদেশ সাক্ষিগ প্রশিক্ষার একটি স্থান রাখ্য। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ক্রটিকাণ্ড জেলা ও দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অঙ্গীকৃত করেছে। ধৰ্মানন্দ বিভিন্ন ধরনের কৃষকতা, অনেক নদ-নদী, বঙ্গোপসাগরের অবস্থান, খন্তিতিক পরিবর্তিত জলবায়ু নানান বৈশিষ্ট্য আনন্দন করেছে।



এ অধ্যায়ে পাঠ শেখে আসলো—

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৃষকতা বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের ধৰ্মানন্দ নদ-নদী, উপনদী এবং শাখানদী সমূক্ষে বর্ণনা দিতে পারব।
- বাংলাদেশের নদী ও জলাশয় ভরাটের মানবসূক্ষ্ম করণ, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- নদী ও জলাশয় ভরাটের অভিকর প্রভাব সমূক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, খন্তিতিক তাপমাত্রা, বাহুপ্রবাহ ও বৃক্ষিপাত সমূক্ষে বর্ণনা দিতে পারব।
- মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালৈবেশালী সমূক্ষে বর্ণনা করতে পারব।
- কালৈবেশালী বাঢ় ও বন্ধুগাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবস্থন করব, অন্যাকেও এ ব্যাপারে সচেতন করব।

বাংলাদেশের অবস্থা : এশিয়া মহাদেশের সক্ষিপ্তাখনে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ দেশ $20^{\circ}34'$ উত্তর অক্ষাংশ থেকে $26^{\circ}38'$ উত্তর অক্ষাংশের ঘട্টে এবং $88^{\circ}01'$ পূর্ব মুদ্রিমাংশে থেকে $92^{\circ}41'$ পূর্ব মুদ্রিমাংশের ঘট্টে অবস্থিত। বাংলাদেশের সামাজিক জ্ঞান দিয়ে কক্ষিকান্তি রেখা অঙ্কিত করেছে।



আয়তন (Area) : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডে ১০,০৪১.২৫ একর জমি যোগ হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বৃত্তান্তে ১৯৯৬-৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গকিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।

মিয়ানমার ও ভারতের দাবিকৃত সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে বাংলাদেশ পেত ৫০,০০০ বর্গকিলোমিটারের কম জলসীমা। বঙ্গোপসাগরের জলসীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে মিয়ানমারের বিপক্ষে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইবুনালে এবং ভারতের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত সালিশ ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গত ১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের ন্যায্যতত্ত্বিক দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় পায়। এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ প্রায় এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জলসীমা পেয়েছে। এ রায়ের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপকে উপকূলীয় বেজলাইন ধরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয়ীন সমুদ্র এলাকা (Territorial sea) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive economic zone) পেয়েছে। প্রাণ্ত এই জলরাশি ও তলদেশে এবং তার বাইরে মহীসোপান এলাকার সকল খনিজ সম্পদে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এই হিসেবে উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সাগরের তলদেশে বাংলাদেশের মহীসোপান রয়েছে (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)। অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যার ভৌগোলিক নাম মহীসোপান।

সীমা : বাংলাদেশের উভয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪,৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার (চিত্র ১০.১)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী ভারত ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত।

কাজ : নিচের ছকটি জোড়া দলে পূরণ কর।

বাংলাদেশের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান কত?	বাংলাদেশের আয়তন কত?	অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চলের ব্যাস্তি কত?	টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমার ব্যাস্তি কত?	বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?	সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের কোন অংশ পর্যন্ত?

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি (Physiography of Bangladesh)

ভূপ্রকৃতি দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূপ্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম।

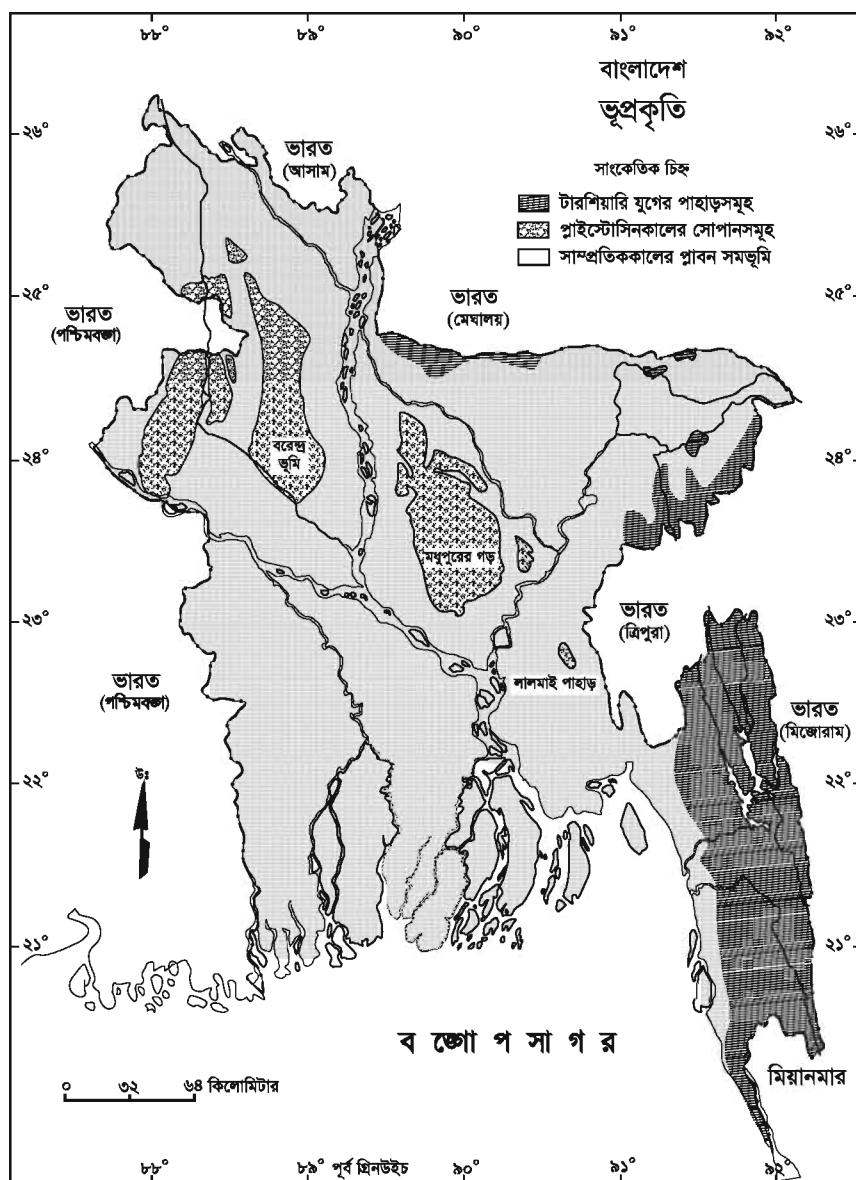
বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। গঙ্গা নদী পশ্চিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ উত্তর, সুৱমা ও কুশিয়ারা নদী উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে সুবিশাল দ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

স্থায়ী বসবাসের জন্য সমভূমিই আদর্শ। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

- ১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- ২। প্লাইস্টোসিনিকালের সোপানসমূহ
- ৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

নিচে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ১০.২)।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উথিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় নামে খ্যাত। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— (ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।



চিত্র ১০.২ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাঞ্চল এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বের এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। ১,২৩০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শৃঙ্গ কিপুরাড় এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সাম্প্রতিককালে বান্দরবানে আরও একটি শৃঙ্গ আবিস্কৃত হয়েছে। এর নাম তাজিনড় (বিজয়) এবং উচ্চতা ১,২৮০ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার উত্তরাঞ্চল, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪

মিটারের বেশি নয়। উভরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

২। **প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ :** আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। উভর-পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো।

(ক) **বরেন্দ্রভূমি :** দেশের উভর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

(খ) **মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় :** টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

(গ) **লালমাই পাহাড় :** কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

৩। **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :** টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিহোত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমতলভূমির উপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের প্রায় বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে প্রবাহিত মাটি সংগ্রহ হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার।

এ সমভূমি বাংলাদেশের উভর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে বাকি অঞ্চলগুলো যেমন— দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি ছড়িয়ে আছে। এর কিছুসংখ্যক পরিত্যক্ত অশ্বখুরাকৃতি নদীখাত। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বিল, খিল ও হাওর বলে। এদের মধ্যে চলনবিল, মাদারিপুর বিল ও সিলেট অঞ্চলের হাওরসমূহ বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে হুদের আকার ধারণ করে। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) **রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।**

(খ) **ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের অন্তর্গত বন্যা প্লাবন সমভূমি।**

(গ) **ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি।**

(ঘ) নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কল্পবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।

(ঙ) খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দল্শ নিয়ে শ্রোতজ সমভূমি।

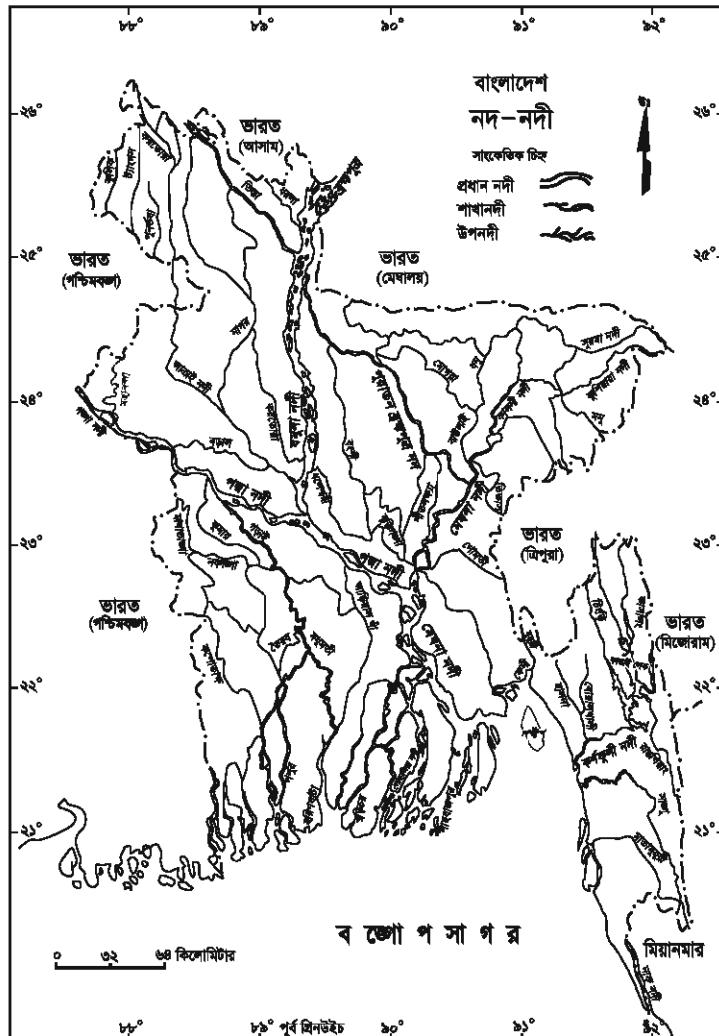
বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজ্ঞাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কাজ : দলভিত্তিক আটলাসে বাংলাদেশের মানচিত্র বের করে বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি কোন কোন জেলায় পড়েছে? তা চিহ্নিত কর এবং খাতায় লেখ।

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী (Main Rivers of Bangladesh)

বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। অধিকসংখ্যক নদী থাকার কারণে বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে। এজন্য এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উপর নদীর প্রভাব রয়েছে। পদ্মা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী। এ নদ-নদীগুলোর উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিচে বাংলাদেশের নদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ১০.৩)।

পদ্মা : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহস্পতি নদী পদ্মা। গঙ্গা নদী ইমালের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্নি লাভ করেছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। এরপর ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগীরথী (হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুটিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার মূল ধারা হওয়াতে দৌলতদিয়া পর্যন্ত এই নদীটি গঙ্গা।



চিত্র ১০.৩ : বাংলাদেশের নদ-নদী

ফর্মা নং-২০, ভূগোল ও পরিবেশ-৯ম-১০ প্রেণি

নদী নামেই পরিচিত। তবে বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকেই স্থানীয়ভাবে অনেকে একে পদ্মা নামে চেনে। গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিনি নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার। কুমার, মাথাভাঙা, তৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি পদ্মা নদীর প্রধান শাখানদী। পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও ট্যাংগন মহানদার উপনদী।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ : এ নদ হিমালয় পৰ্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবৰ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে তিক্ততের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে ও পরে আসামের তিতৰ দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর ব্ৰহ্মপুত্ৰ কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে যয়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধৱলা ও তিত্তা ব্ৰহ্মপুত্ৰের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্য প্রধান শাখানদী।

যমুনা : যয়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্ৰহ্মপুত্ৰের শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঞ্জা।

মেঘনা : আসামের বৱাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুৱাৰা ও কুশিয়াৱা নামে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুৱা পশ্চিম দিকে সিলেট, ছাতক, সুনামগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমিৱীগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুৱা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়াৱা নদী এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে কালনী, সুৱা ও কুশিয়াৱার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূৰ প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা তৈরববাজারের দক্ষিণে পুৱাতন ব্ৰহ্মপুত্ৰের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মাৱ সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল হচ্ছে ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার। মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী মেঘনার উপনদী।

কৰ্ণফুলী : আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার দীৰ্ঘ কৰ্ণফুলী নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটিৰ প্রধান নদী। কৰ্ণফুলীৰ প্রধান উপনদী কাসালৎ, হালদা এবং বোয়ালখালী। কাঞ্চাই নামক স্থানে কৰ্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে ‘কৰ্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ’ স্থাপন কৱা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্ৰবন্দর চট্টগ্রামে কৰ্ণফুলী নদীৰ তীৱে অবস্থিত।

কাজ : দণ্ডিত্বিক ছকটি পূরণ কর (সময়-১৫ মিনিট)।					
প্রধান নদ-নদী	উৎস	পতিত স্থান	গতিগথ	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা					
ব্ৰহ্মপুত্ৰ					
যমুনা					
মেঘনা					

নদী ও জলাশয় ভরাটের কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ (Causes of river and wetlands filling its impact and prevention)

বাংলাদেশে নদী ও জলাশয় ভরাটের পিছনে বহুবিধ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পলিমাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পানির সংস্পর্শে এটি সহজে দ্রবণে পরিণত হয়। বৰ্ষাকালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে এবং এর উজানে প্রতিবেশী দেশ চীন, নেপাল, মিয়ানমার ও ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৰ্ষাকালে উজান থেকে আসা খরস্ত্রোতা নদীগুলো পাহাড়ি পলি বয়ে নিয়ে আসে এবং নদীতীরে ভাঙ্গনের সূচী করে। ভাট্টিতে নদীগুলোর স্তোত্রের গতি কমে যায় তখন নদীগুলোর তলদেশে পলি সঞ্চিত হয়ে ভরাট হয় ও ক্রমে নাব্যতা হারাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নদী ও জলাশয়গুলোর দুধারে অপরিকল্পিত বাঁধ, সড়ক, কলকারখানা, আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ ও পয়ঃনিকাশনের নির্গমন স্থান হিসেবে ব্যবহার এবং নদী-জলাশয়গুলোর অপদর্থ ও ভরাটকরণের ফলে দ্রুত নদী ও জলাশয়গুলো মরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদীগুলো নিয়ে বিরোধ ও ঐগুলো থেকে পানি প্রত্যাহারের ফলে পানির খরস্ত্রোত্থারা কমে যাওয়ায় নদীর মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে চৰ জেগে উঠেছে।

নদী ও জলাশয়গুলো ভরাটের কারণে বৰ্ষাকালে পানির প্রবাহথারা বাধাগ্রস্ত এবং দুর্কুল উপচিয়ে বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। আর শুক মৌসুমে ঐগুলোতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় নৌচলাচল, সেচ ব্যবস্থা ও মাছচাষ ব্যাহত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পানির জলাধারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হওয়ায় শহরগুলোতে পানির সরবরাহ কমে যাচ্ছে ও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। বৰ্ষা ও শুক মৌসুমে নিয়মিত নদী ও জলাশয়গুলো দ্রেজিঞ্চের ব্যবস্থা করে এদের নাব্যতা রক্ষা করা, পরিকল্পিত ও পরিবেশ উপযোগীভাবে বাঁধ এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন অপদর্থগীয় নদী ও জলাশয় উদ্ধার, পাহাড়কাটা রোধ, কলকারখানার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে বর্জ্য পরিশোধন ট্রাইমেট প্ল্যান্ট নির্মাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ভারত, নেপাল ও চীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নদী গঞ্জা, তিস্তা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও ফেনীসহ অন্যান্য নদীগুলোর ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানির হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে। সামগ্ৰিক পরিবেশকে ধৰ্মসেৱ হাত থেকে রক্ষা কৰতে বিদ্যমান পরিবেশ আইন যুগোপযোগী ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন কৰা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও ভূঅভ্যন্তরৰহ পানির ব্যবহার হ্রাস করে নদীর পানির ব্যবহার বৃদ্ধি কৰতে হবে।

কাজ : নদী ও জলাশয় ভরাট কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়? দলীয়ভাবে আলোচনা করে খাতায়/পোস্টার পেপারে লেখ।

জলবায়ু (Climate)

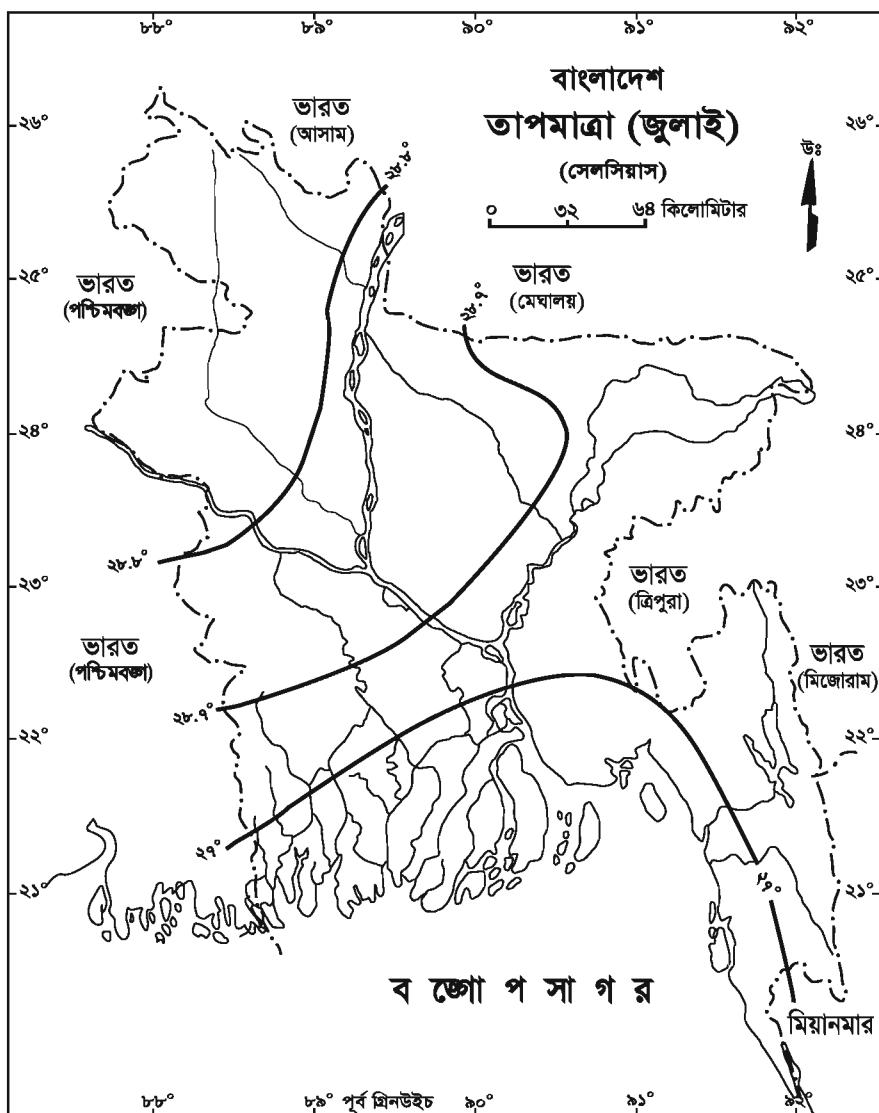
বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন। দেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খন্তুর আবর্ণা। এ বিভিন্ন খন্তুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়। কিন্তু কোনো সময়ই শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো চরমভাবাপন্ন হয় না। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 26.01° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র ১০.৪)। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি খন্তুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা— (ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল ও (গ) শীতকাল।

(ক) গ্রীষ্মকাল : বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ খন্তুতে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচে এ খন্তুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হলো।

তাপমাত্রা : বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণ খন্তু হলো গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21° সেলসিয়াস। গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28° সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল উষ্ণতম মাস, এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বৃষ্টিপাত : কালবৈশাখী বড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বড় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবলবেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। এ সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার (চিত্র ১০.৫)।

বায়ুপ্রবাহ : গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের উন্নতরায়ণের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উন্নাপের প্রভাবে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয়।



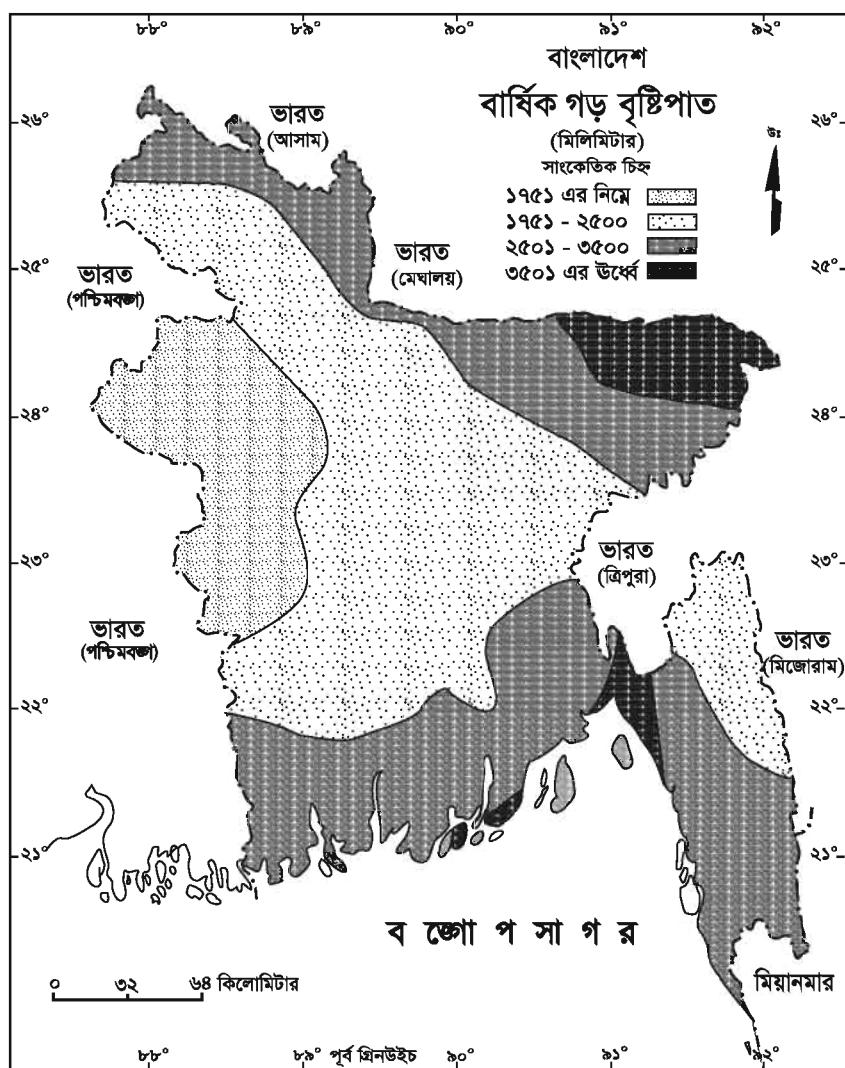
চিত্র ১০.৪ : বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

(খ) বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি বৃক্ষিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বা বর্ষা খন্তু বলে। জুন মাসের প্রথম দিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়। নিচে বর্ষা খন্তুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

তাপমাত্রা : বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকে এবং প্রচুর বৃক্ষিপাত হয়, ফলে এ সময় অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। গড় তাপমাত্রা 27° সেলসিয়াস।

বৃষ্টিপাত : বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাঞ্চি সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাঞ্চি শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়।

বায়ুপ্রবাহ : জুন মাসে বাংলাদেশের উপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়। বর্ষা শেষে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। জলীয়বাঞ্চপূর্ণ এই বায়ু হিমালয় পর্বতে (বাংলাদেশের উত্তরে) বাঁধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। শুরু হয় বর্ষাকাল।



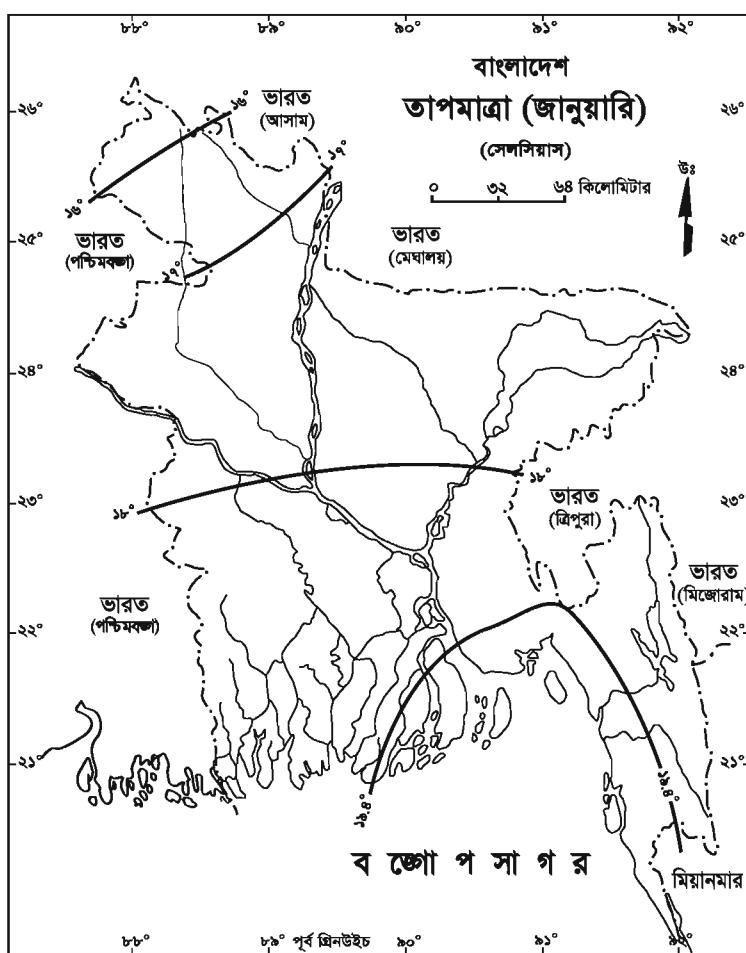
চিত্র ১০.৫ : বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

(গ) শীতকাল : সাধারণত এ দেশে নতেস্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের পর তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে (চিত্র ১০.৬)।

তাপমাত্রা : আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 29° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা 17.7° সেলসিয়াস।

শীতকালে দেশের উপকূল ভাগ থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন 1° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু এ সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শীতকালে সাধারণত উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়।



বায়ুগ্রাহ : উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্ধতা কম থাকে। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্ধতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। দেশের উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে কখনো কখনো তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশ শীত অনুভূত হয়। উত্তরের হিমালয় পেরিয়ে আসা এই বায়ুতে জলীয়বাস্প থাকে।

মৌসুমি বায়ু : মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জুন মাসের প্রারম্ভে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হলে বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে অক্টোবর

পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র মৌসুমি বায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটে এবং তখনই এখানে বর্ষাকাল। বর্ষাকালীন সময়ে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রায়ই নিম্নচাপ (Depression) বা ঘূর্ণিবাতের (Cyclone) সংযোগ থাকে। বাংসরিক বৃষ্টিপাতের চার-পঞ্চমাংশ বর্ষাকালে হয়ে থাকে। মেঘাছন্ন আকাশ ও অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বর্ষাকালে তাপমাত্রা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা কম থাকে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এপ্রিল উক্ষতম মাস। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রার বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উক্ষতা অপেক্ষা আর্দ্রতার উপর নির্ভর করেই এই দুই কালের প্রভেদ করা যায়। গ্রীষ্মকালে বায়ুর উক্ষতা সাগর থেকে দেশের অভ্যন্তর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঝড় বিদ্যুৎ এবং বজ্রসহ প্রবলবেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তীব্র গতি সম্পন্ন কালবৈশাখী ঝড় দেশের প্রচুর ক্ষতি করে। বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত কালবৈশাখীর দ্বারা সংঘটিত হয়। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত ধান, পাট ও আখ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অন্যদিকে শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু আমাদের দেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটায়। এই সময় গম ও রবিশস্য চাষ উপযোগী। প্রকৃতি প্রতাবিত কৃষিকাজই পরিবেশসম্মত ও কৃষকের জন্য লাভজনক।

কাজ : খন্তুভিত্তিক ও পরিবেশসম্মত ফসল চাষ উল্লেখ কর।		
গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

কাজ : কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।	
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
•	•
•	•
•	•
•	•

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?

- | | |
|---------------|--------------|
| (ক) গাজীপুর | (খ) টাঙ্গাইল |
| (গ) ময়মনসিংহ | (ঘ) কুমিল্লা |

২। বাংলাদেশে নদী ভরাটের কারণ-

- i. পানিতে মিশ্রিত মাটির অবক্ষেপণ
- ii. নদীর উজানে বন্দুমি ধ্বংস
- iii. নদীর ধারে পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের সারণি অবলম্বনে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অঞ্চল	গড় উচ্চতা (মিটার)	উত্তিদ
P	২৪৪	তেলসুর, বাঁশ
Q	৩০	গজারি, কড়াই
R	২১	শাল, হিজল

৩। সারণিতে প্রদর্শিত ‘P’ অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (ক) টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে | (খ) মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জে |
| (গ) রংপুর-দিনাজপুরে | (ঘ) নোয়াখালী-কুমিল্লায় |

৪। সারণিতে প্রদর্শিত ‘Q’ ও ‘R’ অঞ্চলের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে-

- i. মুক্তিকার
- ii. উত্তিদের বৈশিষ্ট্যের
- iii. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৫। বাংলাদেশে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী একত্রে কোথায় মিলিত হয়েছে?

- | | |
|---------------|---------------|
| (ক) দৌলতবাড়ি | (খ) চাঁদপুর |
| (গ) যশোর | (ঘ) কুষ্টিয়া |

৬। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?

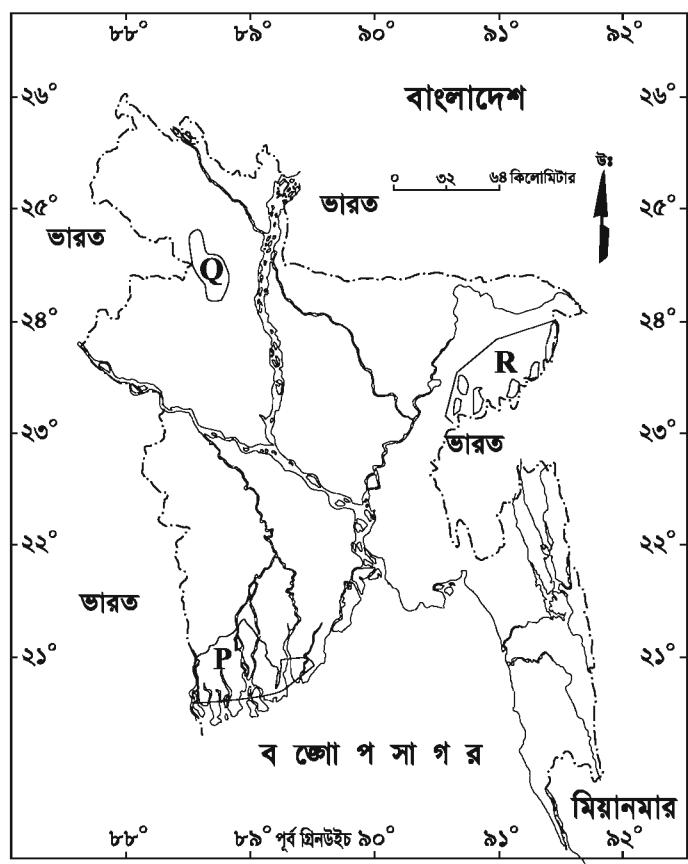
- | | |
|---------------------|---------------------|
| (ক) 26.01° | (খ) 26.09° |
| (গ) 27.01° | (ঘ) 28.09° |

৭। বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?

- | | |
|------------|-----------|
| (ক) জুলাই | (খ) জুন |
| (গ) এপ্রিল | (ঘ) মার্চ |

সূজনশীল প্রশ্ন

১।



- ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?
- খ. প্লাইস্টোসিন কালের সোপান বলতে কী বোঝায়?
- গ. মানচিত্রে ‘P’ চিহ্নিত স্থানের ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘Q’ ও ‘R’ চিহ্নিত স্থান দুটির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।
- ২। একদল শিক্ষার্থী দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা অবমগ্ন যায়। সেখানে তারা দেখতে পায় একটি নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে।
 ক. ধলেশ্বরী কোন নদীর শাখানদী?
 খ. কালবৈশাখী বড় কীভাবে সংঘটিত হয়?
 গ. শিক্ষার্থীদের দেখা নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত নদীটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

Resources and Industries of Bangladesh

একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে সম্পদ ও শিল্পের উপর। আকৃতিক সম্পদকে সংগ্রহ করে অবস্থা অন্যান্য সম্পদকে কাছে তাঁরিয়ে ধারণাবিহীন প্রযোজনীয় প্রযোজন করে ব্যবহার করা হয়। কৃষিক ও বনক সম্পদ, ধনিজ তেল, আকৃতিক গ্যাস, কয়লা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এই দেশে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যথেক অবদান রাখছে।

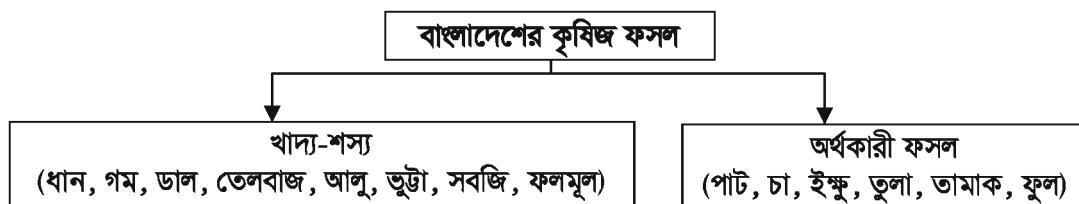


এ অধ্যায়ের পাঠ পেরে আমরা—

- বাংলাদেশের প্রধান কৃষিগৃহ ও কাদের বটিন বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বনক সম্পদ সংরক্ষণ সচেতন হবো এবং সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।
- বাংলাদেশের ধনিজ তেল, আকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কাটিন শিল্প অবস্থান মানচিত্রে ইস্রিনগুরুক বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধনিজ তেল, আকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রধান শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব এবং মানচিত্রে উপস্থিতি করতে পারব।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রসমূহ বর্ণনা করতে পারব এবং মানচিত্রে ইস্রিন করতে পারব।
- বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- পর্যটিক হিসেবে পর্যটন কেন্দ্রের সূচ পরিবেশ সম্ভাবনায় নাগরিক সাহিত্য পালন করব।

কৃষিপণ্য (Agricultural Products)

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। এ দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে ইমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি।



খাদ্য-শস্য (Food Crops)

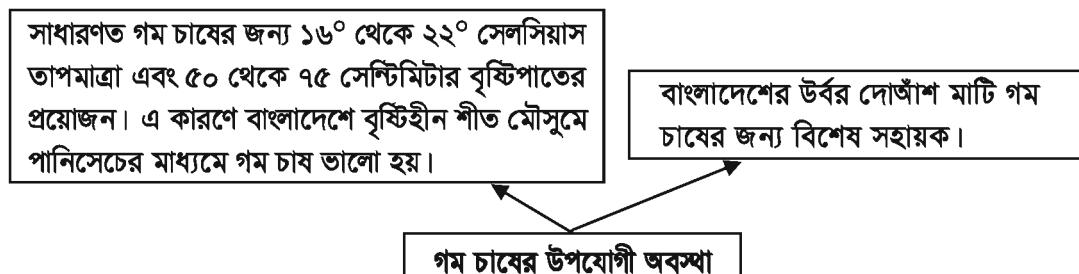
ধান (Rice)

বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। এ দেশে আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে ধান চাষ বেশি হয় (চিত্র ১১.১)। তবে রংপুরে আমন ধান ও সিলেটে বোরো ধান ভালো হয়।

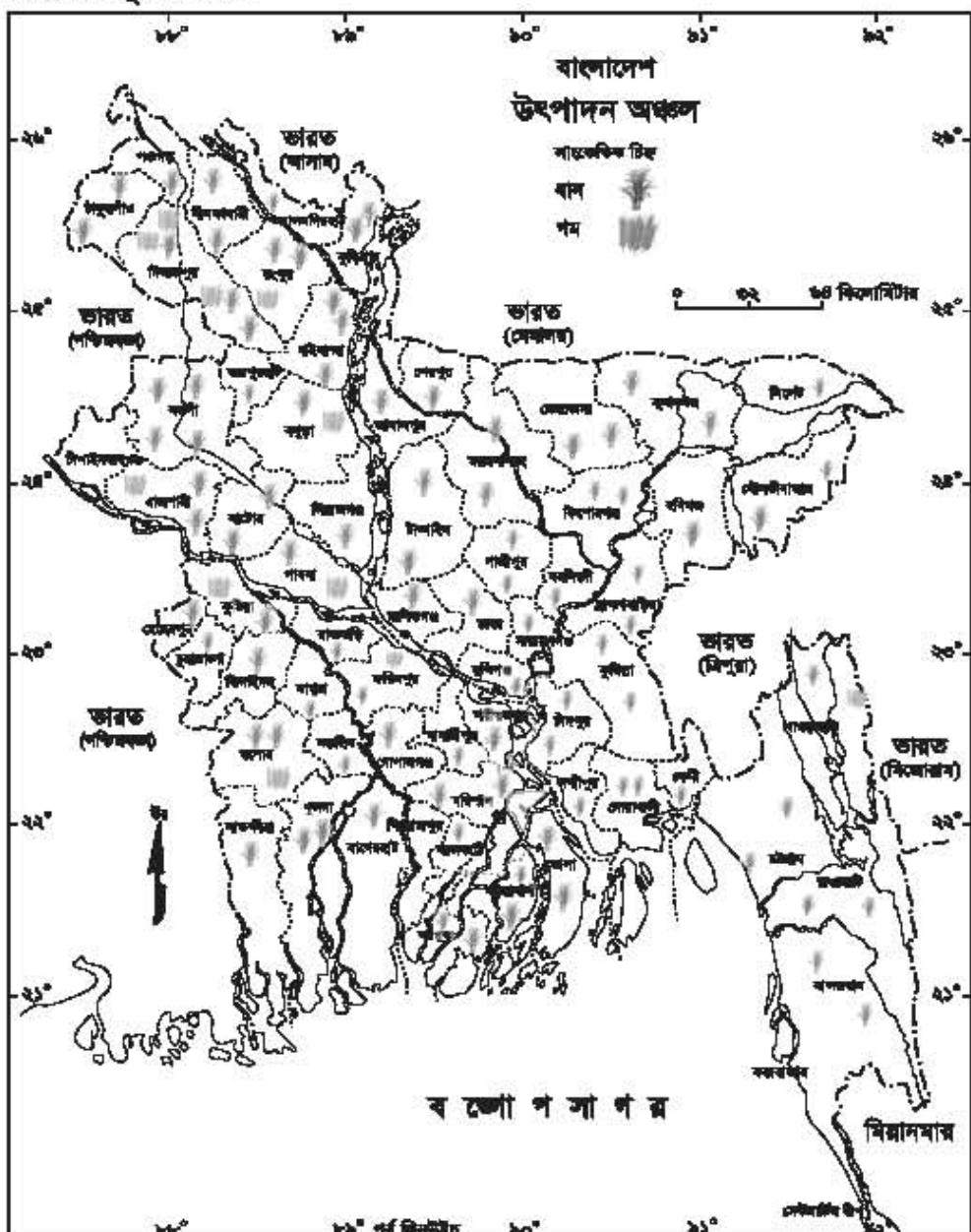


গম (Wheat)

বর্তমানে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজনীয়তায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গম চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয় (চিত্র ১১.১)।



অন্যান্য খাদ্য-শস্যের মধ্যে কেলবীজ (তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি) এবং ভাল (মসুর, মুগ, মটর, মাসকলাই, খেসারি) এবং চূটা, ঘৰ, আলু, সবজি, কলমূল প্রধান। বালাদেশে শীতকালে এসব খাদ্য-শস্য কম ব্যবহৃত চাব করা যায়। পানিসোজের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিস্তৃৎ খচ কর হয়। যদলে কৃষকের কৃবিশাল বিজয়ে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে।



চিত্র ১১.১ : বাংলাদেশের ধান ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

অর্ধকর্মী কস্তা (Cash or Commercial Crops)

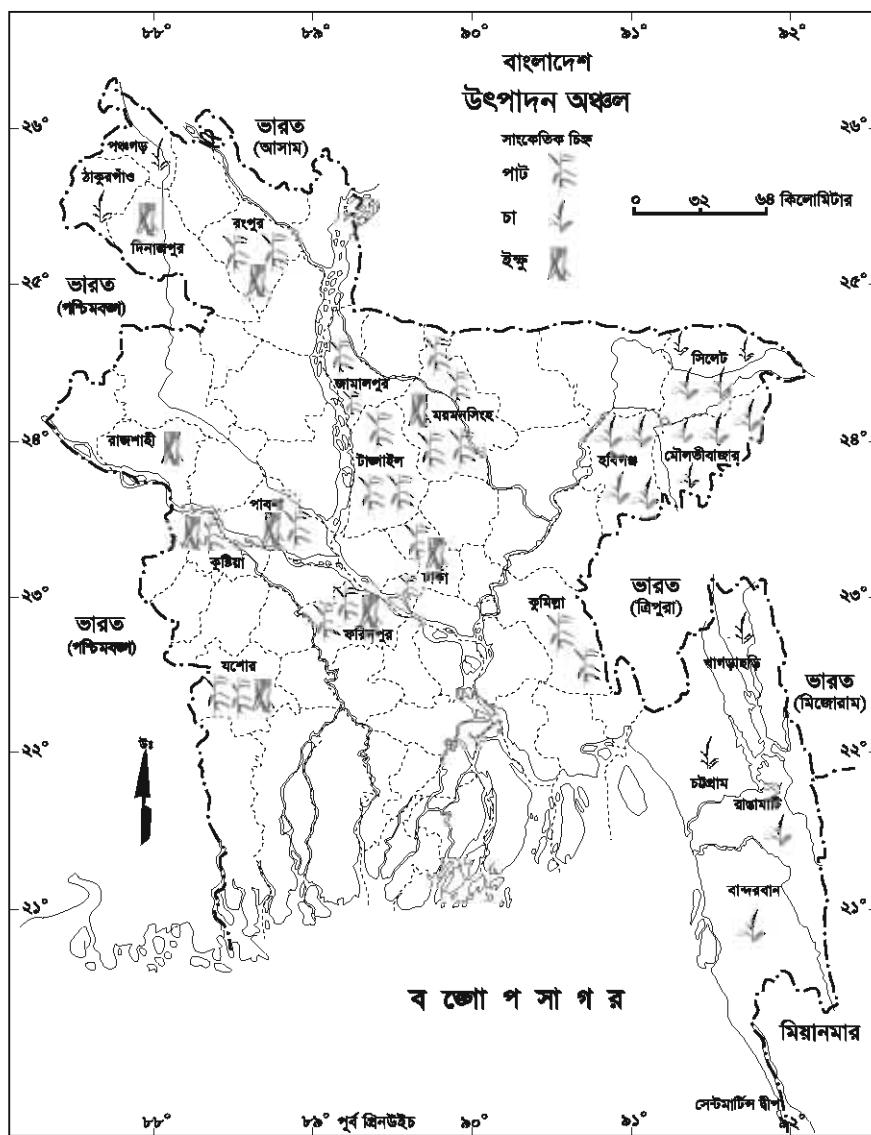
যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রির অস্ত্য চাব করা হয় তাকে অর্ধকর্মী কস্তা বলে।

পাট (Jute)

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে সাধারণত দুই প্রকার পাট চাষ হয়, দেশি এবং তোরা পাট। রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পাট চাষ ভালো হয় (চিত্র ১১.২)।

পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (20° থেকে 35° সেলসিয়াস) এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতার (১৫০ থেকে ২৫০ সেমি/মিটার) প্রয়োজন হয়।	নদীর অববাহিকায় পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক।
--	--

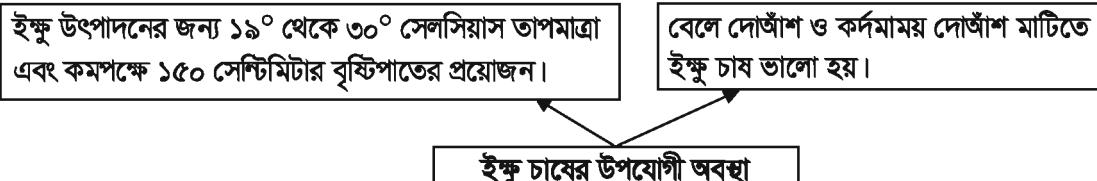
পাট চাষের উপযোগী অঞ্চল



চিত্র ১১.২ : বাংলাদেশের পাট, চা ও ইকু উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

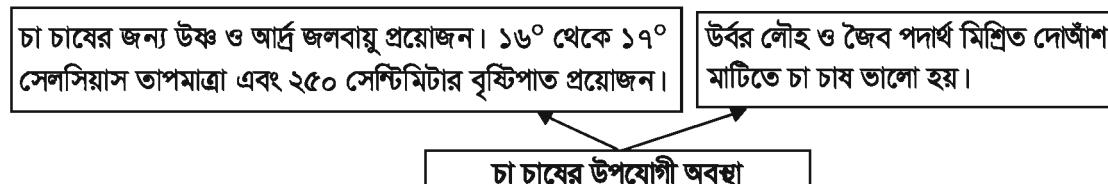
ইক্সু (Sugarcane)

চিনি, গুড় উৎপাদনের জন্য ইক্সু বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইক্সু চাষের জন্য সমতলভূমি প্রয়োজন। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, ময়মনসিংহ ইক্সু চাষের প্রধান অঞ্চল (চিত্র ১১.২)।



চা (Tea)

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। দেশে উৎপাদিত চা-এর প্রায় বেশিরভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা ভালো হয়। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেটে সবচেয়ে বেশ চা বাগান রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও ও পদ্মগড়ে চা চাষ হচ্ছে (চিত্র ১১.২)।



কৃষি ফসলের প্রাকৃতিক নিয়ামক ছাড়াও মূলধন, শ্রমিক, পরিবহন, বাজার প্রভৃতি নিয়ামক-এর সম্প্রসারণ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে। সরকারি সহযোগিতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভব।

শস্য বহুমুখীকরণ (Crop diversification)

বাংলাদেশে শীতকাল প্রধানত রাবিশস্য চাষের জন্য উপযোগী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই ধরনের শস্য চাষ করা হয়। এর ফলে যেমন— কৃষক শস্যের মূল্য কম পায়। জমিতে একই শস্য চাষ মাটির পুষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পাশাপাশি বহু ধরনের শস্য চাষ উচ্চ মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে উপর্যুক্ত করে। বিভিন্ন শস্য গাছের অংশ নানা ধরনের জৈব মাটিতে যোগ করে মাটির পুষ্টির ঘাটাতি রোধ হয়। ফলে অত্যধিক সার ব্যবহার করতে হয় না।

এভাবে কৃষক বহুমুখী শস্য চাষ করে নিজে এবং পরিবেশকে উপর্যুক্ত করতে পারে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

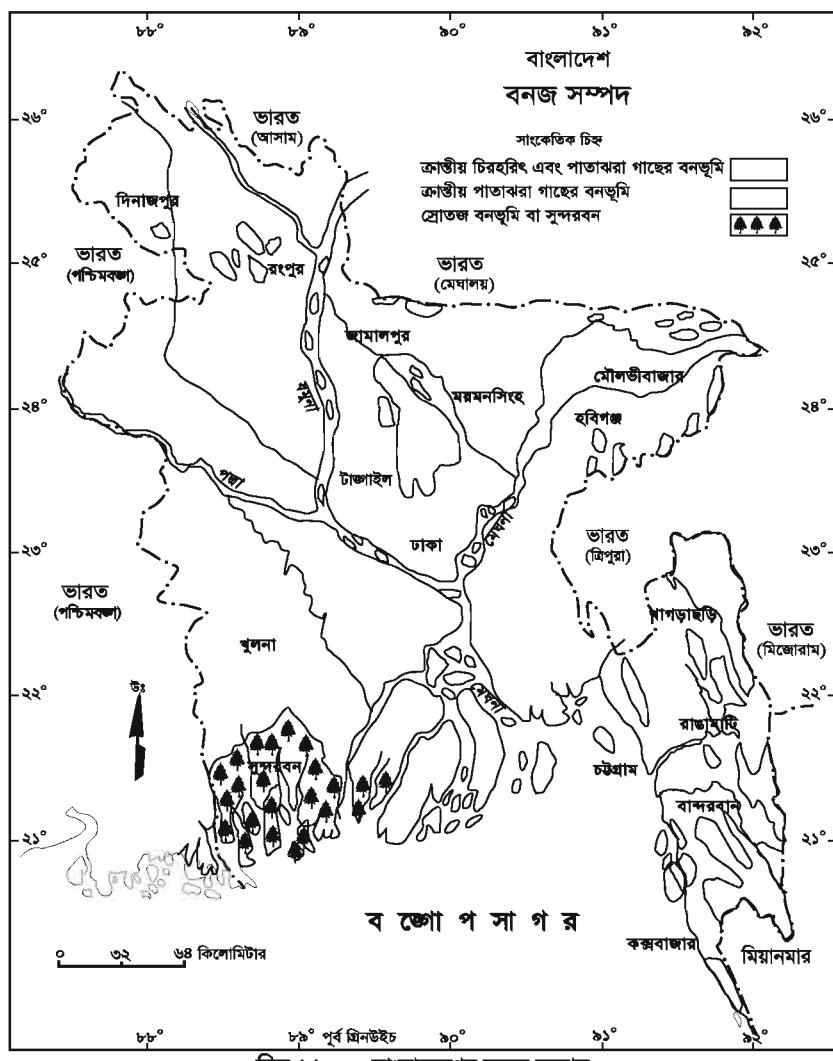
বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। কোনো দেশের পারম্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭.৬২ ভাগ। জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় (চিত্র ১১.৩)।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাখরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের খাগড়াঝাড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত। পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে পাতাখরা গাছের বনভূমি দেখা যায়।

ক্রান্তীয় পাতাখরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের প্রাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে— (ক) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধ্যপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি; (খ) দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বরেন্দ্র বনভূমি অবস্থিত। শীতকালে এ বনভূমির বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায়।

বাংলাদেশের বনভূমি

স্ন্যাতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : উত্তরে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাইমঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক প্রান্ত সীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত। এটি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চল বৃক্ষ সমৃদ্ধ।



চিত্র ১১.৩ : বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

কাজ : বিভিন্ন উষ্ণিদের বৈশিষ্ট্য ও নাম দেওয়া হলো। এগুলো কোন বনভূমিতে অবস্থিত তা লেখ।

উষ্ণিদ ও বৈশিষ্ট্য	বনভূমির নাম
১। সুন্দরি, গরান, গেওয়া, ধূল্দল, কেওড়া ও গোলপাতা সাধারণত স্রোতময় মিঠা ও লোনা পানির সংযোগস্থলে জন্মে।	
২। শাল, গজারি, কড়ই, হিজল প্রভৃতি গাছের পাতা একবারে ঝরে যায়।	
৩। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না।	

বনাঞ্চলের গুরুত্ব (Importance of forest) : বনজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং দিন দিন কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

- ১। **প্রাকৃতিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মাটি বা ভূমিক্ষয় রোধ, ভূমিষস রক্ষা, বৃষ্টিপাত বৃন্দি, আবহাওয়া আর্দ্র রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- ২। **পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা :** সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। এর জীববৈচিত্র্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- ৩। **পশ্যসামগ্রী সংগ্রহ :** মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও জীবজগতের চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।
- ৪। **নির্মাণের উপকরণ :** মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে।
- ৫। **শিল্পের উন্নতি :** কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন তুরান্বিত করে। কর্ণফুলী কাগজকল, খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
- ৬। **দুর্ঘাগ্রে ঝুঁকি হ্রাস :** উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ৭। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লিপার, মোটরগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদির কাঠামো, বৈদ্যুতিক ঝুঁটি, রান্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।
- ৮। **সরকারের আয়ের উৎস :** বনজ সম্পদ সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমন— বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।
- ৯। **কৃষি উন্নয়ন :** বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।
- ১০। **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিৎ, পশম এবং কিছু জীবস্তু বন্য জন্ম রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

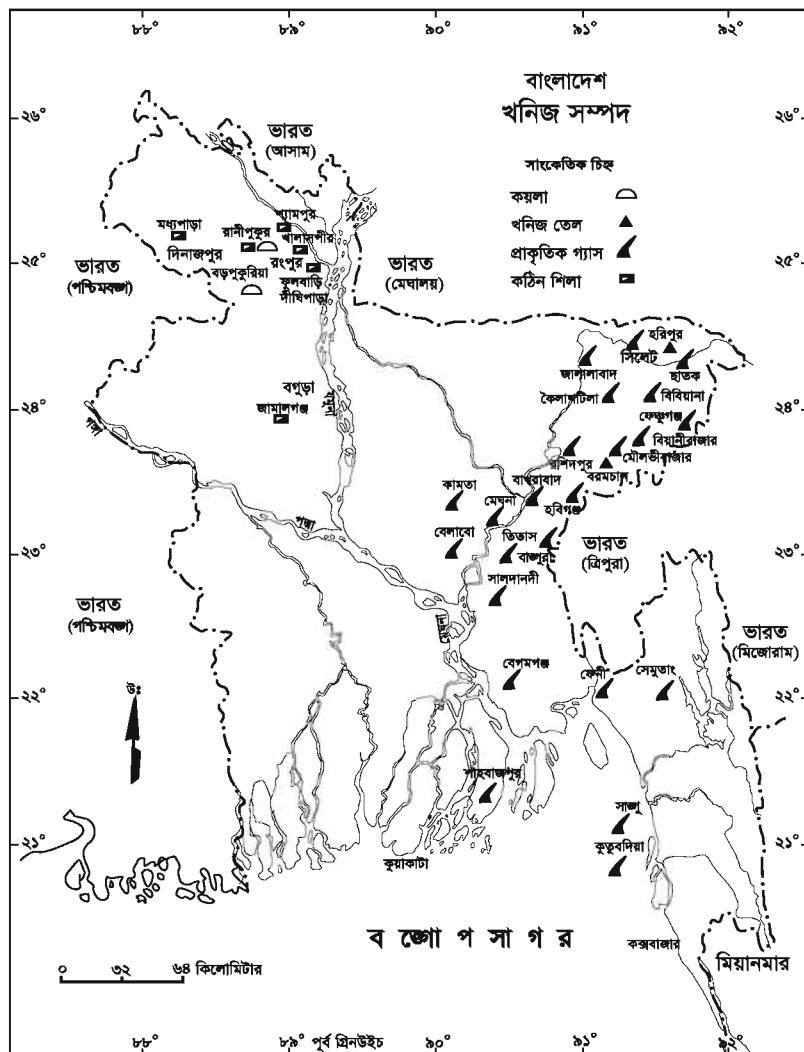
বনজ সম্পদ ব্যবহারে আমরা যত্নশীল হবো। আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে বনজ জীববৈচিত্র্যের প্রতি যত্নশীল ও রক্ষণশীল হতে হবে।

বাংলাদেশের খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিল্প

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ হিসেবে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র ১১.৪)। দেশের এই খনিজ সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

খনিজ তেল (Petroleum)

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্মত কৃপে তেল পাওয়া গেছে। এ কৃপে থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত। এ ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১,২০০ ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়।



চিত্র ১১.৪ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gass)

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৬৮ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস প্রয়োগ করে। এ যাবৎ আবিস্তৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উভ্রেলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৪.৭৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উভ্রেলন করা হয়েছে এবং ১২.৯৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রমাণিত মজুদ গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে ২১টি গ্যাসক্ষেত্রের ১১২টি কৃপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১৮ সালে ২১১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উভ্রেলিত হয়েছে। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

গ্যাসক্ষেত্র			
উৎপাদনরত	উৎপাদনে যায় নাই	উৎপাদন স্থগিত	নতুন আবিস্তৃত
বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, সিলেট, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, তিতাস, নরসিংড়ী, মেঘনা, সালদান্ডী, জালালাবাদ, বিয়ানীবাজার, ফেনুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঞ্জুরা, শাহবাজপুর, সেমুতাই, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, ঝুপগঞ্জ।	কুতুবদিয়া	ছাতক, কামতা সাঙ্গু, ফেনী	ভোলা

কয়লা (Coal)

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। দেশের উন্নর-পশ্চিমাঞ্চলের আবিস্তৃত মোট ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মোট মজুদ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। কয়লাক্ষেত্রের কয়লা উভ্রেলন শুরুর পর থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৮.২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উভ্রেলন করা হয়। দিনাজপুরের বড়পুরুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উভ্রেলিত হয়। এছাড়া রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জে কয়লাক্ষেত্র রয়েছে। (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সম্মান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সম্মান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরে বড়পুরুরিয়ার কয়লাক্ষেত্র থেকে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা উভ্রেলন করা হচ্ছে।

কঠিন শিলা (Hard Rock)

রেলপথ, রাস্তাঘাট, গ্রাম, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সম্মান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উভ্রেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উভ্রেলন করা যাবে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া খনি হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩৪.২৫ মেট্রিক টন কঠিন শিলা উভ্রেলিত হচ্ছে। (উৎস : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৭-২০১৮)।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব

আধুনিক সভ্য জগতে খনিজ তেল একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শক্তি, আলো, তাপ উৎপাদনের জন্য তেল প্রয়োজনীয়। খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসেলিন, ডিজেল গ্যাস, কেরোসিন, পিছিলকারক তেল (Lubricant), প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি চালাতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের তেলক্ষেত্রগুলো হতে তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। এছাড়া এককভাবে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যাবে।

শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফেঁথুগঞ্জের সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশালের সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, উষ্ণধ, রাবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্ত্র প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ঢা বাগানগুলো রশিদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হয়। যেমন— সিন্ধিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাঞ্ছণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

কাজ : এককভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।	
শিল্প	ব্যবহৃত গ্যাসক্ষেত্রের নাম
ফেঁথুগঞ্জের সার কারখানায়	
ছাতকের সিমেন্ট কারখানায়	
ঘোড়াশালের সার কারখানায়	
সিন্ধিরগঞ্জের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে	
আশুগঞ্জের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে	

কয়লা জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ও লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে বড়পুরুরিয়া থেকে উৎপাদিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড়পুরুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে ইটভাটা, কলকারখানাসহ অন্যান্য খাতে। বনজ সম্পদ রক্ষায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরাসরি কাঠ বা লাকড়ি পোড়ালে পরিবেশের যে দূষণ হয় কয়লা ব্যবহার করলে সেই দূষণ হয় না। বনজ সম্পদ রক্ষা ও দূষণ রোধে কয়লা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে।

কৃষির উন্নতি, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস, সরকারি আয়ের উৎস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই খনিজ দ্রব্যগুলো যথেষ্ট অবদান রাখে। এগুলো ব্যবহারের প্রতি আমাদের সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই মূল্যবান সম্পদগুলোর অপচয় করব না।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প (Main industry of Bangladesh)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১২-১৩

অর্থবছরে জি.ডি.পি তে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ২৯ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো—

পাট শিল্প (Jute industry) : বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এ দেশের পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ায় কাঁচামালের সহজলভ্যতা পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে। এ দেশে পাটের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে। সর্বোপরি পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে।

১৯৫১ সালে ১,০০০ তাঁত নিয়ে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে প্রথম পাটকলাটি প্রতিষ্ঠিত হয় (চিত্র ১১.৫)। বর্তমানে আদমজী পাটকলাটি ব্রহ্ম রয়েছে। তবে বেসরকারিভাবে অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি মোট পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি। গড় বার্ষিক উৎপাদন ৬,৬৩,০০০ মেট্রিক টন। আমরা সহজে পাট শিল্পকে নিম্নোক্তভাবে দেখতে পারি।

পাট শিল্প কেন্দ্র অঞ্চল	পাট শিল্পজাত দ্রব্য	রাষ্ট্রান্তর দেশসমূহ
নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, তৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারিপুর, চাঁদপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, হবিগঞ্জ।	চট, বস্তা, কার্পেটি, দড়ি, ব্যাগ, স্যান্ডেল, ম্যাট, পুতুল, শোপিস, জুটন।	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিসর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স।

বস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry)

কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ দেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল। আগোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের কার্পাস বয়নশিল্পকে কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় (চিত্র ১১.৫)। যেমন—

ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল	রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চল
ঢাকার মিরেরবাগ, পোন্তগোলা, শ্যামপুর, ডেমরা, সাভার; নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুড়াপাড়া, কাঁচপুর, ধমগড়, লক্ষণখোলা, ফতুল্লা; গাজীপুর জেলার টঙ্গী, জয়দেবপুর, কালিগঞ্জ; নরসিংদী জেলার নরসিংদী, মাধবনী, বাবুরহাট ও ঘোড়াশাল।	ফৌজদারহাট, উত্তর কাটালি, ঘোলশহর, পাঁচলাইশ, জুবলী রোড, হালিশহর, কালুরবাট।	কুমিল্লার দূর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিমানপুর, আরিগোলা, ব্রাহ্মগবাড়িয়া ও বাঙ্গারামপুর; নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী ও রায়পুর।	রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা; রংপুর বিভাগে দিনাজপুর এবং খুলনা বিভাগে কুষ্টিয়া, মাগুরা, যশোর জেলার নোয়াপাড়া।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বন্ধুকলগুলো পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্তু ও সুতা আমদানি করে।

কাগজ শিল্প (Paper Industries)

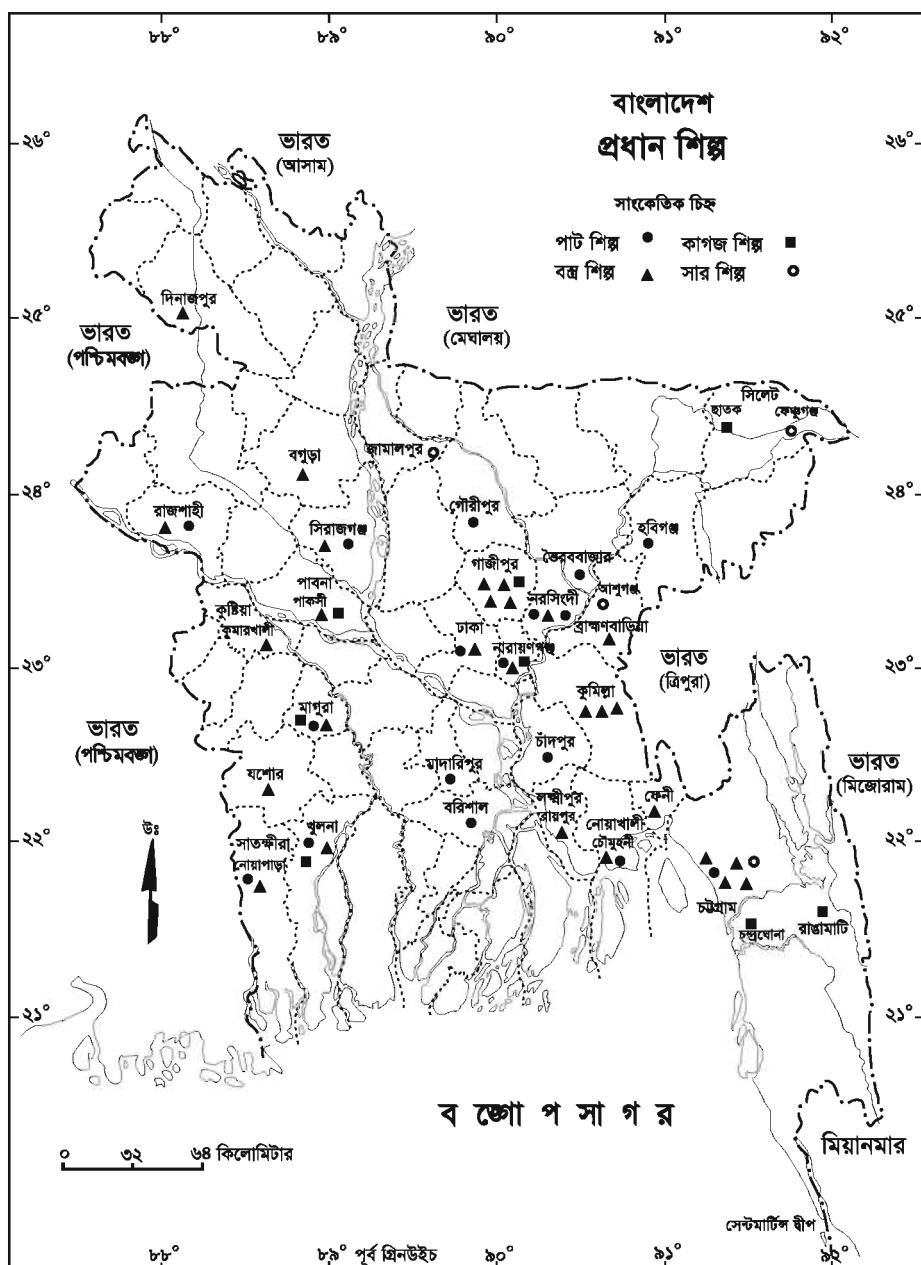
কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চম্পয়োনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে (চিত্র ১১.৫)। বেসরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাগজকল গড়ে উঠেছে।

কাগজকলসমূহ	উৎপাদনের কাঁচামাল	উৎপন্ন কাগজ
চম্পয়োনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনায় পাকশীর উন্নতরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিলেট মড ও কাগজকল, নারায়ণগঞ্জের বসুন্ধরা কাগজকল, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা, বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস, আদমজী পার্টিক্যাল বোর্ড মিলস, কাষাই ও টঙ্গী বোর্ড মিলস।	বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি ও কাঁচা পাট।	লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট।

সার শিল্প (Fertilizer Industry)

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল। আর এজন্য প্রয়োজন সার। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেস্টুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সার কারখানাগুলো হলো— ঘোড়শাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেস্টুগঞ্জ অ্যামেনিয়াম সালফেট সার কারখানা (চিত্র ১১.৫)।

বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।



চিত্র ১১.৫ : বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পোশাক শিল্পের অবদান (The contribution of garment industries to the economy of Bangladesh)

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সম্ভর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম খেকে রণনির্মাণী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এ শিল্প অতিক্রম করে বাংলাদেশের রণনির্মাণী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পোশাক শিল্পের অবদান (The contribution of garment industries to the economy of Bangladesh)

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সম্মর্দের দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রঞ্জানিমুঠী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এ শিল্প অতিন্দৃত বাংলাদেশের রঞ্জানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয়। বর্তমানে দেশে অনেকগুলো রঞ্জানিমুঠী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত। অবশ্যিকগুলো প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর সাময়িক নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে। ২০১৭-১৮* সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ ১৫,৪২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রঞ্জানি আয়ের শতকরা ৪২.০৭ ভাগ (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮* সাময়িক)।

উৎপাদিত পোশাক	রঞ্জানিকৃত দেশসমূহ
ট্রাউজার, জিন্স প্যান্ট, ক্ষার্ট, টপস, সোয়েটার, জ্যাকেট, মেয়েদের পুলওভার, কার্ডিগান, ব্লাউজ, টি-শার্ট, শার্ট ও প্যান্ট ইত্যাদি।	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও যুক্তরাজ্য।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরিতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। এ দেশে এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল শ্রমশক্তির, বিশেষ করে সমাজের নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনছে। পোশাক শিল্পকে এখন বলে ‘বিলিয়ন ডলার’ শিল্প।

এ শিল্পে জাপান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা প্রভৃতি দেশ বিনিয়োগ করেছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকার ইপিজেড (EPZ) দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলো স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

EPZ : Export Processing Zone (রঞ্জানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল)

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প (Tourism Industry of Bangladesh)

প্রাকৃতিক খৃতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। সম্মর্দের শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং এই দেশে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লেখ করেছেন, ‘A sleeping beauty emerging from mists and water.’ তিনি তখন এই জনপদের সুপ্ত সৌন্দর্যটিকে কুয়াশা ও পানির অস্তরাল থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন। তার সেই উপলব্ধি আজও এই বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রসৈকত, ঘন অরণ্য, পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবেই এখানে বিদ্যমান। বাংলাদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এ দেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দ্বীপ, হ্রদ, নদী ও পালতোলা নৌকার অনুপম দৃশ্যাবলি, সবুজ-শ্যামলিকা ঘেরা পাহাড়ি ভূমি রয়েছে, যা দেখলে মন ভরে যায়। এখানে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠসহ প্রাচীন সভ্যতার নানা নির্দশন। সিলেটের পাহাড়, হাওর, চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য, কুয়াকাটায় সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য। এছাড়াও এ দেশে বহু প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন এবং সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি রয়েছে, যা আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Tourism Industry of Bangladesh)

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এই শিল্পের উন্নয়নের বদৌলতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখতে পারে। এই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে আত্মস্মীকরণ গড়ে উঠে এবং পারম্পরিক সহযোগিতা ও সহর্মিতার পথ সূচনা হয়। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের নির্দশনসমূহ বিশ্ব দরবারে পর্যটনের মাধ্যমেই তুলে ধরার মুখ্য পদ্ধা হিসেবে গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ সালে প্রগতি জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অঞ্চালিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আয়, কর্মসংহান ও জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়। পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট উপস্থাপন করা যায়। এমন একটি ঝুঁকিহীন শিল্পে বাংলাদেশ আজও প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে ২০১৬ সালে বিদেশি পর্যটক এসেছে প্রায় ৬,২০,০০০ জন। এতে বিদেশি পর্যটক ভরণে আয় হয়েছে ২০১৬ সালে ৮০৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা।

(উৎস : বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ২০১৮)।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ (Importance of Tourism Centres of Bangladesh)

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানেই পর্যটনের আকর্ষণীয় উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানের নাম উল্লেখ করা হলো (চিত্র ১১.৬)।

বৃহস্পতির ঢাকার পর্যটন স্থানসমূহ (Tourism places of Greater Dhaka)

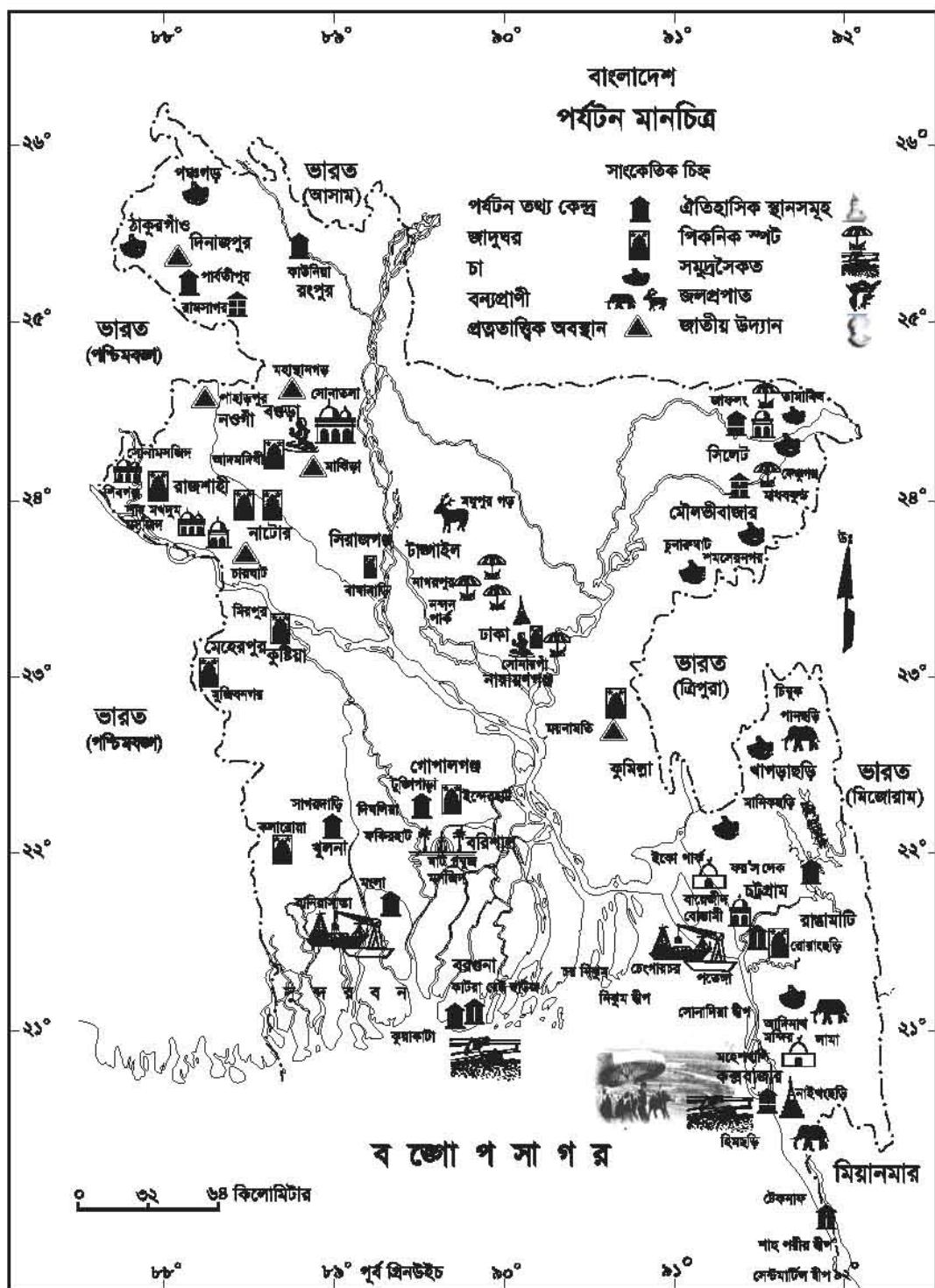
ঐতিহাসিকভাবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর তারা মসজিদ এবং সাম্প্রতিককালের নির্মিত বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির। মোগল সম্রাটদের বৃড়িগঞ্জার নির্মিত লালবাগ দুর্গ, ১৮৫৭ সালের স্মৃতিসৌধ বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের জাতির জনক কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। গাজীপুরের ভাওয়াল গড় ও জমিদারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এবং পানাম নগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourism places of the Eastern Bengal)

টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার ও বঙ্গবন্ধু সেতু, মধুপুরের গড়, ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর স্মৃতি বিজরিত দরিদ্রামপুর। সিলেটে হ্যারত শাহজালাল (রা) ও শাহপরান (রা) মাজার, কিন বিজ, জাফলং-এ জয়স্তিয়া পাহাড়, মৌলভীবাজারে মাধবকুণ্ঠ জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া ইকোপার্ক ইত্যাদি। কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, নোয়াখালীর বজরা শাহী মসজিদ, গান্ধী আশ্রম, হাতিয়া ও নিবুম দীপ ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourism places of the Northern Bengal)

রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর ও শাহ মখদুম (রা) মাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনা মসজিদ, নাটোরের রানি ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন), নওগাঁয় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শাহ সুলতান বলখী (রা) মাজার, দিনাজপুরে কান্তজিউ মন্দির ইত্যাদি।

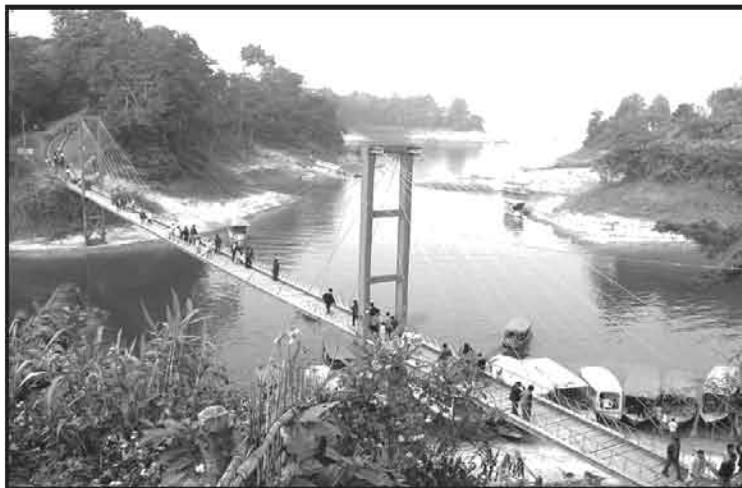


দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourism places of the Southern Bengal)

গোপালগঞ্জের চুক্তিপাড়ায় জাহির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি, মরমী কবি শালনশাহের মাজার ও শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, যশোরের সাগরদাঁড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান, নড়াইলে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান ‘শিশু শর্গ ও আর্ট গ্যালারী’ চিত্রা মনীর ভীরে, মেহেরপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বাগেরহাটে বাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, বৃহস্পতির খুগনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুদূরবন ইত্যাদি।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourism places of Chittagong Hill Tracts)

রাঙামাটির কাঞ্চাই-হুদ এখানকার প্রধান আকর্ষণ (চিত্র ১১.৭)। এই হুদের চারদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়, নীলাভ পানি এবং হুদের ধারে ছোট ছোট টিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে অন্যান্য আনন্দ উপভোগের এক মোহনীয় স্থানে রূপান্তরিত করেছে। এখানে বৌদ্ধ বিহার ও চাকমা রাজার রাজবাড়ি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। খাগড়াছড়ির বনভূমি, পাহাড় ও প্রাকৃতিক বরনা। বান্দরবানের মেঘলা, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি ও নীলাচল (চিত্র ১১.৮) ইত্যাদি পর্যটন স্পট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।



চিত্র ১১.৭ : কাঞ্চাই-হুদ



চিত্র ১১.৮ : নীলাচল

চট্টগ্রামের পর্যটন জানপদ (Tourism places of Chittagong)

চট্টগ্রামের আকর্ষণীয় পর্যটন জানপদের মধ্যে কর্ণফুল শাহ আমানত (রা) মাজার, কর্ণফুল লেক, তিসি হিল, কোট বিল্ডিং, পাতেজা সমুদ্রসৈকত, গীতামুক্ত ইত্যাদি।

কক্ষবাজারের এলাকার পর্যটন জানপদ (Tourism places of Cox's Bazar)

পৃথিবীর সীর্বতম সমুদ্রসৈকত ও বন্দরপুর মহানগরীর মৃণ্ণ কলম্বাজারকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র পরিষ্কৃত করেছে। কক্ষবাজারের করোকটি পুরাতন পর্যটন জাম হলো হিমছড়ি, ইসামি বিচ, কোলাভলি বিচ, জামু বৌদ্ধ মন্দির, সোলামিয়া বীণ, যাহুশ্বরী বীণ ও সেট্যাটিল বীণ (চিত্র ১১.৯)।



চিত্র ১১.৯ : সেট্যাটিল বীণ

অনুশীলনী

বাস্তিনীচনি পত্র

- ১। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের জেলাগুলোতে গুরু ঢাব বেশি হাসান নাত করছে?

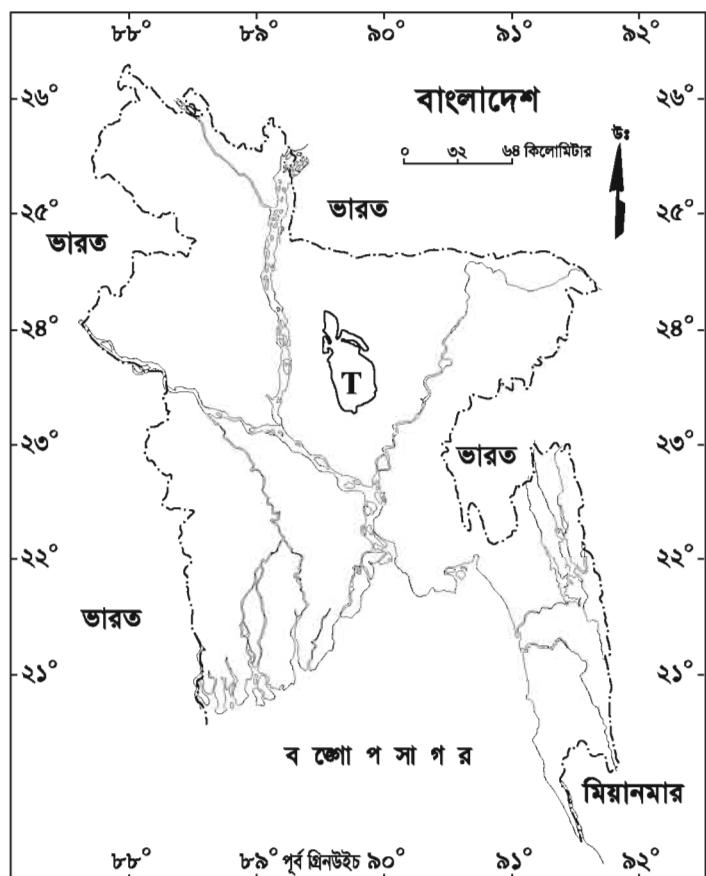
(ক) পূর্বাঞ্চল	(খ) পশ্চিমাঞ্চল
(গ) দক্ষিণাঞ্চল	(ঘ) উত্তরাঞ্চল
- ২। ইন্দু উৎপাদনের জন্য কোন ধরণের প্রক্রিয়া নিরোধ—
 - i. যেলে সোর্বিশ
 - ii. ফর্মাইজ সোর্বিশ
 - iii. তৈব পদার্থ পিণ্ডিত সোর্বিশ
 নিরের কোনটি সঠিক?

(ক) i & ii	(খ) i & iii
------------	-------------

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩। 'T' চিহ্নিত অঞ্চলে কোন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠেছে?

(ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ

(খ) ক্রান্তীয় পাতাখরা

(গ) স্রোতজ

(ঘ) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাখরা

৪। উক্ত বনভূমিতে কোন ধরনের বৃক্ষ জন্মায়?

i. চাপালিশ

ii. শাল

iii. হিজল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

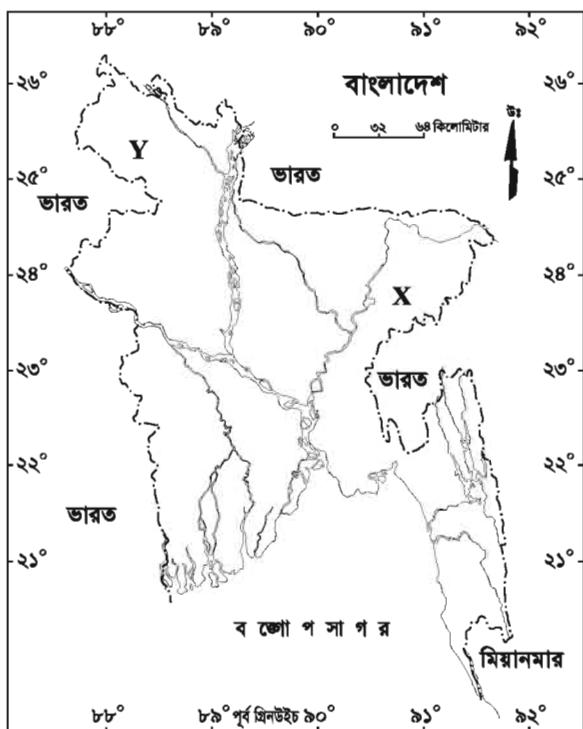
(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১।



- ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?
- খ. গম চাষের উপযোগী জলবায়ু ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'X' অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ফসলটি উৎপন্নের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'X' এবং 'Y' অঞ্চলের প্রাণ প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
- ২। সিমার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরদিকে পলির বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- ক. শিল্প কী?
- খ. বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. সিমার অঞ্চলে গড়ে উঠা শিল্পটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পলির অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে মতামত দাও।

বাংলাদেশের বোগায়োগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

Transport System and Trade of Bangladesh

বোগাবোগ ব্যবস্থা বাণী-পণ্য পরিবহন করে অঙ্গজীবী ও আত্মজীবীক বোগাবোগের সাথে সম্পর্কিতে কর্মকর্তা অবদান রাখে। দেশের একাধিক রেকে অন্যথানে বৈচারিক ও সৌকর্যন্তরের নির্যাপিত চলাচল, উৎপাদিত মুদ্রায় সুরু বালাইলাভভয়, উৎপাদনের উপরপৰ্যন্ত পতিশীলতা বৃদ্ধি, মুদ্রামুদ্রার বিত্তশীলতা আনন্দ প্রতি ক্ষেত্রে বোগাবোগ সুস্থলুর্মুখ হৃষিকা পালন করে থাকে। এই বোগাবোগ ব্যবস্থা প্রতিবিত্ত করে বাণিজ্যকে। বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক সুস্থলুর্মুখ অবস্থা বৃদ্ধি, পিল মুক্তির অবস্থা আসে।

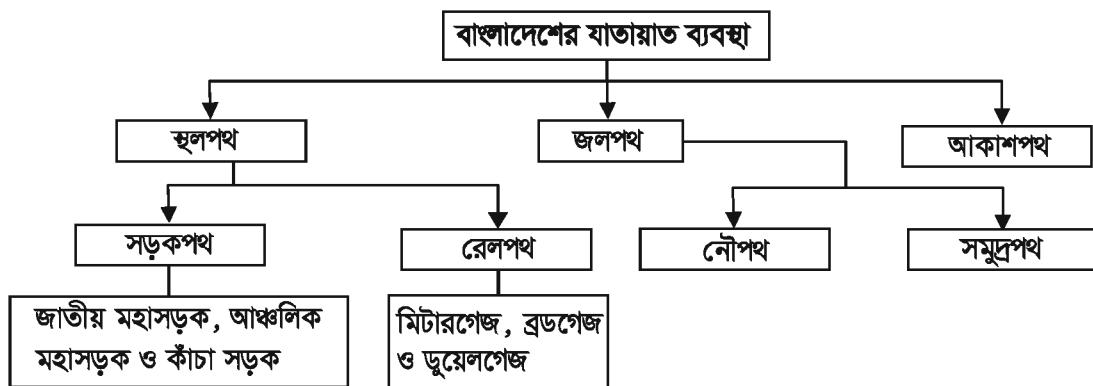


এ অধ্যায়ের পাঠ শেষে আম্বা—

- বাংলাদেশের সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের বর্ণনা করতে পাইব।
- বোগাবোগ ও পরিবহনে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের পুরুষ বিস্তৃতি করতে পাইব।
- সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে সুবিট্টিসা একাডেমি সর্বোচ্চ সর্বাধিক অবসরস করার এবং অন্যকে সামর্থ্য করার।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাণিজ্য ব্যাখ্যা করাতে পাইব।
- বাণিজ্য আয়সমি ও ঝুঁটানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পাইব।

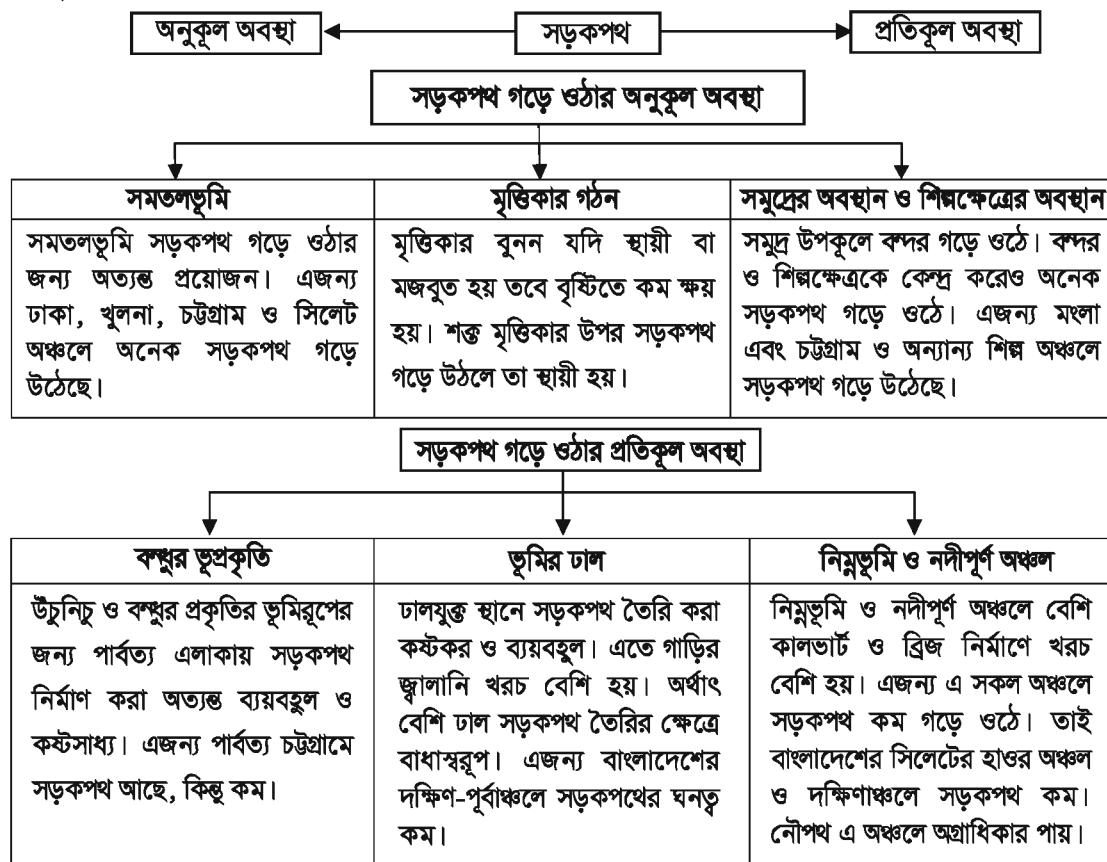
যাতায়াত ব্যবস্থা (Transport System)

যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে বুঝি।



সড়কপথ (Roads)

উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ সব স্থানে সম্ভব না তাই সড়কপথ থাকা প্রয়োজন। সড়কপথ গড়ে উঠার জন্য নিম্নোক্ত ভৌগোলিক অবস্থা প্রভাব ফেলে।



বাংলাদেশের সড়কপথগুলো বসতির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ সড়ক স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নৌপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সাধারণত কাঁচা সড়কগুলোকেই উন্নত করে পাকা সড়ক করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথের পরিমাণ নিম্ন সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ১ : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথ

সাল	২০১২	২০১৪	২০১৮
জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	৩,৫৩৮	৩,৫৪৪	৩,৮১৩
আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	৮,২৭৬	৮,২৭৮	৮,২৪৭
ইট বা কাঁচা সড়ক (কিলোমিটার)	১৩,৪৫৮	১৩,৬৫৯	১৩,২৪২
মোট	২১,২৭২	২১,৪৮১	২১,৩০২

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮

কাজ : উপরের পরিসংখ্যান থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছক পূরণ কর।			
সড়কপথের নাম	বেড়েছে	কমেছে	কারণ
জাতীয় মহাসড়ক			
আঞ্চলিক মহাসড়ক			
কাঁচা সড়ক			

আমাদের দেশের সড়কপথগুলো বৃষ্টি, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে কাঁচা সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে সারাবছরই সড়ক মেরামত করতে হয়। এছাড়া নদীবিধৌত হওয়ায় কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করতে হয়, যা সড়কপথের বাধা হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে সড়কপথ ঢাকা কেন্দ্রিক। বুটসমূহ নিম্নরূপ :

ঢাকা \longleftrightarrow আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।

ঢাকা \longleftrightarrow দৌলতদিয়া হয়ে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল।

ঢাকা \longleftrightarrow টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

ঢাকা \longleftrightarrow কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি, কঞ্চবাজার, টেকনাফ।

ঢাকা \longleftrightarrow বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে সড়কপথের উন্নয়নের জন্য যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সড়কপথ সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

তাই এ দেশের সকল স্থানেই সড়কপথে যাওয়া যায়। বাজার ব্যবহারে উন্নতি, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বণ্টন, শিল্পান্বয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

রেলপথ (Railways)

বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য, শ্রমিক পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটা দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে (চিত্র ১২.১)।



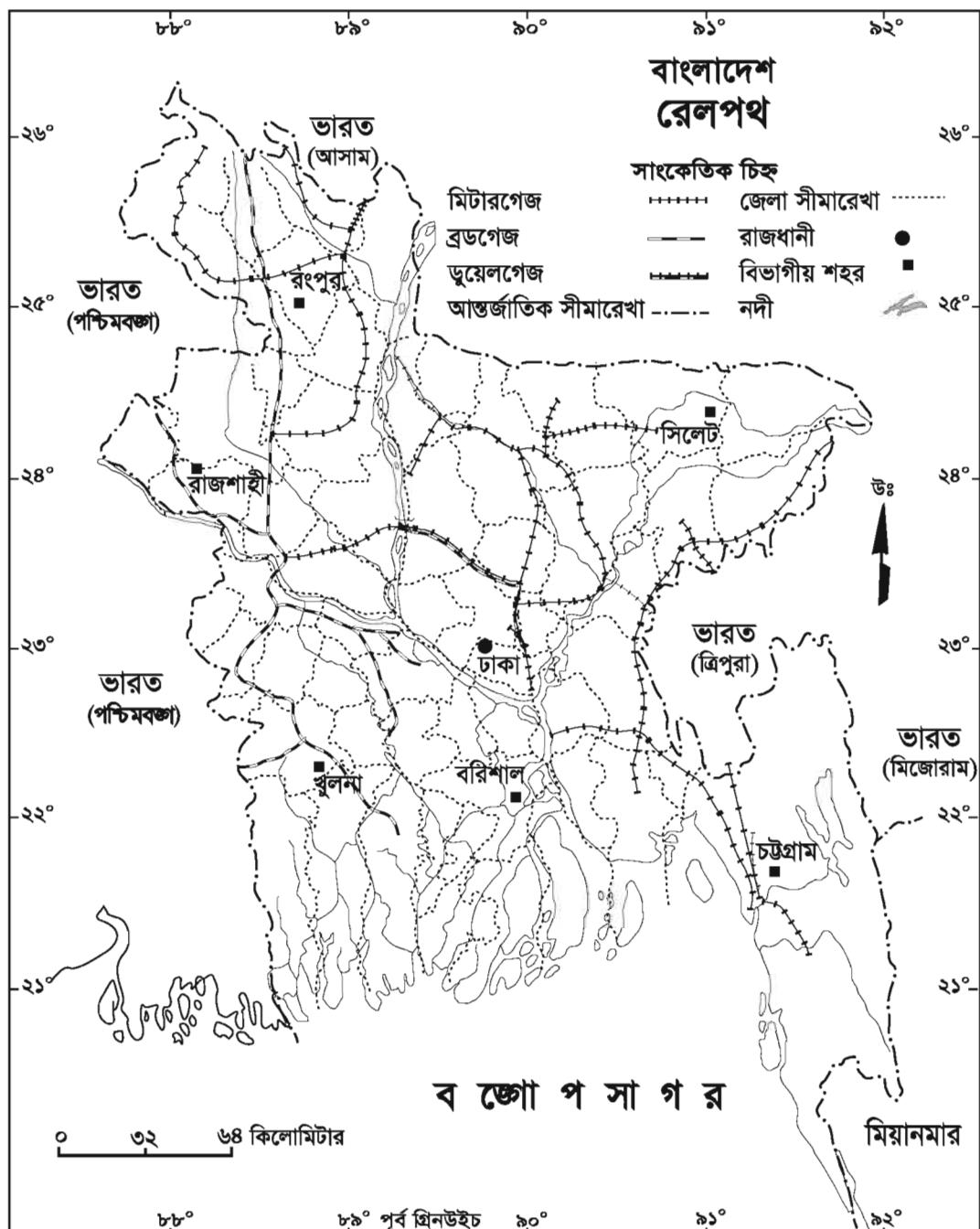
রেলপথ সব স্থানেই কি গড়ে উঠতে পারে? ভৌগোলিক কিছু উপাদান রেলপথ গড়ে উঠাকে প্রভাবিত করে।

রেলপথ গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা	
সমতলভূমি	সমুদ্রের অবস্থান
সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়ি, বনাঞ্চল, জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে উঠেছে।	সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বন্দর গড়ে উঠে। এই বন্দরের কারণে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও রেলপথ গড়ে উঠে। এজন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বন্দরকে কেন্দ্র করে সমতলভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

রেলপথ গড়ে উঠার প্রতিকূল অবস্থা	
বন্ধুর ভূপ্রকৃতি	নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা
উচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই বললেই চলে।	মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে উঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে উঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।
১ মিটার প্রস্থ রেলপথ মিটারগেজ এবং ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথ ব্রডগেজ নামে পরিচিত।	বর্তমানে তিস্তামুখঘাট ও বাহাদুরাবাদঘাট এবং সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ২টি রেলওয়ে ফেরি চালু রয়েছে।

ঢাকার কমলাপুর দেশের বৃহস্পতি রেল স্টেশন। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭৪টি রেল স্টেশন আছে (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক ২০১৭, সারণি ৮.০৪)। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠনে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

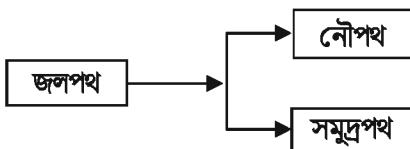
বাংলাদেশ রেলওয়ের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিণত হবে।



কাঞ্জ : খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বাম্পরবান, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, কক্সবাজার ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই।

উক্ত অঞ্চলগুলোতে রেল যোগাযোগ নেই কেন ভৌগোলিক কারণসমূহ বের কর। দলগতভাবে কারণগুলো মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

জলপথ : জলপথকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।



নৌপথ (River transport)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূল। যে কারণে নৌপথ বিস্তার করেছে তা বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে তা সহজে বোঝা যায়।

নৌপথ গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা	
নিম্নভূমি	নদীবহুল অঞ্চল
নিম্নভূমি সহজে বন্যা কবিলি হয়, ফলে সড়কপথ ও রেলপথ গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সিলেট অঞ্চলের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুর, তোলা, মাদারিপুর, বরিশাল অঞ্চলে নৌপথ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা।	স্বাভাবিকভাবেই নদীবহুল অঞ্চলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সহজে গড়ে উঠে না। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথই বেশি ব্যবহৃত হয়।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবহর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশের নৌ পরিবহনের সামগ্রিক অবস্থা নিম্নরূপ :

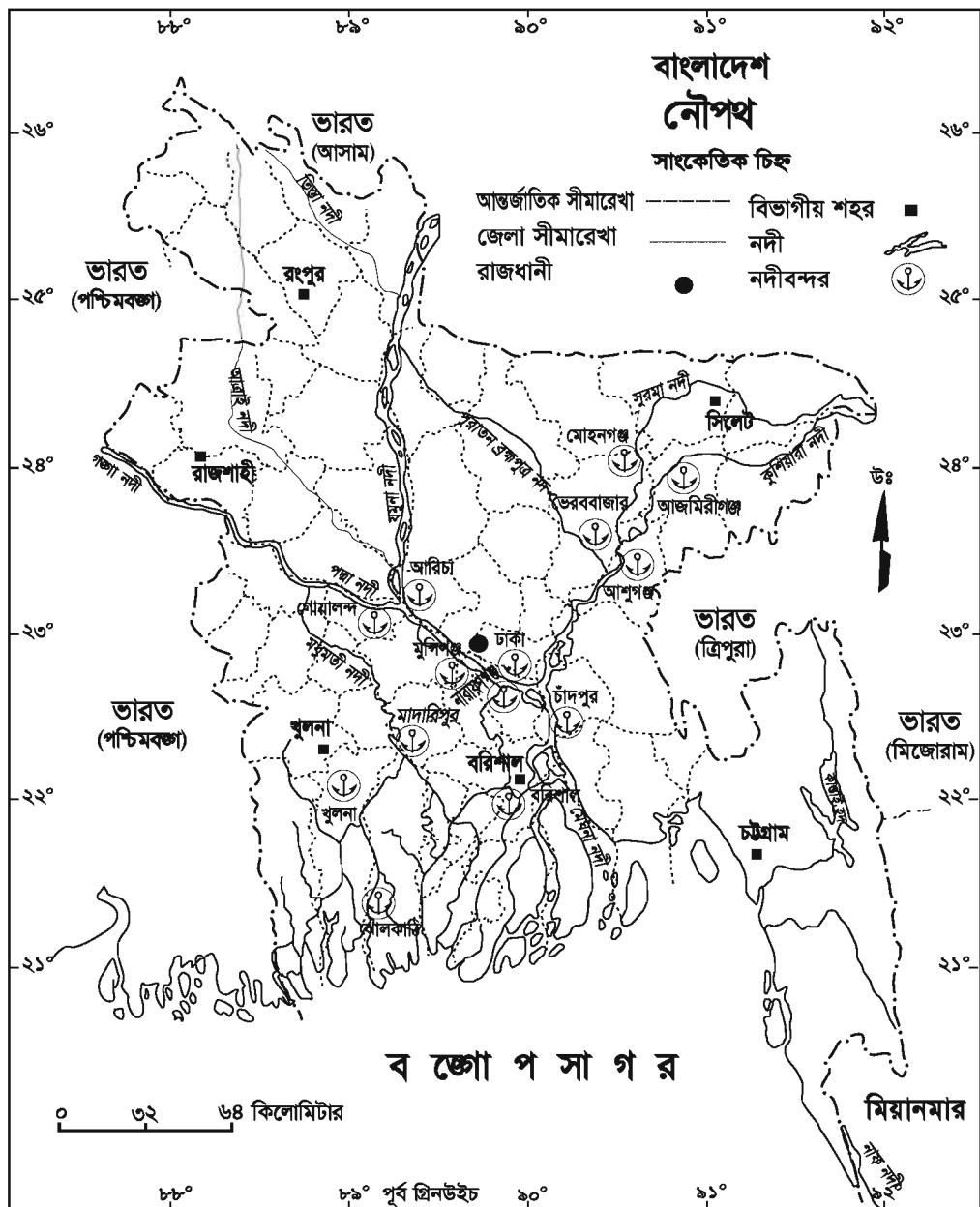
সামগ্রিক অবস্থা	সাল	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের আয় (কোটি টাকায়)
লখণঘাট	২০১৩-১৪	৩২০.০৮
ফেরিঘাট	২০১৪-১৫	৩৫৪.৫৮
	২০১৫-১৬	৫০৬.৬৪
	২০১৬-১৭	৬০৩.৮০
	২০১৭-১৮*	৮৭৭.৫০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮* সাময়িক, (BIWTA, Ministry of Shipping)

কাজ : 'নৌপথ সামুদ্রী পথ' ব্যাখ্যা কর।

নদীবন্দর (River ports) : নদীবন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুসিগঞ্জ, গোয়ালপুর, বরিশাল, খুলনা, তেরববাজার, আশুগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরীগঞ্জ, মাদারিপুর উল্লেখযোগ্য (চিত্র ১২.২)।

বাণিজ্য, পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ করে বাংলাদেশ নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।



কাজ : বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দরগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত কর এবং শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

সমুদ্রপথ (Ocean Shipping)

সমুদ্রপথ গড়ে উঠার জন্য দেশের পার্শ্বে অবশ্যই সমুদ্রের অবস্থান দরকার। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না, তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে। বন্দর গড়ে উঠলে তবেই সমুদ্রপথ উন্নতি লাভ করবে।

সমুদ্রপথ গড়ে উঠার ভৌগোলিক কারণ			
গোত্রাশ্রয়	উপকূলের গভীরতা	সুবিস্তৃত সমভূমি	জলবায়ু
গোত্রাশ্রয় থাকলে ঝাড়-বাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়।	বন্দরের উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া বাস্তুলীয়। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে।	বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন।	বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধাস্বরূপ, যা বাংলাদেশের উপকূলে অনুপস্থিত। আর এ কারণে সমুদ্র যোগাযোগ প্রসার লাভ করেছে।

দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জলপথ তথা নৌপথ ও সমুদ্রপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের তিনটি সমুদ্রবন্দর আছে— চট্টগ্রাম, মৎলা ও পায়রা বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রঞ্জনির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মৎলা বন্দর দিয়ে মোট রঞ্জনির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

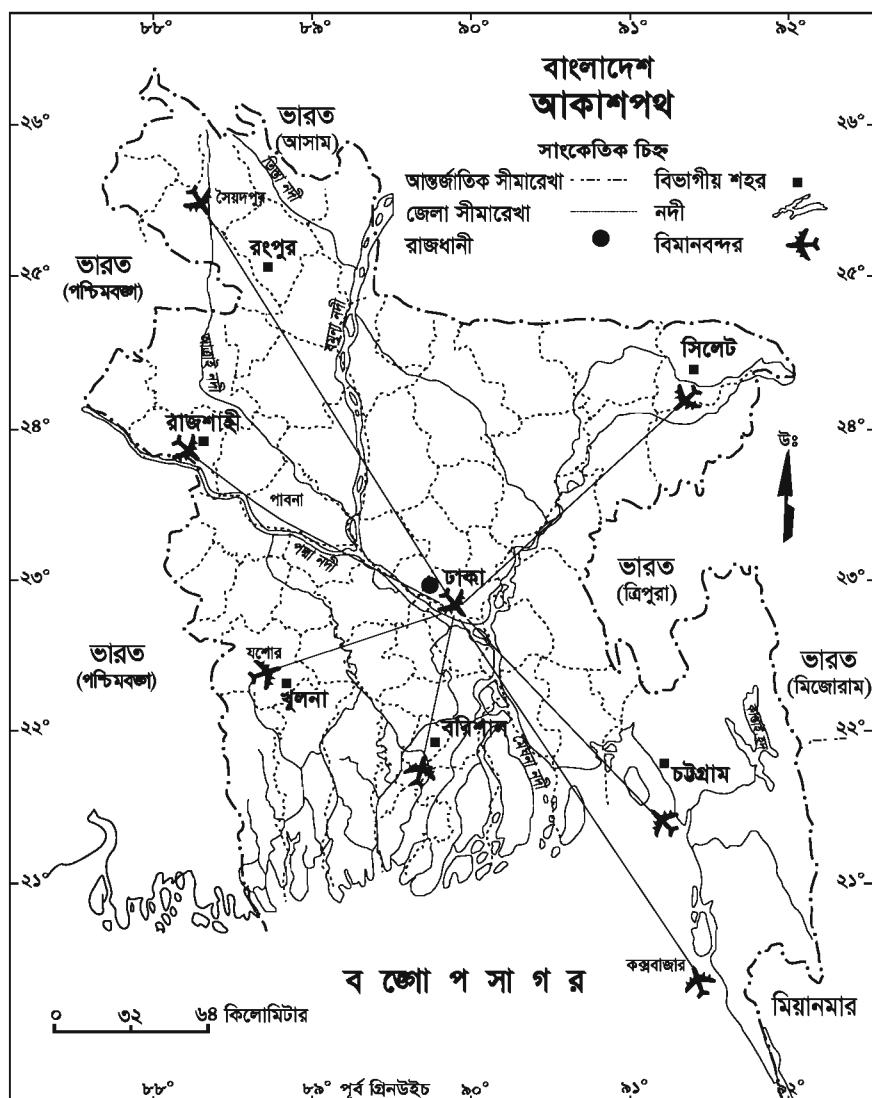
অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে নৌপথ ও সমুদ্রপথের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আকাশপথ (Airways)

দৃত ডাক চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য প্রেরণেও আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যুদ্ধবিশ্বাস, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আকাশপথকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ কঞ্জনাও করা যায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে আকাশপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

আকাশপথ গড়ে উঠার অনুকূল অবস্থা	
সমতলভূমি	কুয়াশামুক্ত ও ঝাড়বঝাঙ্গার স্বত্ত্বা
বিমান অবতরণ এবং উড়োয়নের জন্য পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন।	আকাশপথের জন্য কুয়াশামুক্ত ও ঝাড়বঝাঙ্গামুক্ত বন্দর প্রয়োজন।

বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্ষবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায় (চিত্র ১২.৩)। অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি বিমান সার্ভিসও ঢালু রয়েছে। ঢাকার ‘হ্যারত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর’ বাংলাদেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়াও আরও দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে তা হলো—চট্টগ্রাম শাহ আমানত ও সিলেট উসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

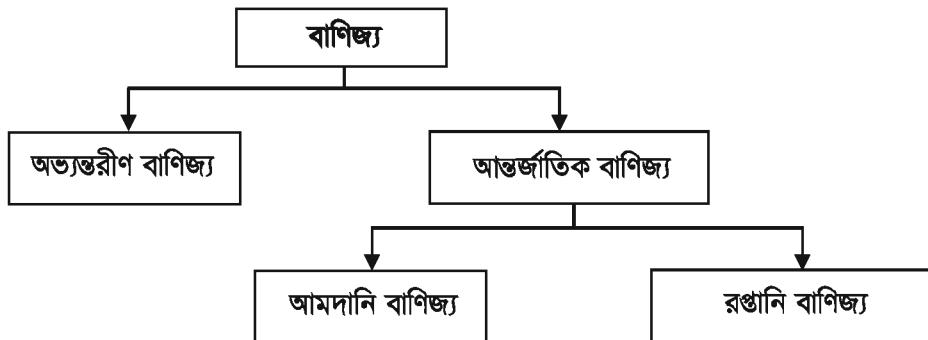


চিত্র ১২.৩ : বাংলাদেশের আকাশপথ

বাণিজ্য (Trade)

মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো ফর্মা-২৫, ভূগোল ও পরিবেশ, তাম-১০ শ্রেণি

বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। বাণিজ্য নিম্নরূপ :



অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Internal trade)

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা, সদর, গঞ্জ, হাটে বণ্টন করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও তোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে।

কাজ : তোমার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে কী কী পণ্য অন্য অঞ্চল থেকে আসে এবং কোন দ্রব্য বা পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে তার তালিকা তৈরি কর।

কাজ : তোমার এলাকায় বাণিজ্যের সঙ্গে যাতায়াতের সম্বর্ক দেখাও।		
পণ্যদ্রব্য তোমার অঞ্চল থেকে যাচ্ছে	যাতায়াত ব্যবস্থা	পণ্যদ্রব্য তোমার অঞ্চলে আসছে

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign trade)

এক সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল বেশিরভাগ কাঁচামাল রপ্তানি। বর্তমানে আমাদের রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আয় হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যায়ার থেকে এবং দিন দিন কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ কমে আমদানি বাঢ়ছে। বর্তমানে খাদ্য-শস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করতে হয় এবং দেখা যায় রপ্তানির চেয়ে আমদানি দ্রব্য বেশি। আর এ সকল বৈদেশিক বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে। তবে জরুরিভিত্তিতেও পচনশীল দ্রব্য আকাশপথে আনা নেওয়া করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার

উন্নয়ন, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশ চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। বাংলাদেশের পণ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, ইতালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না, ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (Import and export products)

বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমনির্ভর শিল্পের রপ্তানি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ

- প্রাথমিক পণ্য : হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচা পাট, চা ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য।
- শিল্পজাত পণ্য : তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিকসামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিকসামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি।

সাল	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫	৩১,২০৮.৯০	৪০,৬৮৫.০
২০১৬	৩৪,২৫৭.২	৩৯,৭১৫.০
২০১৭	৩৪,৬৫৫.৯০	৪৩,৪৯১.০
২০১৮	৩৬,৬৬৮.২০	৫৪,৪৬৩.২০

উৎস : বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক (পরিসংখ্যান বিভাগ) ২০১৫-২০১৮

বাংলাদেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন-এর অবস্থান শীর্ষে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির শতকরা ২৮.৩ ভাগ চীন থেকে আসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও সিঙ্গাপুর।

প্রধান আমদানি পণ্যসমূহ

- প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ : চাল, গম, তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তুলা।
- প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ : ভোজ্যতেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার, সুতা।
- মূলধনী দ্রব্যসমূহ।
- অন্যান্য পণ্য (ইপিজেড-এর সহায়ক পণ্য)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন জেলায় রেলপথ নেই?

- | | |
|--------------|---------------|
| (ক) টাঙ্গাইল | (খ) মাদারিপুর |
| (গ) হবিগঞ্জ | (ঘ) তেরববাজার |

২। বৈদেশিক বাণিজ্য রঞ্জনি বৃদ্ধি করতে হলে—

- i. উৎপন্ন দ্রব্যের খরচ কমাতে হবে
- ii. উৎপন্ন দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে
- iii. দ্রব্যসামগ্রীর মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রাইয়ান একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। মুস্বাই থেকে প্রতি বছর তিনি কম্পিউটার আমদানি করেন।

৩। জনাব রাইয়ান কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?

- | | |
|------------|--------------|
| (ক) সড়কপথ | (খ) রেলপথ |
| (গ) আকাশপথ | (ঘ) সমুদ্রপথ |

৪। উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা—

- i. সময়ের সাধারণ
- ii. পরিবহন খরচ কম
- iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। সায়হান গত শীতের ছুটিতে রাজশাহী থেকে তার ফুফুর বাড়ি সিলেট বেড়াতে যায়। সে কম খরচে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিন পর সেখান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সে খাগড়াছড়ির আলুটিলা সুড়ঙ্গপথ দেখতে যায়।
- ক. স্বল্প খরচের যোগাযোগ পথের নাম কী?
 - খ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - গ. সায়হানের রাজশাহী থেকে ফুফুর বাড়ি যাওয়ার পথটি মানচিত্রে নির্দেশ কর।
 - ঘ. সায়হানের ‘সিলেট থেকে চট্টগ্রাম’ এবং ‘চট্টগ্রাম থেকে আলুটিলা’ পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।

সাল	রঞ্জনি আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫	৩১,২০৮.৯০	৪০,৬৮৫.০
২০১৬	৩৪,২৫৭.২	৩৯,৭১৫.০
২০১৭	৩৪,৬৫৫.৯০	৪৩,৪৯১.০
২০১৮	৩৬,৬৬৮.২০	৫৪,৪৬৩.২০

- ক. আমদানি বাণিজ্য কী?
- খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রঞ্জনির সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন?
- গ. উপরের সারণিতে কোন বছর রঞ্জনি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উল্লিখিত সারণি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য

Development Activities of Bangladesh and Environmental Balance

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিটি উপাদান একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। উষ্ণিদ, ক্ষুদ্রজীব, প্রাণী, মানুষ প্রত্যেকে পরিবেশের একটি সহনশীল অবস্থায় বসবাস করে। তার পরিবেশের সহনশীল অবস্থার পরিবর্তন হলে এই নির্ভরশীলতা ব্যাহত হয়। যে কোনো দেশের জন্য উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন নির্ভর করে অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর। যা আমাদের দেশে এখনও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরকিছুই করতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। টেকসই ও উন্নয়ন পরিবেশ সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- পরিবেশের ভারসাম্য এবং ভারসাম্যহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় কীভাবে পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারব।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকে সচেতন করব।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য (Development activities & Sustainable environment)

একটি দেশের জন্য উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ ও দেশ চায় উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে। এজন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু উন্নয়ন সাধন করতে হয়। পরিবেশের সমস্য করে এ সকল উন্নয়ন করা উচিত। আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিচালনা করব যেন তা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে।



তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা যদি কাঁচা বা ভাঙা থাকে দেখবে কিছুদিন পর তা নতুন করে তৈরি বা মেরামত করে ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে। আবার তোমার চারপাশে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে পাবে যে, টিন বা কাঠের বাড়িগুলো পরিবর্তিত হয়ে ইটের দালান হচ্ছে। এই যে চাহিদার সঙ্গে কোনো কিছুর উপযোগিতা বৃদ্ধিরণ, এটাই উন্নয়ন।

এরূপ সেতু, বাঁধ, শিল্পকারখানা, সড়কপথ, রেলপথ এমনভাবে তৈরি করা যা পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের স্বাভাবিকতা বাঁধাইন্ত না করে। বাংলাদেশ উভর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। ফলে পূর্ব-পশ্চিমায়ি স্তুল যোগাযোগে অধিক সেতু নির্মাণ জরুরি। বন্যার পানি যাতে দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। শিল্প বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীকে দুষ্প্রিয় করে ফেলেছে। নদী ভরাট করে শিল্প গড়ে উঠছে। জলাধার ভরাট করে বসতি তৈরি করে শিল্পকারখানা সৃষ্টি হচ্ছে, যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এমনভাবে করা উচিত যা পরিবেশ ও সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

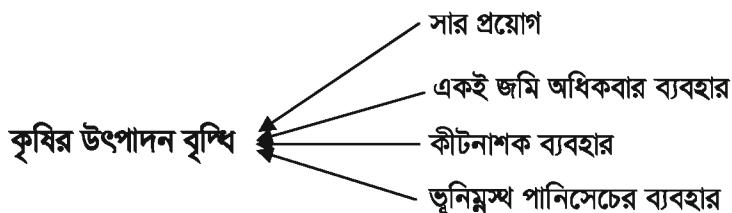
একটি পুরুরের চারপাশের গাছপালা ধ্বংস করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করলে, পুরুরের প্রথমে ক্ষুদ্র উষ্ণিদ, প্রাণী পরে মৎস্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে পুরুরটি মজা পুরুরে পরিণত হবে ও দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ আহরণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (Some development activities of Bangladesh)

পূর্বের আগোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী কোনো কিছুর উপযোগিতা বৃদ্ধিরণ হচ্ছে উন্নয়ন। আমাদের আলোকশক্তি ব্যবহারের দিকে তাকালে সহজে তা বুঝতে পারব। আমরা তেল সরাসরি ব্যবহার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে অর্থকার দূর করতাম। এখন তেল, গ্যাস বা কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যা দ্বারা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। এর আলোকশক্তি অনেক বেশি। এই পরিবর্তন হচ্ছে উন্নয়ন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

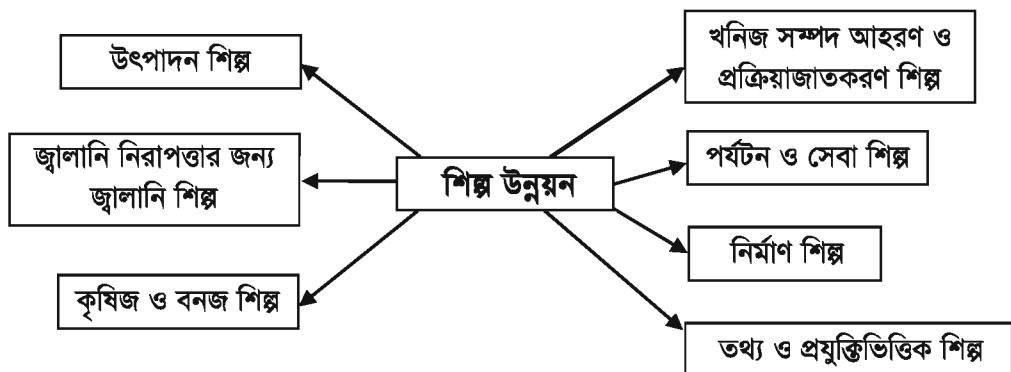
কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in agriculture sector)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষিখাতের উপর বহুলাখণ্টে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষির অগ্রগতি প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই জমিতে বছরের সকল সময়ই চাষ হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য আমরা যা করছি তা নিম্নরূপ :



শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in industrial sector)

সামাজিক অগ্রগতির জন্য দ্রুত শিল্প উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরোক্তভাবে শিল্পখাতে উন্নয়ন করা হয়।



যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in transport and communication sector)

কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে যোগাযোগ। তাই যোগাযোগের উন্নয়নের উপর দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। যুগোপযোগী, সুসংগঠিত এবং আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরোক্ত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টিভি, রেডিও, প্রযুক্তির বিকাশ দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এছাড়া মহাসড়ক, সেতু, ফেরিঘাট নির্মাণ ও ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

বাসস্থানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in housing sector)

বাসস্থানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেশের অন্যান্য উন্নয়নের উপর কিছুটা নির্ভর করে। এটা অবকাঠামোগত উন্নয়ন (চিত্র ১৩.১)। বাসস্থানের উন্নয়নের জন্য খাওয়ার পানি, স্বাস্থ্যসম্বত্ত স্যানিটেশন, বর্জ্যের জন্য উন্নত প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের সমান্বিত রূপ হচ্ছে বাসস্থানের উন্নয়ন।

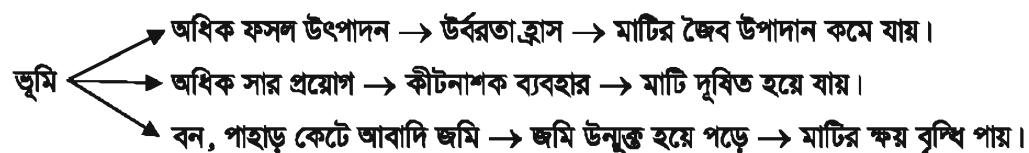


বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ দূষণ

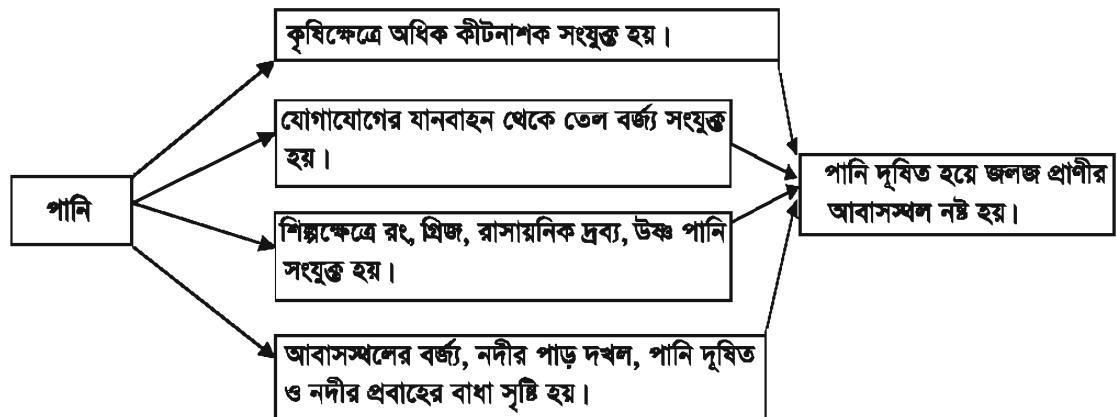
(Development activities in Bangladesh and environment pollution)

চিত্র ১৩.১ : অবকাঠামোগত উন্নয়ন

উন্নয়ন সকল দেশের কাম। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হলে তা দেশের জন্য মঙ্গল। স্বল্প শিক্ষা, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অধিক লাভের আশায় আমরা পরিবেশকে দূষিত করি। পরিবেশের প্রধান উৎপাদন হচ্ছে জমি বা ভূমি, পানি, বায়ু এবং বনজ সম্পদ। পূর্বালোচিত উন্নয়নসমূহ পরিবেশের প্রধান উৎপাদনগুলোকে কীভাবে দূষিত করে তা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি।



ফলাফল : মাটিতে যেসব অণুজীব, ক্ষুদ্রজীব বাস করে তা বাধাগ্রস্ত হয়। বন্য ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর আবাসস্থল নষ্ট হয়। দূষিত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, ফলে ভূমি মরুকরণ হয়।



ফলাফল : অসম স্থল উচ্চিস প্র্যাকটিন, কচুরিশানা, শেওলা জন্মাতে পারে না। এদের কর্তৃত, যেসব ক্ষয় মাছ তাদের খাদ্যের অভাব হয়, বড় মাছ অভিষ্ঠত হয়।



ফলাফল : এগুলো বাংলা কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও ক্লোরোফ্রোরো কার্বন (CFC) গ্যাস-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যাই কলে মিনহাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাগমাঝাকে বৃদ্ধি করছে। পরোক্ষ ফল হিসেবে বৃষ্টিশান্ত করে যাচ্ছে। যাচি অধিক ভাগমাঝা গ্রহণ করছে। ফলে অনেক হান উচ্চিসামী হয়ে পড়ছে।

বনজ সম্পদ (Forest resources)

বনজ সম্পদ কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান। আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ শতাংশ। জারুপাও আমরা এই বনজ বোপাড়, কাঠ প্রকৃতি আসবাবপত্র, পৃথনির্মাণ, শিল্প ও ছালানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। ফলাফল হিসেবে বনজ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বন উচ্চাড় হচ্ছে, যাচি উন্নত হয়ে পড়ছে। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়ে যাচ্ছে মুক্ত সাথে মৃত্তিকার উর্বরতাত্ত্বাস পাচ্ছে।

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিপত্তি (The result of environmental imbalance)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সম্পদের অধিক ব্যবহারের ফলে আমাদের বে তিন ধরনের বাস্তুসংস্থান বিদ্যমান (অসম, বনজ, হ্রদয়) প্রভ্যেক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। অসম বাস্তুসংস্থান নষ্ট হওয়ার ফলে অনেক অসম প্রাণী ও মাছ বিলুপ্ত। বনজ সম্পদের অনেক বৃক্ষ বিলুপ্ত ও কিছু বৃক্ষ বিলুপ্তির মুখে। অনেক বনজ প্রাণী অসম হয়েছে। বনবিহুল প্রজ্ঞতির বাস্তুসংস্থান নষ্ট হয়েছে, যা খাদ্য পুঁজিকে তৈরি দিয়েছে। এর প্রতাব হ্রদয় প্রাণীর বাস্তুসংস্থানের উপর তথা যানব্য সমাজের উপর নেতৃত্বাত্মক প্রভাব পড়েছে। আমরা দেখতে পাই অভিজিত মাঝায় সম্পদ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে উচ্চরাখালে উচ্চতাতা এবং শৈক্ষ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বৃক্ষবন্ধ ও অলোক্তাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চত বিশেষ অভিজিত শিল্পকেন্দ্রের কারণে মিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের দেশের সম্মুখ উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সাতকীরা, নড়াইল,

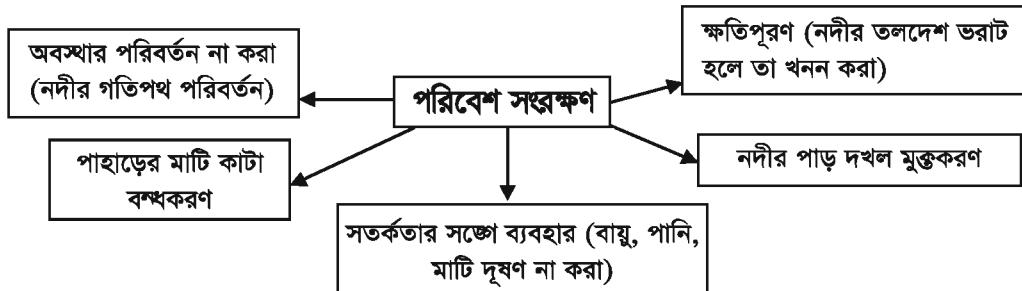


চিত্র ১৩.২ : উপর্যুক্ত অঞ্চলে স্বপ্নাত্মক বৃদ্ধি

বরিশাল, নোয়াখালী জেলার অনেক অংশ সমুদ্রের জলময় হয়ে পড়বে। এছাড়া ভূনিমস্থ পানিতে গোনা পানি প্রবেশ করছে। ফলে স্বাভাবিক উষ্ণিদি জন্মানোর পরিবেশ বিন্মিত হচ্ছে (চিত্র ১৩.২)। পাহাড় ও ভূমিধস বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের বিভিন্ন সংক্রমণ রোগ, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, পেটের পীড়া। এভাবে চলতে থাকলে পুরো পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। দেখা দেবে নানা বিপর্যয়। তাই সহনশীল ও টেকসই পরিবেশ আমাদের কাম্য। আমরাই আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় (The techniques of keeping the balance of environment)

আমরা পরিবেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। এই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হলে পরিবেশ টিকে থাকবে। তাই সম্পদের সংরক্ষণ তথ্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর হতে হবে।



পরিবেশ দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে কিন্তু তাকে কে রক্ষা করবে? এর দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের উচিত পরিবেশের উপাদানের প্রতি যত্নশীল হওয়া, সতর্কতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহার করা। তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যাবে।

বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চলে অবৈধ প্রবেশ ও ঝুঁটানির উদ্দেশে ব্যাপক গাছপালা নিধন ইত্যাদি কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ প্রভৃতি রোধ করলে তবে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব।

দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বন সম্পদের ঘাটাতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্পকারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

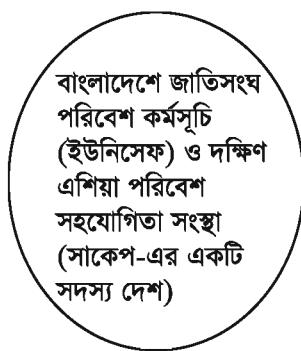
বন সংরক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- ১। নিঃশেষিত পাহাড় এবং খাস জমিতে বনের বিস্তার ঘটানো।
- ২। গ্রামীণ এলাকায় পতিত ও প্রাস্তিক জমিতে বৃক্ষরোপণ।

- ৩। সড়কপথ, রেলপথ ও সকল প্রকার বাঁধের পাশে বনায়ন।
- ৪। বনায়ন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।
- ৫। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

জ্বালানি ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে হবে। সৌর, বায়ু, পানি, বায়োগ্যাস, সমুদ্র, পশু এবং মানব শক্তিকে ব্যবহার করে নতুন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

- ১। পরিস্থিতি ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ
- ২। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর্যুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- ৩। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- ৪। সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলা
- ৫। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ
- ৬। নদী বাঁচাও কর্মসূচি
- ৭। ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ



জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস যেমন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব মরুভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক ওজেন দিবস ইত্যাদি পালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত নীতি, সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন, পরিবেশসম্বৃত টেকসই পদ্ধতি প্রয়োজন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে সরকার ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

একই পরিবেশে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে। পরিবেশ ভারসাম্য পূর্ণ হয় এই ধরনের জীবের একত্রে অবস্থানের কারণে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity)

জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মূল উপাদান। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, ঔষধ, বিনোদন ইত্যাদির জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এ সকল সম্পদ বনাঞ্চল, নদী-নালা, অন্যান্য জলাশয় ও সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়।

মানুষের অপরিগামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবাধে চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০-২৫ শতাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য প্রচুর এবং তার সম্ভাবনাও অনেক। তবে তা আজ হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সংকুচিত হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল। তারা হারিয়েছে তাদের শিকারের ক্ষেত্র। এককালে বাংলাদেশের অনেক এলাকা জুড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা ডোরাকাটা বাঘ দেখা যেত। এখন তাদের কেবল সুন্দরবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শুরুতে ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় অঞ্চলে হাতির দেখা মিলেছে। এখন কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ময়মনসিংহের পাহাড়েই হাতি দেখা যায়।

বাংলাদেশে ১১৯ জাতের শন্যপায়ী, ৫৭৮ জাতের পাখি, ১২৪ জাতের সরীসৃপ ও ১৯ জাতের উভচরকে শনাক্ত করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার কর্তৃক প্রকাশিত রেড ডাটা বুক-এ বাংলাদেশের ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হাতি, অজগর, কুমির ও ঘড়িয়াল ইত্যাদি। কারো মতে বাংলাদেশে ২৭টি বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন। আরও ৩৯টি প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন। উনিশ শতকেই ১৯টি প্রজাতি বাংলাদেশ থেকে নিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে আছে তিন ধরনের গরু, বুনো মহিষ, এক ধরনের কালো হাঁস, নীল গাই, কয়েক ধরনের হরিণ, রাজশুকুন ও মিঠা পানির কুমির ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন জরুরিভিত্তিতে দৃঢ় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, এনজিও, বেসরকারি খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার এবং নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমীক্ষা গ্রহণ।
- জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে তা সম্মতকরণ।
- ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য পরিবেশগত সুবিধা প্রদানকারী প্রতিবেশ-ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।
- জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উৎসাহিত ও সম্মুক্তকরণ।

- সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বাস্তুর (Natural habitat) সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-

- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ইকো-সিস্টেম-এর উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
- আন্তঃদেশীয় সীমানায় অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা বন্ধ এবং বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে অতিসম্প্রতি সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দুদমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং তাঁঘারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশের কোন জেলা জলমগ্ন হবে?

- | | |
|---------------|--------------|
| (ক) নোয়াখালী | (খ) দিনাজপুর |
| (গ) রংপুর | (ঘ) বগুড়া |

২। পরিবেশের অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজন-

- i. সমন্বিত নীতি
- ii. সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন
- iii. পরিবেশসম্বত্ত টেকসই পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও :

সুমি শীতের ছুটিতে খুলনায় মামার বাসায় বেড়াতে যায়। একদিন মামার সঙ্গে সুন্দরবন দেখতে গেলে সে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি দেখতে পায়। সে মামার কাছে জানতে পারে অতীতে এ বনে আরও বেশি জীবজন্তু ও গাছপালা ছিল।

৩। সুমির দেখা বনভূমিতে পাওয়া যায়—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (ক) কড়ই, গজারি | (খ) গরান, গোলপাতা |
| (গ) চাপালিশ, তেলসুর | (ঘ) শাল, সেগুন |

৪। উক্ত বনভূমি ধ্বংস হলে—

- i. ভূগর্ভস্থ পানির লবণ্যাকৃতা বাড়বে
- ii. উক্ষিদ জন্মানোর পরিবেশ নষ্ট হবে
- iii. জলোচ্ছবিসে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। একদল শিক্ষার্থী শীতলক্ষ্য নদীতে নৌকামণে যায়। সেখানে তারা নদীর পানির স্বাভাবিক রং না দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়।

- ক. জলজ ক্ষুদ্র প্রাণীর নাম কী?
 - খ. মাটি দুর্যোগ কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. শিক্ষার্থীদের দেখা নদীটির পানির রং স্বাভাবিক নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উক্ত নদীর পানির রং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?
- তোমার মতামত দাও।

২। কনক ও কাকন সাভার যাওয়ার পথে আমিন বাজার পার হওয়ার পরেই চোখে ঝঁ঳াপোড়া অনুভব করে। তারা দেখতে পেল রাস্তার উভয় পাশে অনেক ইটের ভাট্টা।

- ক. বায়ু দূষণ কী?
- খ. পরিবেশের ভাসাম্যহীনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. কনক ও কাকনের চোখ ঝঁ঳াপোড়া করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশ উক্ষিদকুলের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

Natural Disaster of Bangladesh

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। সূর্যোদয়, অগোছাস, বন্দা, ঘৰা ইভজাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছৰই আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের বিশুল অভিসাধন করে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এসব দুর্যোগের অন্যতম কারণ।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- দুর্যোগ ও বিলম্বের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ণনা করতে পারব।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্ৰ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকল্পের যাত্রা ও সুসামীলন পূর্ণাত্মক দৃশ্যান্বয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্বনারিটা মূল্যায়ন করতে পারব।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কলমীয়া সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকে সচেতন করব।

দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Disaster and Hazard)

আমাদের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিপর্যয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। দুর্যোগ হচ্ছে এরূপ ঘটনা, যা সমাজের স্বাতান্ত্রিক কাজকর্মে প্রচলিতভাবে বিন্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি মোকাবিলা করা দুষ্পাদ্য হয়ে পড়ে। দুর্যোগ কোনো স্থানের জনবসতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে ঐ জনবসতি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। এর জন্য বাইরের সাহায্য বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বিপর্যয় বলতে বোঝানো হয়েছে কোনো এক আকস্মিক ও চরম প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ঘটনাকে। এই ঘটনা জীবন, সম্পদ ইত্যাদির উপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বন্যা (Flood)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। এ দেশের মানুষের কাছে বন্যা যেমন ভয়াবহ তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অগ্রিমীম প্রভাব ফেলে।

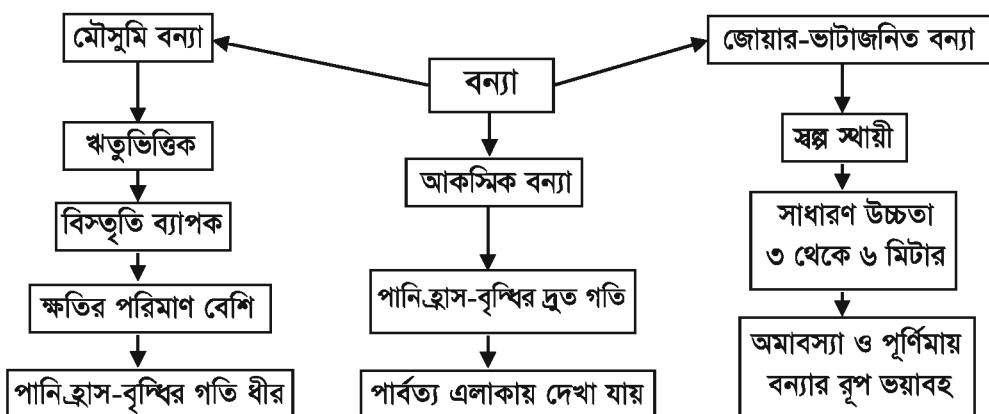
প্রকৃতপক্ষে এ দেশের প্রেক্ষিতে কোনো এলাকা প্রাবিত হয়ে যদি মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হয় তাহলেই বন্যা হয়েছে ধরা হয়।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও বৃক্ষিবহুল দেশ। এখানে বার্ষিক বৃক্ষিপাতের পরিমাণ ২,৩০০ মিলিমিটার। ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীসহ ৭০০টি নদী এ দেশে জালের মতো বিস্তার করে আছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎসস্থল ভারতে অবস্থিত।

বন্যার কারণ (Causes of Flood)

প্রাকৃতিক কারণ	মানবসৃষ্ট কারণ
উজানে প্রচুর বৃষ্টি।	নদী অববাহিকায় ব্যাপক বৃক্ষ কর্তন।
ভৌগোলিক অবস্থান।	গঞ্জা নদীর উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ।
মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব।	অন্যান্য নদীতে নির্মিত বাঁধের প্রভাব।
মূল নদীর গতীরতা কম।	অপরিকল্পিত নগরায়ণ।
শাখানদীগুলো পলি দ্বারা আবৃত।	
হিমালয়ের বরফগলা পানিপ্রবাহ।	
বঙ্গোপসাগরের তীব্র জোয়ার-ভাটা।	
ভূমিকক্ষ।	

বন্যার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Flood)



বাংলাদেশের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। বন্যায় এলাকা প্লাবিত হয়ে বিপুল পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়। মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পশুপাখির জীবন বিনষ্ট ও বিপন্ন হয়। ধ্বংস হয় সম্পদ। ২০০০ সালের বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টার জমির ফসল বিনষ্ট হয়। উৎপাদন আকারে এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

কাজ : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তের পরিসংখ্যান থেকে শেষ পাঁচ বছরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শতকরা মান স্তম্ভ শেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দীপ বাংলাদেশ তথা এ ঢালু সমভূমির দেশে বিভিন্ন শতাব্দীতে বন্যা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ সালের বন্যা ছিল ভয়াবহ। এর মধ্যে ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় সবচেয়ে বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাতের যে রেকর্ড রয়েছে তা তুলনাহীন বলা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণেই বন্যা এ দেশের একটি চির পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই বলা যায় দুর্যোগ এবং বিপর্যয় পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। এ বিপর্যয়কে পরান্তু করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অতীতকাল থেকেই মানুষ বন্যা প্রতিকারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে।

এসো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক :

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Flood Control Measures)

ক. সাধারণ ব্যবস্থাপনা (General management)

- (১) সহজে স্থানান্তরযোগ্য বসতি তৈরি করা।
- (২) নদীর দু তীরে ঘন জঙ্গল সৃষ্টি করা।
- (৩) নদী-শাসন ব্যবস্থা সুনির্ণিত করা।
- (৪) বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- (৫) পুকুর, নালা, বিল প্রভৃতি খনন করা এবং সেচের পানি সংরক্ষণ করা।
- (৬) প্রতি বছর বন্যা মোকাবেলার জন্য সরকারিভাবে স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা।

খ. শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা (Labour intensive and expensive engineering management)

- (১) ড্রেজারের মাধ্যমে নদীর পানির পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- (২) সন্তুষ্টি স্থানে জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে পানিপ্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা।
- (৩) ভারত থেকে আসা পানিকে বাঁধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন করা।
- (৪) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
- (৫) নদী তীরকে স্থায়ী সুদৃঢ় কাঠামোর সাহায্যে সংরক্ষণ করা।

গ. সহজ প্রকৌশলগত ব্যবস্থাপনা (Easy engineering management)

- (১) নদীর দু তীরে বেড়িবাঁধ দিয়ে নদীর পানি উপচেপড়া বন্ধ করা।
- (২) দেশের সর্বত্র বনায়ন সৃষ্টি করা।
- (৩) রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা।
- (৪) বন্যা প্রবল অঞ্চলে সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের উপরে ‘আশ্রয়কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা করা।
- (৫) শহর বেষ্টনীমূলক বাঁধ দেওয়া।

কাজ : কোনো বন্যা উপস্থৃত এলাকায় তোমরা সাহায্যের জন্য যাওয়ার সময় কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে ছক আকারে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

বন্যা এ দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করে। তাই বলা যায় বন্যা বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রচেষ্টা পরিকল্পনাধীন আছে। বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর উৎস চীন, নেপাল, ভারত ও ভুটান। এ ৩টি নদীর মোট অববাহিকা এলাকার পরিমাণ ১৫,৫৪,০০০ কিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ এলাকা এ দেশে অবস্থিত। কিন্তু এসব নদী প্রবাহের ৮০ শতাংশেরও বেশি পানি বাইরে থেকে আসে এবং বন্যার জন্য দায়ী ৯০ শতাংশ পানিই এ ৩টি নদী নিয়ে আসে। তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি ত্রাস করার জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা।

খরা (Drought)

দীর্ঘ সময় বৃক্ষ না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থা তাকে খরা বলে। অনেকদিন বৃক্ষহীন অবস্থা থাকলে অথবা অপর্যাপ্ত বৃক্ষগাত হলে মাটির আর্দ্ধতা কমে যায়। সেই সঙ্গে মাটি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা কোমলতা হারিয়ে বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত করে খরার পরিপন্থ হয়।

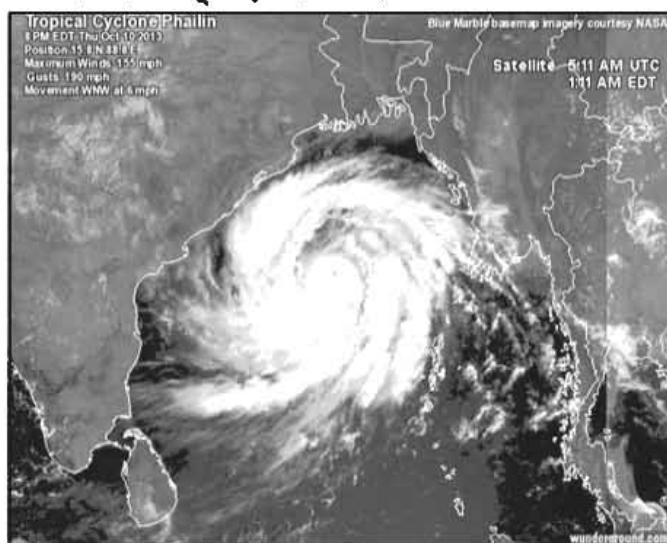
অনাবৃষ্টি বা খরার প্রভাব (Rainless or Impact of drought)

- ◆ আমাদের দেশে উভচ-পূর্বাঞ্চলে খরার প্রভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কমে যায়।
- ◆ খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
- ◆ উপদ্রুত অঞ্চলে পানির অভাব দেখা দেয়।
- ◆ প্রবল উভাঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থির প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- ◆ পরিবেশ বৃক্ষ হয়ে ভর্তো হয়।
- ◆ অগ্নিকাণ্ডের উপদ্রব বেড়ে যায়।

বৃক্ষহীন ও খরাবৃক্ষ পরিবেশ মানুষ ও জীবজগতের স্বাভাবিক কাজকর্মের বিষ সৃষ্টি করে। বনজ সম্পদ বৃক্ষ তথা অধিক বৃক্ষরোপণ করে এবং স্কোর্চ পানির ব্যবহার কমিয়ে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্বোগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চূর্ণিবাঢ়ি (Cyclone)

প্রচল শক্তিশালী এবং মারাত্মক ধ্বনিকারী বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্বোগের মধ্যে চূর্ণিবাঢ়ি উল্লেখযোগ্য। হাল অনুসারে চূর্ণিবাঢ়ির বিভিন্ন নামকরণ হয় তা তোমরা পূর্বেই জেনেছ। চূর্ণিবাঢ়ি কেন্দ্ৰমুখী ও উত্তরমুখী বায়ুবৃক্ষে পরিচিত। এর কেন্দ্ৰস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিৱাজ করে। বাংলাদেশে আল্বিন-কাৰ্তিক এবং চৈত্ৰ-বৈশাখ মাসে এ চূর্ণিবাঢ়ি সংঘটিত হয় (চিত্র ১৪.১)। বৰ্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে চূর্ণিবাঢ়ি হয় এবং একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে ফানেলাকার আকৃতির কারণে এ দেশে অধিকসংখ্যাক চূর্ণিবাঢ়ি সংঘটিত হয়।



চিত্র ১৪.১ : চূর্ণিবাঢ়ি

কাজ : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে মানুষের মৃত্যু ব্যাতীত আর কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘূর্ণিঝড় একটি সাময়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গত তিন দশকে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বেশি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, সন্দীপ, হাতিয়া, কুতুবদিয়া, উরিচর, চর জবাবার, চর আলেকজান্ডার প্রভৃতি স্থানে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের সময়কাল, নাম ও মৃত মানুষের সংখ্যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ১: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়

সংঘটিত হওয়ার সাল	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম	মৃত মানুষের সংখ্যা
১২ই নভেম্বর, ১৯৭০	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ৫,০০,০০০ জন
২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৮	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ১,০৮,০০০ জন
২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ৫,৭০৮ জন
১৫ই নভেম্বর, ২০০৭	সিডর	প্রায় ৩,৪৪৭ জন
২৫শে মে, ২০০৯	আইলা	প্রায় ৩৩০ জন

নদীভাঙ্গন (River Bank Erosion)

নদীখাতে পানিপ্রবাহের কারণে পার্শ্ব ক্ষয়কে নদীভাঙ্গন বলে। পলিমাটি গঠিত সমভূমি অধ্যয়িত বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর প্রচুর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়। অনেক মানুষের জীবনহানি ঘটে।

কাজ : নদীর গতিপথ অবস্থার নাম উল্লেখ কর।

১	২	৩

নদীভাঙ্গনের কারণ (Causes of river bank erosion)

- জলবায়ু পরিবর্তন।
- নদীর প্রবাহপথ ও তীব্র গতিবেগ।
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন।
- নদীগর্ভে শিলার উপাদান।
- রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি।

- বাহিত শিলার কঠিনতা।
- নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি।
- বৃক্ষ নিধন।

কাজ : নদীভাঙ্গনের কারণগুলো কীভাবে নদীভাঙ্গনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে? দলে বিস্তৃত হয়ে দুটি কারণ ব্যাখ্যা কর।	
কারণ	কার্যকরী ভূমিকা
১।	
২।	



চিত্র ১৪.২ : নদীভাঙ্গন

সব আয়তনবিশিষ্ট বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনকে একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্বোগ বলে। বর্ষাকালেই নদীভাঙ্গন বেশি হয়। বিশেষত প্রায় প্রতি বছর বন্যা মৌসুম ও সন্নিহিত সময়ে প্রায় ৪০টি ছেট-বড় নদীতে নদীভাঙ্গন দেখা যায়। অনেক সময় নদী-তীরে খরাজনিত ব্যাপক ফাটলের সৃষ্টি হলে তার প্রভাবেও নদীতে ভাঙ্গন ধরে এবং ভূমির অংশবিশেষ নদীগর্ভে বিলীন হয় (চিত্র ১৪.২)। নদীভাঙ্গনে ভূমির যে ক্ষয় হয় তা অপূরণীয়। এছাড়া আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

নদীভাঙ্গনজনিত ক্ষয়ক্ষতি (Loss from river bank erosion)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদীভাঙ্গন এ দেশের জন্য নিয়মিত সমস্যা বলা যায়। নদীভাঙ্গনের ক্ষতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ দেশে প্রতি বছর পঞ্চা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তাসহ প্রায় ৪১০টি নদী-উপনদীতে বন্যা এবং সন্নিহিত নদীতে ভাঙ্গনের ঘটনা ঘটে। এ দেশের মানুষ নদীভাঙ্গন নামক দুর্যোগের সঙ্গে কমবেশি জড়িত। এর মধ্যে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙ্গনের ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক আশ্রয় নেয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা এবং বাঁধের উপর। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৮,৭০০ হেক্টের জমি নদীভাঙ্গনে নিঃশেষ হয়ে যায়।

নদীভাণ্ডন ক্ষতিগ্রস্ত উপায়ন

আমাদা	কমল
চাষব্যোগ্য জমি	গুবানি পুরু
দুর্বোল আশ্রয়কেন্দ্র	গীহগাঁথা
বৈদ্যুতিক টাঙ্গান	সেচ প্রকল
পানিবাহিক অন্যান্য সম্পদ	সামাজিক প্রতিষ্ঠান
বসতবাণি	

কথা : বাংলাদেশের মানচিত্রে পৰা ও পৰুনা নদীর ভাণ্ডন সংষ্টিত স্থানসমূহ নির্দেশ কৰ।

নদীভাণ্ডন বাংলাদেশের একটি চলমান প্রক্রিয়া বিশেষ। এ দেশের প্রধান নদী ও শাখানদী হারা কমবেশি নদীভাণ্ডন প্রক্রিয়া চলে। দেশের আর ১০০টি উপজেলার নদীভাণ্ডন সংষ্টিত হয়। কুন থেকে সেলেটুর মাঝে মৌসুমি বাহুর প্রভাবে প্রকল বৃক্ষিপাতে নদীভাণ্ডনে অঞ্জি মালিকগাঁথ স্বচেতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা কখনই আর সে জমি পুনরুৎসাহ করতে পারে না। এ কারণে স্থূলিহীন মানুষের হানুক্তর ঘটে। এদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের স্বীকৃত থাকে না। সেই সঙ্গে তারা সামাজিক পর্যাদান হারায়। কল্পন্তু তারা দুর্ভিক্ষের সাথী হয়ে শহুর-নগরের ভাসমান মানুষে পরিষ্কত হয় এবং সর্বোপরি সরকারের বোধা হয়ে দাঢ়ায়।

ভূমিকল্প (Earthquake)

বাংলাদেশ যেহেতু মহাসাগরগুলো থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সেহেতু এ দেশকে সরাসরি সামুদ্রিক ভূমিকল্পক্ষেবৎ অক্ষণ হিসেবে ক্ষেমন চিহ্নিত করা যায় না। তবে বাংলাদেশের উত্তরে আসামের খাসিরা ও অরুণালি পাহাড়, হিমালয়ের পাসদেশ, আক্ষয়ানন্দ গীগঁগুজ ও বলোগন্সাগড়ের ভূমিকল্প অবস্থা যথেক্ষে লক্ষ করা যায়। এছাড়াও নরেহে ঝুঁ-গাঠনিক গতিবয়স। সামগ্রিক দিক হতে দেখা যাই বাংলাদেশ কমেই বৃক্ষিগুরু হয়ে উঠেছে (চিত্র ১৪.৩)।



চিত্র ১৪.৩ : ভূমিকল্প বিস্ফুট ভবন

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল রয়েছে টায়পিয়ারি যুগের পাহাড়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সব সৌজন্যশিঙ্ক ভূতিগ্রস্ত পাহাড়গুলোকে আসামের কুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগ্রামীয় বলে ধরা হয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, সেলগাথর এবং কর্দম হারা গঠিত। গঠনশুভ কারণে এ চতুর ভূমিকল্পক্ষেবৎ।

আবার রয়েছে পুরাতন পলল গঠিত প্লাইস্টেচিনকালের সোপানসমূহ— বরেষ্মভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। বাকি অংশ নবগঠিত প্লাবন সমভূমি। সুতরাং ভূতাত্ত্বিক গঠনগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশেষত উত্তর ও পূর্ব দিক যথেষ্ট ভূমিকম্পাপ্রবণ অঞ্চল।

উত্তরে হিমালয় চতুর এবং মালভূমি, পূর্বে মিয়ানমার আরাকান ইয়োমার অস্তিত্ব এবং উত্তর-পূর্বে নাগাদিসাং-জাফলং অঞ্চলের সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশি ভূমিকম্পাপ্রবণ করে তুলেছে।

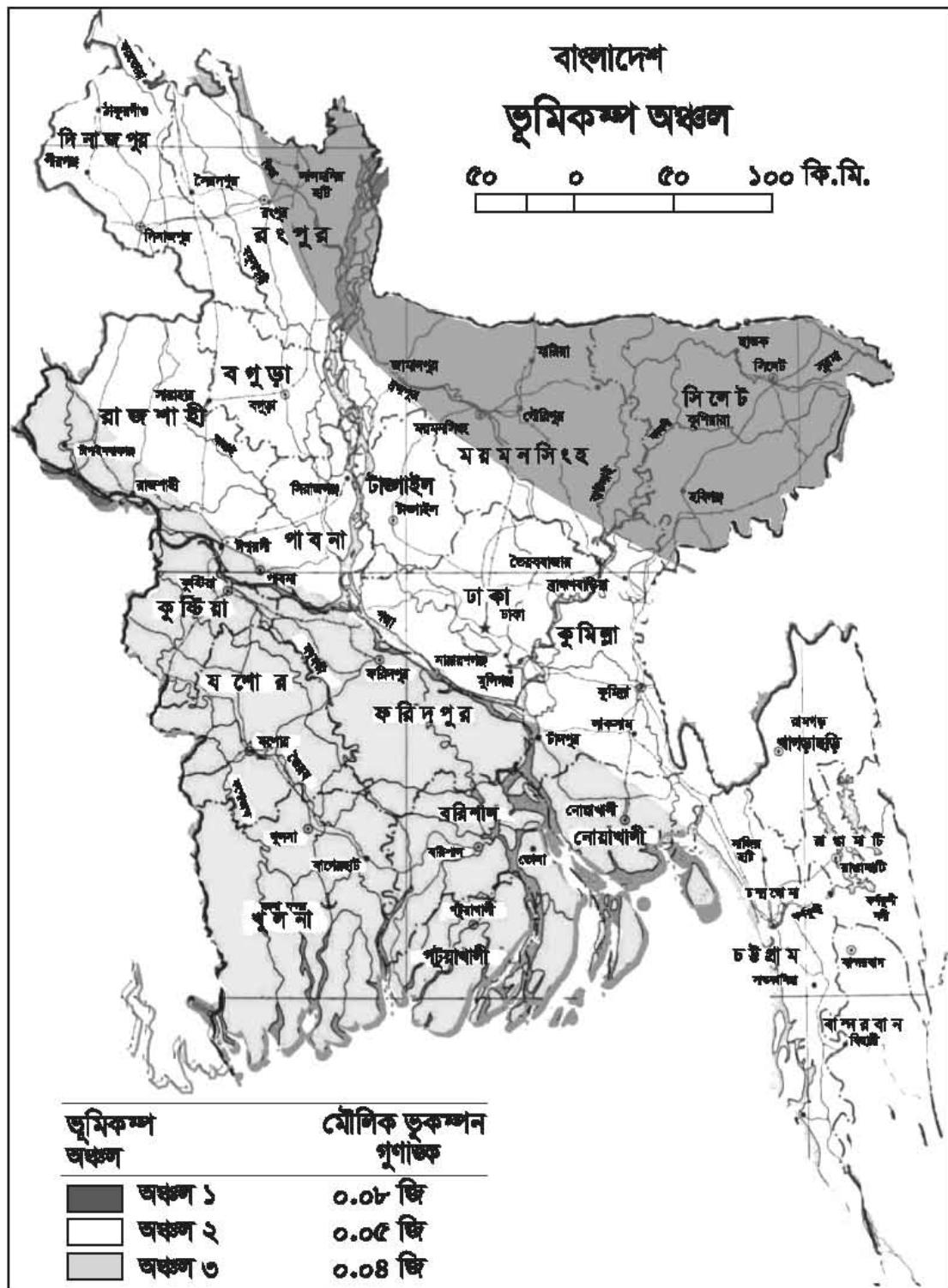
১৫৪৮ সাল থেকেই বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প সংক্রান্ত রেকর্ড সংগৃহীত শুরু হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র উপকেন্দ্রের সঙ্গে তিন ধরনের পরিমাপ সম্পর্কযুক্ত। অগভীর কেন্দ্র (০-৭০ কিলোমিটার), মধ্য পর্যায়ের কেন্দ্র (৭০- ৩০০ কিলোমিটার) এবং গভীর কেন্দ্র (১,৩০০ কিলোমিটার)। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপকেন্দ্র না থাকলেও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে তার প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশেও ভূকম্পন অনুভূত হয়।

১৯৯৩ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে তিনটি ভূকম্পনীয় সংঘটিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা— অঞ্চল ১ (মারাতক ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার ক্ষেল মাত্রা ৭); অঞ্চল ২ (মারারি ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার ক্ষেল মাত্রা ৬); অঞ্চল ৩ (কম ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার ক্ষেল মাত্রা ৫)। এ তিনটি অঞ্চলের অধীনে রয়েছে যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (চিত্র ১৪.৪)। বাংলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি ভূমিকম্পের সময়কাল, রিখটার ক্ষেল মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতি নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ২ : বাংলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি ভূমিকম্প

সাল	রিখটার ক্ষেলে	ক্ষয়ক্ষতি
১২ই জুন, ১৮৯৭	৮.৭ মাত্রায়	ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন
২২শে নভেম্বর, ১৯৯৭	৬.০ মাত্রায়	চট্টগ্রাম শহরে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়
২৭শে জুলাই, ২০০৮	৫.১ মাত্রায়	ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়

উৎস : বাংলাপিডিয়া



চিত্র ১৪.৪ : বাংলাদেশের ভূকম্পনীয় সংবিহিত অঞ্চল

কাজ : ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক ৪টি কাজের তালিকা তৈরি কর।

ভূমিকম্পে করণীয় (What is to be done in earthquake)

বাড়িতে থাকাকালীন বৈদ্যুতিক সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে। গ্যাসের চুলা বন্ধ করতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

ট্রেনে বা গাড়ির ভিতর থাকাকালীন যদি ভূমিকম্প হয় তবে কোনো জিনিস ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।

লিফটের ভিতরে থাকাকালীন দ্রুত নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে।

লিফটের ভিতরে আটকে পড়লে লিফট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে।

মার্কেট, সিনেমা হল, আন্ডারগ্রাউন্ড, শপিংমলে থাকলে এতদার্থে ভূমিকম্পে আকস্মিক ভীতিকর এক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আগুন লাগাও স্বাভাবিক। তাই এক্ষেত্রে প্রথমে নিচু হয়ে বসে বা শুয়ে থাকা শ্রেয় এবং পরবর্তীতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে।

বাড়ির বাইরে থাকাকালীন বড় দালান-কোঠার নিচে না দাঁড়িয়ে খোলা মাঠে বা স্থানে দাঁড়াতে হবে।

হাতের কাছে সবসময় লোহা কাটা করাত, পানির বোতল, আগুন রোধক রাখতে হবে।

অতীতকাল থেকে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে প্রধানত ভূমিকম্প হয় গঠনগত কারণে। এছাড়া পানির শর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ার কারণেও কিছু স্থান প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। এ দিক দিয়ে ঢাকা শহর উল্লেখযোগ্য। আবার অন্যদিকে ঢাকার উপর নগর গড়ার চাপ থাকায় ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Essential measures)

- ১। ভূমিকম্প সম্বর্কে গবেষণাতন্ত্র সূচিতের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।
- ২। সারাদেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় ‘বিল্ডিং কোড’ এবং কোডের কাঠামোগত অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে।
- ৩। ঢাকা শহরে রাজউকের ভবন নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদনের নীতিমালা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।
- ৪। সারাদেশে রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে।
- ৫। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উন্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যৱস্থা কর্তৃক তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের দণ্ডে সহরক্ষণ করতে হবে।
- ৬। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- ৭। দুর্যোগকবলিত এলাকায় উন্ধার কার্যক্রমের জন্য নৌবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে ‘ডগ ক্ষেয়াড’ রাখা।
- ৮। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন ও মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

৯। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিলেটে নিমীয়মান কেন্দ্রের সঙ্গে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং সিলেট কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা।

কাজ : ভূমিকম্পের পরে দুর্যোগকবণিত এলাকায় বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? আলোচনা অনুষ্ঠান।

সুনামি (Tsunami)

ভূমিকম্পের সঙ্গে সুনামি সংঘটনের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে সুনামি সংঘটনের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচলন নেই। তবে অতীতে ১৭৬২ সালের ২রা এপ্রিল কঞ্চাবাজার এবং সন্মিহিত অঞ্চলে সুনামির প্রভাব ঘটে। মিয়ানমারে আরাকান উপকূলে ৭.৫ রিখটার ক্ষেত্র মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটনের ফলে সুনামির আগমন হয়। ১৯৪১ সালে আশ্মামান সাগরে ভূমিকম্পের ফলে বঙ্গোপসাগরে সুনামি সংঘটন হয়। তবে এর ফলে প্রচল্প আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভারতের পূর্ব উপকূল। যার পরিণতিতে ৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সিন্ধুয়েলুয়ে দ্বীপে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে যে সুনামির আগমন ঘটে তার প্রভাব বাংলাদেশে ঘটতে দেখা যায় এবং লোকের মৃত্যু ঘটে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার আওতায় পড়ে— যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তিনটি :

- (ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা;
- (খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং
- (গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বোঝায়।

নিম্নে প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ ও দুর্যোগের কোন স্তরে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র (Disaster Management Circle)



দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্বপঠুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্য দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। অতীতে দুর্যোগে সাড়াদানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হতো।

প্রতিরোধ (Prevention)

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সফলতা বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যথা— বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকেই বোঝায়। কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন খুবই ব্যয়বহুল, যা অনেক দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন— প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপঠুতি ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

প্রশমন (Mitigation)

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী ত্বাস এবং দুর্যোগ পূর্বপঠুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলে। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় ত্বাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের

আওতাভুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ প্রশমন ব্যবহৃত হলেও সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেড়িঝাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বপ্রস্তুতি (Preparedness)

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়। আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

সাড়াদান (Response)

সাড়াদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তলাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বোঝায়।

পুনরুদ্ধার (Recovery)

দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বোঝায়। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায় ও সহায়তার প্রয়োজন হয়।

উন্নয়ন (Development)

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই ঐ এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ রাখতে হবে।

উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা (Coastal Disaster Management)

উপরিউক্ত যে সকল দুর্যোগ সম্পর্কে বলা হলো তার তিতেরে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলসমূহে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, অন্যদেশের ভূমিকঙ্গের প্রভাব প্রভৃতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা বেশিরভাগই উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল সাধারণত খরা, নদীভাণ্ডন, বন্যা ও ভূমিকঙ্গ দ্বারা প্রতাবিত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন— ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে তাংকশিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক সময়মতো

পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাতিথিক দণ্ডের হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদণ্ডের কাজ করে থাকে। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার জন্য সরকারি আর একটি সংস্থা হচ্ছে স্পারসো। স্পারসো ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদণ্ডেরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। আবহাওয়া অধিদণ্ডের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়ার উপাস্ত সংগ্রহ করে, রাডার চিত্র নিয়ে অঙ্কন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। যদিও ভূমিকঙ্গের পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো কলাকৌশল অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি, তথাপি রিখটার ক্ষেত্রে ভূমিকঙ্গের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্টদের চিকিৎসা, উন্ধার, আগ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন— অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যক্রম যেমন— উন্নয়ন, প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রস্তুতি ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়ে অর্ধাং দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় সফলভাবে পরিচালিত করলে দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাখণ্ডে রক্ষা করতে সক্ষম হবো। তাই যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে আমাদেরকে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত আপদকালীন পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তৈরি করে অনুশীলনের মাধ্যমে এসবের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত্রের পরিমাণ কত মিলিমিটার?

(ক) ২১০০

(খ) ২২০০

(গ) ২৩০০

(ঘ) ২৪০০

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হগো—

- i. ক্ষতির পরিমাণ ত্রাস করা
- ii. আগ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা
- iii. পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সম্প্রতি শ্যামনগর উপজেলায় ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে জান ও মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রফিক ও তার বস্তুরা দুর্গতদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করে ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

৩। রফিক ও তার বস্তুরা যে কাজ করেছে তাকে কী বলা যায়?

- | | |
|--------------|----------------|
| (ক) প্রতিরোধ | (খ) প্রতিকার |
| (গ) সাড়াদান | (ঘ) পুনরুদ্ধার |

৪. উন্নিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি ত্রাস করার উপায়—

- i. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- ii. দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণদান
- iii. গণসচেতনতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii | (খ) i ও iii |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। শিশিরদের পরিবার যমুনা নদীর পারে বসবাস করত। এ বছর বর্ষায় নদীভাঙ্গনের ফলে তারা ঘরবাড়ি ও ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। শিশিরদের পরিবারের মতো আরও অনেক পরিবার রয়েছে যারা এ ধরনের দুর্যোগের শিকার হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে না।

- ক. ভূমিকম্প কী ধরনের দুর্যোগ?
- খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
- গ. শিশিরদের পরিবার যে ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার তার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শিশিরদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের ব্যবস্থা দরকার? তোমার মতামত দাও।
- ২। রূপম তার গ্রামের বাড়ি নরোত্তমপুরে পড়ার টেবিলে পড়াশোনায় ব্যস্ত। হঠাৎ সে টেবিলে একটি ঝাঁকুনি অনুভব করল। সে দেখতে পেল তার ঘরের বুলন্ত বস্তুগুলো এদিক ওদিক দুলছে। সে আরও লক্ষ করল বাইরে ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন ছোটাছুটি করছে এবং পাশ্ববর্তী একটি উচ্চভবন হেলে পড়ছে।
- ক. বিপর্যয় কী?
- খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নমন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. রূপম যে পরিস্থিতি দেখতে পেল তার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উল্লিখিত ঘটনাটি ঢাকা শহরে ঘটলে কী ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি)

আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সংস্থাটি অনেক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে সকলের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবন্ধ। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বয়ে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ’ (এসডিজি) অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা এসডিজি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়। এ কাজে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ অধ্যায়ে এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব, এসডিজি অর্জনের ফলাফল, এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানব।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার ডিজাইন করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব

এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার অংশীদারিত্ব কী? উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন কর্মী বা সরকারের একার পক্ষে উন্নয়ন গতিধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, ভালো ফসল ফলানোর জন্য সরকার বা কোনো উন্নয়ন সংগঠন সার ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করবে। কিন্তু যারা এটি ব্যবহার করবে তারা যদি অসচেতনভাবে মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করে তা কখনো পরিবেশবন্ধব হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনতার সাথে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, ত্বরিত পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আরও সুসমন্বিত করতে হবে।



টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সমাজের উচ্চতলার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে সাধারণ মানুষ এসডিজি অর্জনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। এসডিজি অর্জন কেবল নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

এসডিজি অর্জনে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা যেমন চিন্তা করা হচ্ছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে হবে। তবে সব অভীষ্ঠ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে দেশের জন্য যেসব অভীষ্ঠ অর্জন জরুরি তারা সেগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক

হচ্ছে সার্বিক সক্ষমতা অর্জন। টেকসই উন্নয়নের প্রধান একটি অভীষ্ঠ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে। যে দেশের যে ধরনের সক্ষমতা রয়েছে সে দেশ সেভাবে নিজেদের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামষ্টিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে আসবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না।

কাজ: টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন আলোচনা করে লেখ।

পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

বর্তমান পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এসডিজি বাস্তবায়ন করা জরুরি। বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষকে শক্তি করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষ, সমাজ, কৃষি উৎপাদন, স্থলজ ও জলজ প্রাণিকুলকে ত্রুটাগত মারাত্মক হৃষকিক মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বিবেচনায় এবং সামাজিক সূচকের নিরীক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য কমেছে, আয় বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সক্ষমতাও এসেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা এমডিজি অর্জনে অভূতপূর্ব সফল্য লাভ করেছি। আমরা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে আশাবাদী। আগামী দশকগুলোতে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জন করে চলেছি। এমডিজি অর্জনের হাত ধরেই বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এটিও আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পারব। এর ফলে দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। বৈষম্য কমে আসবে, আয় ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির ফলে বৈশ্বিক অঙ্গনে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিরাজ করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো সৃষ্টি হবে তা হলো বৈদেশিক ঝাগের বোর্ড থাকবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর হবে। সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচিত হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্য অধিকার সংরক্ষিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে আমরা নিজেদেরকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখব। খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যাব। এক উন্মুক্ত বিশ্বে বসবাস করার সকল সুযোগ আমাদের দোর গোড়ায় পৌছে যাবে। আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য যেসব ফলাফল লাভ করবে তা নিম্নরূপ-

- দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে।
- মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হবে।
- জেডার সমতাবিধান ও নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।

- গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানি ও সুস্থ পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে।
- টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে নৈরাজ্য কর্মে আসবে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতাহ্রাস পাবে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন হবে।

কাজ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের ফলে বাংলাদেশের কী কী সুবিধা হবে দলগত কাজের মাধ্যমে
পোস্টার

পেপারে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জিত হলে আমরা যে সুবিধাগুলো ভোগ করব সে বিষয়ে ধারণা মানচিত্র
অঙ্কন কর।

পাঠ-৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ নির্দেশিত ‘সহস্রাব উন্নয়ন লক্ষ্য’ (এমডিজি) অর্জনে ইতোমধ্যে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে সহস্রাব উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (Sustainable Development Goals) অর্জনে অংশীদারিত্বের পারম্পরিক দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের উপর। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশ এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে জানব।

একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হয়। আর টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বট্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভিন্ন তত প্রকট হবে। আর বিভিন্ন যত বাড়বে, বিশ্বে-বিভেদও তত বাড়তে থাকবে।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটেছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভিন্ন টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও

ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে, তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠেছে ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়-সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং অংশীদারিত্ব না থাকলে টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হবে। শুধু সম্পদ বৈষম্যই নয়, আয়, ভোগ, জেতার এবং অঞ্চল বৈষম্যও কখনো কখনো টেকসই উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্টি সমস্যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকা-উন্নয়নের গতিকে পথরোধ করবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কৃষিপণ্য সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এসডিজি অর্জন বেশ কঠিন হবে বলে ধারণা করা যায়।

কাজ -১: এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত কর।

কাজ -২: ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জই হলো সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য’- পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

কাজ-৩: ‘টেকসই উন্নয়নের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশদূষণ’- এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর।

পাঠ-৪: চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

আমরা জেনেছি যে, টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এগুলোকে মৌলিক বিবেচ্য বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এফেতে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সচেতনতা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশদূষণ।

আমরা দেখতে পাই, একটানা বৃষ্টি হলেই বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তখন যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তা-ঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজ বন্ধ থাকে, আমরা ঠিকমতো স্কুল, কলেজ বা কর্মসূলে পৌছাতে পারি না, দোকানপাট বন্ধ থাকে, রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসলে আমরাই আমাদের শহরগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলছি। ফলে রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে পানি

ঠিকমতো নির্গমন হচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানি জমে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমরা জেনেছি যে বাংলাদেশকে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হাজারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। এবার আমরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী কী করতে পারি তা চিহ্নিত করি।

সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সকল ক্ষেত্রের দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সরকার ও অন্যান্য সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমঙ্গল থেকে সম্পদ আহরণে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে বিশ্লেষণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে দ্রুত তথ্যভাগের গড়ে তোলা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা জোরদারসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা জোরদারসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দক্ষতা বাড়ানো এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তারা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। একইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেন্টেরিং এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সব মহলের সম্মিলিত অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরি। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্ত্রিভাব রোধ করতে হবে। বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গ্রামীণ অ-কৃষিক্ষেত্রকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে। সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া দুর্গম অঞ্চল বিশেষ বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের হার কমাতে প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। অর্থনৈতিক নীতিকাঠামো বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ন্যায্যভাবে সুবিধিত হতে পারে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বাড়াতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম-আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্পন্দন দেখছি। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। তা না হলে আমাদের হয়তো প্রবৃদ্ধি বাড়বে কিন্তু তা কখনোই টেকসই রাখা সম্ভব হবে না। সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ

করে, সকলে যাতে মানব মর্যাদা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ও জাগরণ ঘটাতে হবে। জ্ঞানানি খাতকে বর্তমান বাজেটে অগ্রাধিকার দিলেও তা বাস্তবায়নে কঠোর তদারকি জোরদার করতে হবে। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্র অনুসন্ধানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে কোনো উন্নয়নই ঘটুক না কেন উন্নয়নের সাথে কিছু নেতৃত্বাচক ফলাফল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে ঠিকই কিন্তু পূর্ব সতর্কতা না থাকায় বর্তমানে আমাদেরকে অনেক দায় বহন করতে হচ্ছে। যেমন, কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরা তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। তাই যা কিছু ভালো তা বিবেচনা করার পূর্বে যদি তার সাথে বিপন্নতা, ঝুঁকি কতটুকু সে দিকটা বিবেচনায় রেখে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়- তাহলে অনেকাংশেই ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

আমরা যদি এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে হাত দিই তাহলে ফলাফল কাজিষ্ট মানের হবে তা ধরে নেওয়া যায়। পৃথিবীর সব সমাজেই কিছু চলমান সমস্যা থাকে, আবার নতুন নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আর্থ-সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা তৈরি করে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সুষম ও সুসংহত করা এবং একে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদের উন্নয়ন। বাস্তবতার আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, অপচয়রোধ, দুর্বীতিদমন এবং দেশের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ। পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

কাজ-১: এসডিজি অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় চিহ্নিত কর।

কাজ-২: স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমরা কীভাবে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি, দলগত আলোচনার মাধ্যমে ২০০ শব্দের একটি রচনা লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে কোনটি?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ক. নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সহযোগিতা | খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা |
| গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা | ঘ. রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা |

২. কোন পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বের সচেতন মানুষকে শক্তি করে তুলেছে?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক. জন্মহার | খ. জলবায়ু |
| গ. তাপমাত্রা | ঘ. সামাজিক সূচক |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও-

“জাতিসংঘ প্রবর্তিত একটি কর্মসূচির ২০১৫ সালের অর্জিত সাফল্য ২০৩০ সাল মেয়াদি অভীষ্ঠ অর্জনে বাংলাদেশকে আশাবাদী করেছে”- মন্তব্য করে জনাব শাহেদ মনসুর তাঁর “ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ” শীর্ষক বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, “ ২০৩০ সালের মধ্যে অভীষ্ঠ অর্জনের মাধ্যমে আমরা নারী-পুরুষ সমতা বিধান করে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব।”

৩. জনাব শাহেদ তাঁর বক্তৃতায় ২০১৫ সালের কোন সাফল্যের কথা বলেছেন?

ক. এসডিজি

খ. এমডিজি

গ. পরিবেশ উন্নয়ন

ঘ. সামাজিক উন্নয়ন

৪. শাহেদ সাহেবের শেষ বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

i. অভীষ্ঠ অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

ii. সাফল্য অর্জনের সুবিধাসমূহ

iii. সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১.

দৃশ্যকল্প-১	একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান বালু নদীর কিছু অংশ ভরাট করে পাশের কিছু জমিসহ সাইনবোর্ড টানিয়ে প্লট বিক্রি করছে।
দৃশ্যকল্প-২	সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থাপনের পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করে পার্শ্ববর্তী খালে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।
দৃশ্যকল্প-৩	‘ক’ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগণ সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সকলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে সেটিকে সুন্দর বাসযোগ্য কর্পোরেশনে রূপান্তর করেছে।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী?

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন?

গ. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-৩ বিষ্ণের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতের উদাহরণ-মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত



শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জ্ঞান যে কোনো বন্ধুর চেয়েও উত্তম

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৬৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য